বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৪১

দুই টাকা

বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য

ভূমিকা

সাহিত্য জিনিষটাই গতিশীল ; কারণ সামাজিক মনের ঘাত-প্রতিঘাতে যাহার জন্ম ও বিকাশ, তাহার লীলা বিচিত্র। তবুও অতীতের ধারাকে লক্ষ্য করিয়া সামাজিক জীবনের বিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের একটা স্তর-বিভাগ নির্ণয় করিতে পারা যায়। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা একবারেই বলা যায় না। যাহা ইতিহাসের জিনিষ নহে তাহাকে তুলনা ও শ্রেণী বিভাগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা কঠিন—কারণ বিভিন্ন মতামত ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব-নিচয়ের মধ্যে সমসাময়িক সাহিত্য সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার পথে ধাবিত। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশী খাটে, কারণ বাঙ্গালী মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হইতেছে আবেগের আতিশয্য ও বিলাসের ভিতর দিয়া। তাই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় নানা ত্রুটি থাকা নিশ্চিত। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার প্রতিভার অভাব নাই কাজেই সকল প্রতিভার বিচার পক্ষপাতশূন্য হয় না। কোন অখ্যাত প্রতিভা হয়ত' লোকচক্ষুর অন্তরালে সাহিত্যের নূতন বীজ উপ্ত করিয়াছেন, তাহার সমাদর হয় নাই। সাহিত্যের গতি সরল রেখায় সহজে টানিতে যাইয়া হয়ত কোন নিপুণ চিত্রশিল্পী যথোচিত সমাদর পান নাই। হয়ত বা যিনি কোন বিশেষ সাহিত্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তিনি দেখিবেন, সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা দেখাইতে যাইয়া তাঁহার বিশিষ্টতা সম্যক আলোচিত হয় নাই।

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলির আলোচনা করিয়া এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের উদাহরণ অবলম্বন করিয়া বুঝা যায় আধুনিক সাহিত্যের যুগ হইতেছে ভাবের অশান্তি ও বিপ্লব ঘোষণার পর পুনর্গঠনের যুগ। বঙ্কিমী সাহিত্যের সে আভিজাত্য-গৌরব এখন আর নাই। রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসেও আমরা দেখিতে পাই, যৌবন-লীলার ভাবাতিশয্য হইতে ক্রমশঃ স্বাধীনতা ও সংযম, ভাবুকতা ও সমাজ-জীবনের সমন্বয় সাধন হইয়াছে। এ দুই দিক হইতে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আমাদের সাহিত্য নূতন কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে আমাদের জনসাধারণের লোক-শিক্ষা ও লোক-সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিতেছে। যে সহজ সরল জীবনের কোমল-কান্ত সুর বাঙ্গালার পল্লী, বাটে, ঘাটে, মাঠে, শস্য ক্ষেত্রে, নদীবক্ষে, তাল-ডিঙ্গিতে, গরুর গাড়ীতে গীত হয় এবং যাহার বিচিত্র প্রতিধ্বনি মাঠ হইতে গ্রামে, নদীতে অহরহ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার স্পর্শে আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কৃত্রিমতা, ভাবের অস্ফুটতা ও আভিজাত্য-গৌরব ঝরিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিয়াছি, বর্ত্তমান সমাজ, রাষ্ট্র অথবা সাহিত্য জীবনের নিষ্ফলতার প্রধান কারণ জনসাধারণের সহিত আমাদের শিক্ষিত সমাজের ব্যবধান—এই নিদারুণ ব্যবধান আমাদের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা আদর্শের প্রাণঘাতী। সমস্ত কর্ম্মের উপর উহা একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে নিতান্ত অনিশ্চিত রাখিয়াছে।

বাঙ্গালার কখনও কোন আন্দোলন যদি জাতীয় হইয়া দাঁড়ায়, শিক্ষিত অশিক্ষিতকে মর্ম্মের ভিতর দিয়া এক সঙ্গে আহ্বান করে, তাহা হইলে তাহা জাতীয় সাহিত্যের আহ্বানেই হইবে। তখন আমরা দেখিব, আমাদের পুরাতন লোক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কবিকঙ্কনের কালকেতু ও ফুল্লরার মত তাহার জন্ম হইয়াছে পর্ণকুটীরবাসী বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে। সমগ্র জাতির চক্ষের জলে যে সাহিত্যের আলিপনা অঙ্কিত হইবে তাহাই দেবতার ভাবী ও শুভ আগমন ঘোষিত করিবে। এখন দেখিতেছি, বিদেশী ভাব, বিদেশী ঘটনাবস্তু ও আদর্শের অনুকরণ অথবা সমাজের কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর ভাব বা ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা অনেক সময় সাহিত্যের অবাস্তব ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে জাগ্রত লোক-চৈতন্যের ছাপে গড়িয়া উঠিবে একটা সহজ ও মুক্ত

সাহিত্য যাহা পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনায়ত্ত লোকসাধারণের দৈনিক চিন্তার বিরোধ দূর করিতে পারিবে।

কিন্তু লোকসাহিত্যের ভাব ও রূপের উপর নিজের স্বাভাবিক অধিকারের শুধু কথা নহে। নিজের সভ্যতাটুকুও পাওয়া চাই, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে নিজেদের জীবনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে আপনার করিয়া লওয়া চাই, বাঙ্গালার মনোময় রূপটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে রূপে রূপে বিস্তার চাই।

আমরা বাঙ্গালার ভাব-মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠা করিব কি করিয়া? তাহা শুধু বুদ্ধির দ্বারা পাইবার নহে। শিক্ষার যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কল্পনাকে আরও বেশী আশ্রয় কবিতে হইবে, তবে বাঙ্গালার আবহাওয়া স্কুল কলেজের ঘরের ভিতর বহিবে। বাঙ্গালীর বুদ্ধির বিকাশের জন্য বোধোদয় পড়াইলে সে সুশীল বা সুবোধ হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী হইবে না। বোধোদয় নহে, স্বাভাবিক বৃত্তির উন্মেষ শিক্ষাকার্য্যের প্রধান সহায়,—ইহাই এখন প্রত্যেক শিক্ষাতত্ত্ববিৎ প্রচার করিতেছেন। কল্পনার সৃজনী-শক্তির উদ্রেক করা শিক্ষার প্রধান আশ্রয়—ইহা এখন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রণালীর গোড়ার কথা। সেই জন্য শিশু ও বালক বাঙ্গালীর মানসিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে বাঙ্গালার রূপকথা, আখ্যায়িকা, গল্প, কথাসাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। বিশেষতঃ বিদেশীয় সভ্যতার প্রভাবে যখন আচার ব্যবহার আমূল পরিবর্ত্তিত হইতেছে তখন কল্পনার দ্বারা বাঙ্গালার প্রাণকে স্পর্শ করিতে হইবে, স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে দেশের মহাপুরুষদের ছবি টাঙ্গাইয়া, বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নদ নদী উপত্যকা মন্দির সরোবর প্রভৃতির ফটোগ্রাফ ছবি সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, Pageant দ্বারা বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের ধারা অভিনয় করিয়া দেখাইয়া, বাঙ্গালার রাজ্য ছাত্রদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই রকম অভিনয় গ্রামে গ্রামে করিয়া আয়র্লণ্ড এবং ওয়েলসের জাতীয় আন্দোলন আধুনিক ইংরাজপ্রাধান্য সত্ত্বেও গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার কথকের মত কথা ও গানের দ্বারা ডেনমার্কের কৃষক সমাজের মধ্যে যে

জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতেও এই শিক্ষা প্রণালীরই কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষার ভিতর দিয়া এই একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা না হইলে, আমরা একটা বিরাট মিশ্রিত বস্তুতন্ত্রহীন সমাজজীবনের মধ্যে নিজেদের হারাইব। জাতি হারাইলে নিজেকে রক্ষা করিবার উপায় থাকিবে না।

আর এক দিক হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন একটা নূতন শক্তি আসিতেছে। জীবনের উত্তাপ ও দুঃখের সহিত নিবিড় অনুভূতি এক দিকে যেমন ভাষাকে সহজ, ক্ষিপ্রগতি ও প্রাণময় করিয়াছে, তেমনি সাহিত্যের সহিত দৈনন্দিন জীবনের, অন্তরের অন্তরতম বস্তুর যোগাযোগ স্থাপন করিয়া উহাকে সতেজ ও বস্তুতন্ত্র করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কথাপদ্য অথবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রেম-উপন্যাস মহৎ দুঃখ এবং দুঃখের গভীর ও জীবন্ত অনুভূতি আনিয়া সাহিত্যকে নানাদিক হইতে সতেজ করিয়াছে। বস্তুগত জীবনের প্রাচুর্য্য ও উত্তাপ আমাদের কাব্য ও উপন্যাসকে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু বাস্তব জীবনের বিরোধ ও ভাববিপর্য্যয় যে নিয়তই প্রভূত উপকরণ সঞ্চয় করিতেছে তাহার দিকে আমাদের নাটকের মনোযোগ নাই। কাব্য উপন্যাসেও জীবনের প্রাণান্তকর ঘটনা ও ভাব চিত্রিত হইলেও একটা অসাম্য ও কেন্দ্রচ্যুতিরও পরিচয় আমরা পাইতেছি। একটা স্নায়ুবিকার ও মানসিক বিক্ষোভ বর্ত্তমান বাধাবিঘ্ন ও নিরাশা-বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালীর ঠিক যেন স্বাভাবিক অবস্থা, তাহার ধাতেরই পরিচায়ক। এই দিক হইতে বর্ত্তমান গল্প উপন্যাস অকালযৌবন-বিলাসী, স্নায়বিকবিকারগ্রস্ত বাঙ্গালী চিত্তের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ। ইহা হইতে আমাদের রক্ষা পাওয়া চাই। সাহিত্যে জীবনকে প্রচুর ও গভীরতর ভাবে ফিরিয়া পাইতে হইলে শুধু যৌবনের আবেগ মাত্র চিত্রিত করিলে চলিবে না, জীবনের সমস্ত দিক দিয়া, শুধু প্রিয়তমের রূপে নহে, সেই আবেগের রূপান্তর এবং শেষে তাহার পরিশুদ্ধ মূর্ত্তিকে চিত্রিত করিতে হইবে। বাস্তবিক আবেগের এই স্বাভাবিক পরিণতি উপন্যাসকে যে

শুধু লঘুতা ও চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করিবে তাহা নহে, একই সঙ্গে জীবনের বিপুলতর অনুভূতি ও রসের প্রতুলতা তাহাকে কল্পনার মায়াজাল, ইন্দ্রিয় ভোগের লাস্য হইতেও রক্ষা করিবে। আর্টের সামাজিকতা এইখানে যে শিল্পী যে অন্তর্জ্জীবনের বিরোধের মীমাংসা করে, তাহা শুধু আপনার নহে সমাজের, জাতির অন্তরের বিরোধ। শিল্পের বেগ আপনার জীবনেরই ভাব ও অভিজ্ঞতা হইতে আসে সত্য, কিন্তু সে ভাব ও অভিজ্ঞতা শিল্পীর জীবনকে অতিক্রম করিয়া অপরকে শান্তি ও আনন্দ দেয়। যে কল্পনা ব্যক্তিগত বিক্ষোভেরই পরিচায়ক, অপর হৃদয়কে শান্তি দেয় না, তাহা শিল্প নহে, কল্পনাই মাত্র। অপরদিকে শিল্পী যেমন আপনার অন্তপ্র্বৃত্তির নিগূঢ় ব্যথা সুষমা ও সৌন্দর্য্যে প্রকাশ করে, সঙ্গে সঙ্গে অপরের জীবনেরও ভার লঘু করে। শিল্পীর জীবন ব্যাপকতর জীবন। সৌন্দর্য্য বিলাসীর ভোগ্যবস্তু নহে. উহা জগন্নাথের মহাপ্রসাদ।

এক কথায় জীবন চাই। "জীবন জীবন ভাই, আনন্দ জীবন।" যে জীবন রাস্তা ঘাটে, ক্ষেতে আফিসে, কলকারখানায় বাজারে কত সুখ দুঃখ, আবেগ ও বিহ্বলতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় তাহাকে বিপুলতর, মহত্তর ভাবে সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত করা চাই। জনসমাজের জাগ্রত অনুভূতির উত্তাপ সাহিত্যকে নব কলেবর দান করিবে; সাহিত্যের সেই বিরাট কায়ায় আমাদের বিশ্বরূপ দর্শন হইবে। শুধু রূপ দর্শন নহে, অরূপও এই রূপে মিলিবে। আমাদের শিল্পীর যুগযুগান্তরলব্ধ ভাবুকতা, মানব-জীবনকে একটা শাশ্বত তুরীয় জীবনের ছায়া রূপে, একটা বিশাল অনধিগম্য স্রোতের বিচিত্র ও মোহন বুদ্বুদের রূপে আমাদের নিকট প্রকাশ করিবে। তখন সাহিত্যের রস ও আখ্যান বস্তু দুইই—রূপান্তরিত হইবে। প্রকৃতি, প্রেম ও মানুষ তখন এক নূতন প্রভায় রঞ্জিত হইবে। এই আমাদের চির পরিচিত শ্যামলা বিপুলা ধরণী তখন কত রহস্যময়ী হইবেন, কত না স্নেহভরে সেই শাশ্বতী জননীর মত আমাদের চিন্তাক্লিষ্ট, তপ্ত-ললাটে তাঁহার স্নিগ্ধ হস্তখানি বুলাইয়া দিবেন। যার প্রতি কত

অনুরাগে লক্ষ ব্যাকুল বাসনায় কবি হাজার হাজার বছর ধরিয়া ছুটিয়াছে, সে এ জগতের সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া কোন সৌন্দর্য্য-লোকে লীলাকমল হাতে লইয়া দাঁড়াইবে, বিশ্বসৃষ্টির কোন নিগূঢ় রহস্য তাহার মাধুরীতে তখন প্রতিভাত হইবে, নব নব আকাশে যুগযুগান্তের কোন অপরূপ ছায়া তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিবে, কোন অমর প্রেমের ধ্যানদৃষ্টিতে এই জগতের প্রেমিকা চরাচর লোককে শাশ্বত মিলনের পথে তখন আহ্বান করিবে? এই যে দারুণ গ্রীষ্মে কঠিন পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কৃষক সংসারের সমস্ত গুরুভার স্কন্ধে লইয়া বসুন্ধরার সহিত সংগ্রাম করিতেছে, বর্ষের পর বর্ষ, দিনের পর দিন, প্রত্যূষ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত,—সে কি একলা এই বিপুল পরিশ্রমের শ্রমিক? তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে যে অসংখ্য ছায়া-রূপ, সমস্ত মানব ইতিহাসের বেদনা আকাঙ্ক্ষা, হর্ষ, নিরাশা মূর্ত্ত হইয়া তাহার অগ্রে পশ্চাতে চলিয়াছে, অনাদিকালের উদ্দাম অফুরন্ত মহাজীবনের উজ্জ্বল মেলার সেই চির-পরিশ্রমিক কত না বিপুল পরিশ্রমলব্ধ ফল, কত লক্ষ যুগের পসরা লইয়া ফিরিতেছে। মানবাত্মার এই চরম লক্ষ্যের আভাস আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যে পাইয়াছি। জীবন সৃষ্টির সেই অনাদি গূঢ়-ক্রন্দনের বিপুল ব্যথা, সেই ব্যাপকতর অন্তর্দৃষ্টি, সেই সূক্ষ্মতর ভাবুকতা, আমরা আরও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিচিত্রভাবে পাইবার আশা করি। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখকে তখন অন্য চক্ষে দেখিতে শিখাইবে। রস তখন আরও গাঢ় হইবে। সহানুভূতি আরও জীবন্ত হইবে, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আরও পবিত্র হইবে। অসীম শিল্পী এবং শাশ্বত তাহার জীবন,—যাহা এখন কল্পনার মায়া, যাহা এখন ছায়ার মত অস্ফুট তাহা তখন আপনার প্রাণেরই বিস্তার বলিয়া সে চিনিবে। দুইয়েরই মধ্যে দুইয়েরই চিরন্তন বিকাশ,—ইহাই ত সাহিত্য। শিল্পী কি আপনাকে চিনিবেন? আপনার জীবনকে অধিকার করিবেন? তখন যে সাহিত্যের নূতন চেতনা, "লীলা নব নব, নিতুই নব।"

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

লোকসাহিত্য ও লোকশিক্ষা

আমাদের সকলেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে,আমরা মনে করি, আমরাই দেশের লোক। সংবাদপত্রে আমরা কোন একটি মন্তব্য প্রকাশ করি, এবং তাহাতে দেশের সহানুভূতি থাকুক বা না থাকুক—বলি 'ইহাই দেশের মত।' দেশের মত অগ্রাহ্য করা অতীব অন্যায়, অথচ আমরাই এইরূপ নানা বিষয়ে দেশের লোকের মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের মতকে দেশের মত বলিয়া ঘোষণা করিতে লজ্জাবোধ করি না। বাস্তবিক পক্ষে, দেশের লোক কাহারা? উকীল, হাকিম, মুন্‌সিফ, মোক্তার, ছাত্র, কেরাণী, এরা কয় জন, এরা দেশের লোক? না, দেশের লোক বলিলে বুঝিতে হইবে, যাহাদিগকে আমরা রাস্তায়, ঘাটে, হাটবাজারে সদা-সর্ব্বদাই দেখি; রামা নাপিত, মধো ধোবা, হরে গয়লা, কেলো বাগ্‌দী, ইহাদের লইয়াই দেশ। আমরা বক্তৃতা দিই, শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মূল ভিত্তি, কিন্তু কই, আমাদিগের দেশের

শিক্ষা বা সাহিত্য ত দেশের লোকের কাছেও পৌছায় না। আমরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, আবার এদেশের শিক্ষায় অসন্তুষ্ট হইয়া দেশ-বিদেশে গমন করি, আমেরিকা, জাপানে যাইয়া চাষের বিদ্যা পড়িয়া আসি এবং দেশে আদর্শকৃষিক্ষেত্র খুলি, কিন্তু দেশের ইহাতে ত কিছুই আসে যায় না। রামধন চাষী ত ঠিক সেই মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল ও সার লইয়া চাষ করিতেছে। রামধন জমিতে কি প্রকার সার দেয়, তাহার লাঙ্গল ভাল কি মন্দ, তাহা জাপান-প্রত্যাগত চাষের বিশেষজ্ঞ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। গ্রামের ঘানি-গাছ "কোঁ" "কোঁ" শব্দে সমস্ত গ্রামকে মুখর করিয়া ঘুরিতেছে, আর তেলী সমস্ত দিনই গরু তাড়াইতেছে, কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়া তাহার কত আয় হয়, উহাতে তাহার দুই বেলা অন্ন জুটে কি না, তাহা আমরা ত একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমাদিগের সহিত ইহাদিগের ভাবের ও আদর্শের আদান-প্রদান নাই, কোটী কোটী লোক একেবারে মূঢ়, মূক—অসাড়।

কিন্তু চিরকালই যে এ দেশে লোকশিক্ষার অভাব ছিল, এমন নহে।

"লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূটতর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র

ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোক-শিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি,—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদীপীঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস-নুদুস কালো কথক, সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, দধীচির আত্মসমর্পণ-বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কারসংযুক্ত করিয়া আপামরসাধারণসমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে, ধর্ম্ম নিত্য, যে, ধর্ম্ম দৈব, যে, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে, পরের জন্য জীবন, যে, ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতে-ছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে, পাপপুণ্য আছে, যে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে, জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে, অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে, লোকহিত পরম কার্য্য। সে শিক্ষা কোথায়, সে কথক কোথায়? কথকতা লোপ পাইল। লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র।

আমাদিগের এমন একদিন ছিল যখন যাহার অক্ষরবোধমাত্র হইয়াছে, সেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত লইয়া সুর করিত, যে পড়িতে জানিত না, সে অন্যের মুখ হইতে শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিত। প্রত্যেক সপ্তাহেই গ্রামের হরিসভার অধিবেশন হইত, যে নিরক্ষর, সেও সেখানে যাইয়া প্রেমের পূর্ণমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যের

জগাইমাধাই-উদ্ধারকথা অথবা নীলাচললীলা শুনিয়া চক্ষে জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিত না। সভার পর যখন কীর্ত্তন হইত, তখন ছোট বড়, ধনী নির্ধন বিষয়ী উদাসীন সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করিত—ভক্তির অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়া সকলেই সানন্দচিত্তে আপনাপন গৃহে ফিরিয়া যাইত। চণ্ডীমণ্ডপে তখন প্রায়ই ভাগবতের ব্যাখ্যা হইত, ধ্রুব-প্রহ্লাদের উপাখ্যানের প্রেমরসপূর্ণ মধুর ভাবগুলি শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। শান্তিময় জীবনে যখন মৃত্যু এবং বিষাদের বিভীষিকা আসিয়া উপস্থিত হইত, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে তাহারা বিপদে আপদে নিত্য ত্রাণকর্ত্রী সর্ব্বদুঃখহরা চণ্ডীর শরণ লইত। ভক্ত কালকেতু বিপদে পড়িয়া বনে মাকে ডাকিয়াছিল, মা অমনি তাহাকে অভয়দান করিলেন ; শ্রীমন্ত মশানে কাতরভাবে মাকে ডাকিয়াছিল, মা কমলেকামিনী তাহাকে কোল দিলেন ;—এই সব আগ্রহের সহিত তাহারা শুনিত, শুনিয়া তাহারাও মাকে ডাকিতে শিখিত। তখন সব দুঃখ, সব শোক, বিপদ কোথায় চলিয়া যাইত। তখন বাংলার গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মৃদঙ্গ মন্দিরার সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের লীলা গীত হইত, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন প্রভৃতি ভক্ত কবির সুমধুর পদলহরী ভাবুকের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ উপস্থিত করিত, চাষী চাষ করিতে করিতে বাস্তব জীবন ভুলিয়া যাইত, ভাবের রাজ্যে আসিয়া রামপ্রসাদী গান ধরিত, "মন তুমি কৃষিকাজ জান না, এমন মানব-জনম রইল পড়ে আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।" রামপ্রসাদের পদাবলী এবং রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল এক অপূর্ব্ব ভাবময় জীবনের সৃষ্টি করিত।

তাহার পর আমাদিগের হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় গান ও ছড়াগুলি,—ইহারাই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, ইহারাই লোক-

শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আকর, সমাজের নিম্নতম স্তরের মধ্যে ইহারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে।

হরগৌরীর কথা প্রত্যেক বাঙালী পরিবারের একটি দুঃসহ বেদনার গাথা, বাৎসল্যরসমণ্ডিত সুন্দর ও মধুর কাব্য। এ দেশে কয়জন পরিবার কন্যাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিয়া সুখী হইয়াছেন? আবার কন্যার বিবাহ দিলে তাহার সহিত হয় ত চিরদিনের বিদায়—সেই জন্য কত অনুতাপ, কত অশ্রুপাত! প্রতি বৎসর শরৎকালে যখন "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর", বাংলামায়ের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, প্রাতঃসমীরণ যখন শিশিরসিক্ত হইয়া হৃদয়কে শুভ্র মেঘের মতন কোন স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়, বাংলামায়ের স্বপ্নের ধন মা আনন্দময়ী সেই সময়ে—শরতের সপ্তমীর দিনে মাতৃগৃহে আসেন। তখন আগমনী গানে বাংলাদেশের সুনীল আকাশ মুখরিত হইয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোতে সমস্ত বাংলাদেশ ভাসিয়া যায়। কিন্তু দুর্গোৎসবের মিলনানন্দ কেবল চারদিনের মাত্র। বিজয়া দশমীর দিনে ভিখারিণী মায়ের অন্নপূর্ণা কন্যা স্বামিগৃহে ফিরিয়া যান, শরতের শেফালীর মত ক্ষণিকের আনন্দ অচিরেই ঝরিয়া যায়, তখন জলে, স্থলে, আকাশে একটি দুঃসহ বেদনার সুর বিসর্জ্জনের বিদায়ের গানের সঙ্গে বাজিয়া উঠে, বাঙালী পরিবারের চোখ জলে ভরিয়া যায়—এ বিচ্ছেদ-বেদনা সমস্ত বৎসরেও আর ভুলিতে পারে না। হর-গৌরীর গানগুলি এই ক্ষণিক হর্ষমিলন ও বেদনাকে ফুটাইয়া তুলিয়া বাংলার পল্লীসমাজের নিকট দুইটি খুব উন্নত আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে।

ভারতবর্ষের কবিগণ চিরকালই বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দারিদ্র্যের গৌরব দৃঢ় করিয়াছেন। হিন্দুর প্রাচীন সন্ন্যাস সেদিনও যে তরুণ মনীষীর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, সেই স্বামী বিবেকা-

নন্দও পাশ্চাত্য সভ্যতার বুকের উপর দাঁড়াইয়া সদর্পে বলিয়াছেন যে, জগতে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ—যেখানে দারিদ্র্যের অর্থ পাপ বা কলঙ্ক নহে। বাংলামায়ের জামাতা মহাদেব দরিদ্র, তিনি শ্মশানচারী, কিন্তু বাঙালী কবিরা দেখাইয়াছেন যে, দারিদ্র্যই তাঁহার ভূষণ, তিনি ভিখারী, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার পূজা করেন, কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী, গৃহিণী তাঁহার অন্নপূর্ণা, তিনি মহাদেব, তিনি শিব শঙ্কর। দরিদ্রসমাজের নিকট এমন একটি উচ্চ আদর্শ, সংসারের ভাবের সহিত উচ্চ ধর্ম্মভাবের এমন মধুর সমন্বয় জগতে আর কোন লোকসাহিত্যে দেখা যায় না। আবার ভূতনাথ যখন তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া বিবাহ করিতে আসিলেন, সকলে দেখিল, তাঁহার রূপ নাই, যৌবন নাই, অঙ্গে ভূষণ নাই; সকলেই নিন্দা করিল, মেনকাও জামাতাকে দেখিয়া আক্ষেপ করিলেন—

"মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥
কহিলেন নন্দী শুন দেব শূলপাণি।
মদনমোহন রূপ ধরুন আপনি॥
এতেক নন্দীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন।
দেখিতে দেখিতে হৈল ভুবনমোহন॥—(কবিকঙ্কণ)

নন্দীর বাক্যে নহে, উমার আন্তরিক প্রীতিভক্তিতেই ভিখারী উমানাথ ধনরত্নশালী ভুবনমোহন হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর নাই।

গ্রামে গ্রামে কবিগণ প্রতি বৎসর নূতন নূতন আগমনী ও বিসর্জ্জনের গান রচনা করিতেন; এইরূপে একটা বিরাট গীতি-কাব্য রচিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে

গ্রামের ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে যাইয়া শিখাইয়া বেড়াইত। অতিথিসেবা, ভিক্ষুককে ভিক্ষদান, তখন আমাদিগের একটি অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি অন্ন দিয়া আমরা তাহার নিকট হইতে যাহা চিরকালের জিনিস, তাহা লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম। বাঙালীর পারিবারিক জীবনে মায়ের কন্যার প্রতি আসক্তি, মেয়ে জামাইয়ের আদর, মেয়ের বাপের বাড়ীর প্রতি মমতা, এই সকলকে আশ্রয় করিয়া গ্রাম্য কবিগণ কুলকুণ্ডলিণীর জাগরণকে রস মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। গিরিরাজ, মেনকারাণী ও চৈতন্যরূপিণী গৌরীর আখ্যায়িকা দেহমধ্যে পর্ব্বে পর্ব্বে আত্মোদ্ভবা মাতৃশক্তিকে একাধারে মা ও মেয়ে ভাবে পূজা ও বরণের ইঙ্গিত করিতেছে। পদে পদে, গাথায় গাথায় সেই চৈতন্যময়ীর বোধন বা জাগরণ ও স্নেহ-লীলার ইতিহাসের রসতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব দৈনিক জীবনের মধুর ও বস্তুতন্ত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হরগৌরীর গানগুলির মত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানও তুরীয়কে গার্হস্থ্য জীবনের রস মাধুর্য্যের ভিতর অনিয়া দিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে, তাহা সাধারণে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বৈরাগী যখন "হরেকৃষ্ণ" বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়া গান গাহিত, তখন সে বাঙালীর চিত্তকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও ভাবের রাজত্বে লইয়া যাইত, বৃন্দাবনের সেই শ্রীদাম সুদাম সুবল কানাইয়ের রাজ্য, সংসার হইতে অনেক দূরে, এখানে শোক দুঃখ পরিতাপ অনু-তাপ প্রবেশ করিতে পারে নাই,—এখানে শুধু অনাবিল প্রেম ও ভাবের স্রোতে সমস্ত আগমনী-বিজয়া গানের বিক্ষেপ ভাসিয়া গিয়াছে। এই-রূপে কত শতাব্দী ধরিয়া, বৈরাগী ভিক্ষুক বাংলার দ্বারে দ্বারে যাইয়া একটি অপরূপ সৌন্দর্য্যময় ভাব-জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই

সৌন্দর্য্য গভীর, অক্ষয় এবং তুরীয়রসমণ্ডিত অথচ সমাজের নিম্নতম স্তরেরও উপভোগ্য।

শিক্ষার জন্য মানুষের কেবলমাত্র ভাবের গভীরতাই প্রয়োজন, তাহা নহে। মানুষ অবকাশ চাহে, অবসরসময়ে সে হাস্যরসাত্মক, কৌতুকোদ্দীপক গানে আনন্দ অনুভব করে। শিক্ষাবিধানের জন্য এই কারণে দাশু রায়ের পাঁচালীর মত লঘু কবিতাও আবশ্যক। দাশু রায়ের গানগুলি এমন রহস্যোদ্দীপক এবং ইহাদিগের ভাষা এত সরল যে, জনসাধারণেও ইহাদিগের রস সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে এমন লোক খুব কম ছিল যে, দাশু রায়ের পাঁচালীর দুই একটি গান গাহিতে না পারিত। পাঁচালীর মত, যাত্রা এবং কবির গানও সাধারণের বোধগম্য এবং মনোরঞ্জক,—এগুলিও বাংলা দেশে জনসাধারণের শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

বাস্তবিক পক্ষে আমাদিগের দেশে লোকশিক্ষার যে বিরাট আয়োজন ছিল, ইহার তুলনা অন্য কোথাও আর পাওয়া যায় না। আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা, প্রেয় এবং শ্রেয়ের এমন মধুর সমন্বয় অন্য কোন দেশ ভাবিতে পারে নাই। আমাদিগের দরিদ্র দেশের কৃষককে সমস্ত দিনই ক্ষেতে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়;—প্রত্যূষে সে গৃহ হইতে চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নে গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় পায় না, মাঠেই সামান্য অন্নব্যঞ্জনে উদর পূর্ণ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে, তবেই তাহার অন্নসংস্থান হয়। কৃষক-বালকেরাও গৃহে থাকে না, তাহারা ক্ষেতে যাইয়া পিতার কার্য্যে সহায়তা করে অথবা মাঠে মাঠে যাইয়া সমস্ত দিনই গরু চরায়। সন্ধ্যার পর কৃষক ক্লান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে, এবং আঙিনায় আসিয়া বিশ্রাম করে। এই সময়েই তাহার দিনের মধ্যে যাহা কিছু অবসর, তাহার শিক্ষার একমাত্র অবকাশ—এই সময়ে

কথক তাহার ক্লান্ত হৃদয়কে উৎফুল্ল করিয়া দেয়, যাত্রা এবং কবির দল এই সুযোগ পাইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হয়। আমাদিগের দেশে লোকশিক্ষা চিরকাল এই সময়েই হইত—দরিদ্র শ্রমজীবিগণের পক্ষে ইহাই শিক্ষার একমাত্র অবকাশ।

কিন্তু লোকশিক্ষা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। লোক-শিক্ষার এই অবনতির জন্য আমাদিগের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই অধিক দায়ী। আজকাল যাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহারা রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলির আদর করে না,—একটা ঝোঁকের মাথায় তাহারা দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাদিগের যাহা অন্তরের সামগ্রী, যাহা নানারকমে গানে, কাব্যে, সাহিত্যে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে দেশের কবিগণ তাহাদিগকে দেখাইতেছিলেন, তাহা না খুঁজিয়া, দেশের চিন্তা ও আদর্শের মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তাহারা কোন্ অচেনা দিকে ক্রমশঃ দূরেই যাইতেছে। যাঁহারা তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা আপন, রাম, সীতা, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, শ্রীমন্ত, কালকেতু, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, তাঁহারাই তাহাদিগের কাছে অপরিচিত হইয়া উঠিতেছেন। কথকরা ইহাদিগের পরিচয় দিতে আসেন, কিন্তু তাহারা এখন উন্মত্ত, কথকের কথা শুনিতে চাহে না। উৎসাহের অভাবে কথকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। আমাদিগের দেশে যেমন কথকতা লোপ পাইতেছে, ডেনমার্কে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। সেখানে আজকাল কথকতার দ্বারা একটি বিপুল আন্দোলন সাধিত হইতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে ক্রিষ্টেন কল্‌ড নামক একজন মহানুভব ব্যক্তি তাঁহার বিদ্যালয়ে কৃষকদিগকে মুখে মুখে কথাচ্ছলে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার আদর্শে অনেকগুলি কৃষিবিদ্যালয় ঐ দেশে

স্থাপিত হইল। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আমাদিগের দেশের কথকের মত বই, কাগজ ইত্যাদির সাহায্য না লইয়া নানা বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়, ছাত্রেরা কেবল শুনিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি দেখে। এইরূপ মুখে মুখেই তাহারা ইতিহাস, ভূগোল, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। এই শিক্ষাপ্রণালীই ডেন্‌মার্কের আধুনিক কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির একমাত্র কারণ। ইউরোপ ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে কথকতাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সমাজের কল্যাণসাধনের একটি বিরাট আয়োজনের সূচনা হইয়াছে,—আমরা কিন্তু এমন একটি অনুষ্ঠান—যাহা কত শতাব্দী করিয়া আমাদিগের পল্লীসমাজে প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছে, হেলায় হারাইতেছি!

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেকালে, ৮০, ৯০ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ লোকে কিরূপে দৈনিক জীবন যাপন করিতেন, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা দলাদলি, ক্রীড়া-কৌতুক ও কথকতা শ্রবণে কালযাপন করিতেন। কথকতা অতি শ্রবণযোগ্য ব্যাপার। ভাল ভাল কথকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। বড় বড় তাঁতকাটা এজুকে (educated) রামধন ও শ্রীধর কথকের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ইউরোপে স্কুলে বাগ্মিতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে কথকতা শিখিলেই বাগ্মিতা শিখা হইত। কথকতা প্রকৃত বাগ্মিতার কার্য্য। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কথকতার ক্রমে লোপ হইতেছে। কথকতার রীতি স্থিরতর থাকিয়া তাহার বিষয় ও প্রণালীতে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।"

বেশী নহে, ৮০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে করিলে আমরা আমাদিগের দেশে আধুনিক লোকশিক্ষার অবনতির পরিমাণ অনেকটা বুঝিতে পারি। রামপ্রসাদের সরল গানগুলি যে সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে গীত হইত, নিধু বাবু, রাম বসু, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাজা রামকৃষ্ণের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি পল্লী-সমাজে তখন যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।' কবি, যাত্রা, পাঁচলী প্রভৃতি তখনকার প্রধান আমোদ ছিল, তাহার মধ্যে কবি প্রধান। কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালার নাম শুনিলে আমরা তখনকার শিক্ষার বিস্তৃতির বিশেষ পরিচয় পাই। কৃষ্ণ কর্ম্মকার, পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলু পাটুনী, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা প্রভৃতি আসরে বসিয়া সমাজের গণ্যমান্য লোকদিগের নিকট হইতেও সম্মান পাইতেন। কবিগানে পৌরাণিক পাণ্ডিত্য যথেষ্ট দেখান হইত, এই জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও আগ্রহের সহিত ইহাদিগের গান শুনিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নিতে বৈষ্ণব কবিওয়ালা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ধনী লোকমাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রে নিতাই দাসকে বায়না দিতেন, ইহার সহিত ভবানী বেণের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত। যথা—প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই।' এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে-ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত। নিত্যানন্দের গোঁড়া কত লোক ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন।—নিতাইয়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে, ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।"

কবিওয়ালারা কেবল আমোদজনক কবিতা গান করিতেন, এমন নহে, কবি গাহিবার সময় পরমার্থভাবপূরিত সঙ্গীত গাহিতেন। হরু ঠাকুরের রচিত এইরূপ একটি গান আছে,—

"হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা, যা হবার তাই হবে।

ভবের তরঙ্গ বেড়েছে ব'লে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে॥"

আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার ভিক্ষুকের মুখে সন্ধ্যার সময়ে এই সুন্দর গানটি শুনিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কি মনোহর, কি মনোহর, শ্রবণ অথবা কীর্ত্তনমাত্রেই অশ্রুপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি দৃঢ় ও পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেই-খানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নামসঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কি ইতর, কি ভদ্র এতৎগানে প্রেমিক হইয়া থাকেন।"

এইরূপে দেশের জনসাধারণও এই সকল গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের গানের মত জগা সেকরা ও তৎপুত্র রাজ-নারায়ণ এবং সোনা ভুলের রামপ্রসাদী ও কমলাকান্তী-সংবলিত চণ্ডী-গান দেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ ধর্ম্মভাব বহুলপরিমাণে প্রচার করিত।

তাহার পর আমাদিগের যাত্রার দল। যাত্রার দলওয়ালারাও তখনকার বিশেষ প্রতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। চণ্ডীযাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রার দ্বারা এই সময়ে দেশে যথেষ্ট ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হইত। রামমঙ্গল গানে, হরিনাম এবং গৌর-নিত্যানন্দ নামকীর্ত্তনেও সকলেরই হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের উদয় হইত। বাংলার পল্লীসমাজ এইরূপে অনেক দিন চলিয়াছিল, কিন্তু এখন ইহার কি পরিবর্ত্তন!

অজ্ঞতার উপেক্ষায় আগমনীর গান আমরা হারাইতেছি। যাত্রা এবং কবির দলের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে গোপাল উড়ের অথবা কৈলাস বারুইয়ের বিদ্যাসুন্দর এবং বদন অধিকারীর কালীয়দমন, এন্‌টুনী ফিরিঙ্গী এবং হরু ঠাকুরের কবিগান লোকে কিরূপ উৎসাহ এবং আনন্দের সহিত শুনিত, তাহা এখনকার শিক্ষিতসম্প্রদায় ভাবিতেই পারে না। শিক্ষিত লোকদিগের রুচি এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়াতে যাত্রার আদর কমিয়া গিয়াছে, গোবিন্দ অধিকারী, মতি রায় অথবা নীলকণ্ঠের যাত্রার দল অপেক্ষা লোকের থিয়েটারের উপর বেশী ঝোঁক পড়িয়াছে। শ্রোতা এবং অভিনেতাদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত লোক বলিয়া যাত্রা এবং কবির দলের গানগুলিতে ভাষা এবং ভাবের ইতরতা দেখা গিয়াছে। বাংলাদেশে ত অনেক নাটককার আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন যদি যাত্রার দলের পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া জনসাধারণের সহিত একত্রে শ্রোতা হন, তাহা হইলে অচিরকালেই যাত্রাগুলি হইতে রূঢ়তা এবং অশ্লীলতার দোষ দূর হইবে, সাধারণের মধ্যেও রুচির উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তখন ইহারা সমাজে আমাদিগের দেশের চিরন্তন আদর্শগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার উপযোগী হইবে। যে থিয়েটারের মোহে আমরা এখন মাতিয়া উঠিয়াছি, তাহাই বা কি এমন ভদ্র, ভব্য এবং সুরুচিসম্পন্ন? কিন্তু সে কথা এখন শুনিবেন কে? জাতীয় জীবন এখন বিমূঢ়। আমরা—যাহারা শিক্ষিত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিই, আমরা নিজেরাই জাতীয় আদর্শগুলি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যাঁহারা এগুলি অন্বেষণ করিয়া আমাদিগের নিজস্ব করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা আপনাদের লোক বলিয়া

চিনিতে পারিতেছি না, মায়ামন্ত্রে বশীভূত হইয়া কোন আলেয়ার পানে লুব্ধ হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছি, আমাদিগের যাহা আন্তরিক যাহা স্বাভাবিক, তাহা ফেলিয়া যাহা বাহিরের, যাহা কৃত্রিম, তাহাই লইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

হে বাংলার চিন্তাজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! কোন অতীতকালের মধ্যাহ্নে তমসানদীর তীরে মহাকবির কণ্ঠ দিয়া তুমি যে গীত উচ্চারণ করিয়াছিলে, তাহার সুর, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, আরো ত গভীর হইয়া উঠিতেছিল, এ সুরে বাংলাদেশের মানসপ্রকৃতিতে কত অভিনব পুষ্প পুলকে ফুটিয়া উঠিতেছিল, কত পাষাণহৃদয় গলিয়া গিয়া প্রেমের নদীতে পরিণত হইয়াছিল, সে সুর আজ হঠাৎ ম্রিয়মাণ হইতেছে কেন? জাগাও দেবি! জাগাও আবার সেই সম্মোহন সুর, যে সুরে নারদ স্তব্ধ রজনীর শুভ্র চন্দ্রালোকে হরিনাম গান করিয়া ধ্রুব-প্রহ্লাদকে মাতাইয়াছিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করিয়া মর্ত্ত্যে পতিতপাবনী ভাগী-রথীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জে মুরলীরবে বাজিয়া উঠিয়া যে সুর যমুনার প্রবাহ রোধ করিয়াছিল, ভাগীরথীতটে শ্রীগৌরা-ঙ্গের মধুর কণ্ঠে মুরজমন্দ্রে উত্থিত হইয়া জগাই মাধাই ও কত পতিতকে উদ্ধার করিয়াছিল, কত ভক্ত-কত কবি-মহাপাপীরও কণ্ঠে পদে পদে গাথায় গাথায় ধ্বনিত হইয়া সমস্ত বাংলাদেশকে প্রেমের প্লাবনে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। শিখাও দেবি, এতদিন যেমন কৃত্তিবাস-কাশীরামদাসের কণ্ঠ দিয়া শিখাইতেছিলে, তেমনি বাঙ্গালার প্রত্যেক পরিবারকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া আবার শিখাও, সেই উন্নত এবং পবিত্র গৃহ ও সমাজ ধর্ম্ম—যাহার জন্য রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজত্ব ছাড়িয়াছিলেন, লক্ষ্মণ ভ্রাতার জন্য সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সীতা পতির কল্যাণের

জন্য চিরদিনই দুঃখে কাটাইয়াছিলেন। হে দেবি! বাংলার নারীগণকে তুমি কত শতাব্দী ধরিয়া সীতা-সাবিত্রী-দ্রৌপদী-দময়ন্তীর পাতিব্রত্যের কথা শুনাইতেছিলে বলিয়া বাঙালী ঘরের কন্যা বেহুলা সতীস্ত্রীর স্বর্গীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছেন,—স্ত্রীশিক্ষার এমন আদর্শ এবং শিক্ষার এমন ফলের তুলনা জগতে আর নাই! তোমারই ত ধ্রুব-প্রহ্লাদ বাঙালীর ঘরে ঘরে ভক্ত কালকেতু ও শ্রীমন্তের চরিত্রগঠন করিয়াছে, নিমাইকে প্রেমিক ও রামপ্রসাদকে সাধকের মধ্যে অগ্রণী করিয়াছে। হে দেবি! তুমি ত ভারতবাসীকে সর্ব্ব-ত্যাগী শঙ্করের উপাসনা করিতে শিখাইয়াছিলে। ভারতবাসী কখনও ত ধনীর নিকট কিছু শিখে নাই, ভারতবাসী যাহা শিখিয়াছে, তাহা কাঙাল ভিখারীর কাছে,—একদিন রাজপুত্রের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল—যখন তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। ওগো বাংলার ভিক্ষুক ভিখারিণি! তোমারাও ত বাংলার পল্লী-সমাজকে চিরকালই শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলে, তোমারা আবার তোমাদিগের ভিক্ষার ঝুলি লইয়া অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াও, দরিদ্র বাঙালীর ঘরে দাশু রায়ের "ঠাকরুণবিষয়" গাও, শিখাও, যে, দারিদ্র্যে লজ্জা নাই, উমানাথের যে দারিদ্র্য, তাহা ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা লক্ষগুণে মহৎ। বাংলার ঘরের গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিতা বধূগণ তোমার গান শুনুক এবং এক মুষ্টি ভিক্ষার বদলে তাহারা আমাদিগের সেই চিরন্তন দৃঢ় বৈরাগ্যের আদর্শ ঘরে ঘরে ফিরিয়া আনুক। হে বৈষ্ণবীগণ! তোমরাও "জয় রাধে" বলিয়া "সখী-সংবাদ" গাও, দুঃখী বাঙালীর চিত্তে একটি সুন্দর পবিত্র ও আনন্দের ছবি আঁকিয়া দিয়া তোমরাও তোমাদিগের বৃত্তি সার্থক কর। আমরা যেন তোমাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের যাহা চিরন্তনকালের আদর্শ তাহা নূতন ভাবে

ফিরিয়া পাই। হে স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি, তোমার সেই অতীতের অমোঘ বাণী আবার ধ্বনিয়া উঠিয়া আমাদিগের যাহা চিরদিনের জিনিস, আধুনিক সভ্যতা যাহাকে কৃত্রিম আবরণের মধ্যে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিক। নূতন জীবন ও সভ্যতার বিরোধ ও নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যেন তোমার সেই পুরাতন আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ বেদনার মধ্যে যেন আমরা মানবের গভীরতম দুঃখকে অনুভব ও বরণ করিতে শিখি, এবং মানবের দুঃখের মধ্যে আদ্যা প্রকৃতির কৌতুকলীলা ও পতিতপাবন নারায়ণের সেই অনাদি অনন্ত আহুতির ইঙ্গিত দেখিতে পাই। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা যে সমাজের বিরাট নিস্ফলতা এবং নারায়ণের অপূর্ণতা এই পতিতপাবন প্রেমধর্ম্মই হইতেছে সাহিত্যের যুগধর্ম্ম, আমাদের অতীতের কল্পনা ও আমাদের ভবিষ্যতের সম্বল। হে লোকচৈতন্যরূপিণি, বর্ত্তমান শিক্ষাকে তুমি তোমার তুলিকা-রূপে গ্রহণ কর, সহজ ও স্বাধীনভাবে জাতির ও যুগের এই মানস-পটে তাহা খেলাইয়া বেড়াও, সমূহের জাগ্রত অনুভূতির বিচিত্র রঙ ও ছটায় ছবি আঁকিতে থাক। তুমি এই যুগধর্ম্মকে ঠিক মূর্ত্তি দিতে পারিবে। দেশের ও বিশ্বের হৃদয়-সিংহাসনে সে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আগমনী গান এখনও শ্রুতিপথে রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকসাহিত্যের অব্যবহার

বিলাতের কোন সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া সে দিন বিখ্যাত শিক্ষাতত্ত্ববিৎ স্যাডলার সাহেব বলিয়াছিলেন—লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রায়ই অপ্রিয় হয়, প্রথমে গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহা প্রচুর অর্থ-ব্যয়ের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোকেরা ইহাকে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা মনে করিয়া ভয় পায়, অথচ সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে, ইহা খুব গর্হিত। আমাদিগের দেশে শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে মহোদয় যখন বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষাবিধি-প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন ইহা লইয়া খুব বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ বিধি অনুমোদন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কিছু কিছু টাকা বৎসর বৎসর ব্যয় করিতেছেন। গবর্ণ-মেণ্টের সহানুভূতি আমরা অল্পই পাইয়াছি, সাধারণের মধ্যে সহানু-ভূতির অভাবও যথেষ্ট রহিয়াছে। কৃষক ও রাখালবালকদিগকে লেখা পড়া শিখাইলে আমাদিগের ঘরে চাকর পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিবে, ইহা অনেকেই এখন বলিতেছেন। লোকহিতৈষী মহানুভব কবেট সাহেবও ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিধানের পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা কিন্তু কেহ শুনে নাই; ইংলণ্ডের ধনী লোকদিগের যে চাকরের অভাব হইয়াছে তাহা আমরা এখন পর্য্যন্ত ত শুনিতে পাই নাই। চাকর বিদ্যালাভ করিলে অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিবেই, এমন নহে, তবে মনিবের আজ্ঞা দেবাজ্ঞা

সদৃশ পালন করিয়া চাকুরী রাখিবে না ইহা নিশ্চয়। গৃহপালিত পশু যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া অন্যত্র যায়, কাহারও কথা না শুনে, তাহা হইলে গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, সংসার অচল হইয়া উঠে; কিন্তু চাকররা ত পশু নহে। যখন তাহাদিগকে আমরা মানুষ বলিয়া মানিয়া লই, তখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে তাহাদিগের মন আছে, আত্মা আছে, চরিত্র আছে। মনের গতির ত সীমা নাই, চাকুরীর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কেহই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ তাহার মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী শক্তি লুপ্ত আছে যত দিন না তাহা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ফেলে তত দিন তাহার তৃপ্তি নাই,—ইহাই তাহার ধর্ম্ম। জগন্নাথের রথ যে অনন্ত শক্তি লইয়া আনন্দের ভূমার পানে ছুটিয়া চলিতেছে তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য! কৃত্রিম বাধা বিঘ্ন যদি সে পথে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে যে অচিরেই চাকার তলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

জগতের নিয়মই এই যে, যদি কোন জাতি বা সমাজের কোন শ্রেণী-বিশেষের আত্মশক্তির বিকাশের পথে অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ অস্বাভাবিক কোন অন্তরায় দাঁড়ায় তবে সে ঐ প্রতিকূল আচরণের সঙ্গে কোন না কোন দিন ঘোরতর ভাবে সংগ্রাম করিবেই। ফরাসীদেশে প্রজাশক্তি যে রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল তাহার কারণ ত ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। তিন শত বৎসর ধরিয়া রাজকীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি কারাগারের প্রাচীরের মত তাহার বিশ্বের দিকে বাহির হইবার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাই সে ক্ষিপ্ত হইল। জাগরিত হইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত কারাগারের প্রাচীরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলে স্বভাবতঃই মন জড় ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, কারাগারের অন্ধকার-

কেই সে তখন আলো মনে করে, কারাগারকেই তাহার ঘর বলিয়া ভালবাসিতে শিখে, তখন বিশ্বের সহিত মনের আদান প্রদান অসম্ভব হয়। এই মোহ হইতে উদ্ধার করা শিক্ষারই ত কাজ। শিক্ষা দ্বারা মন সচেতন হয়। একটু চেতনা পাইলেই, আলো ও অন্ধকার, কারাগার ও ঘরের প্রভেদ একবার বুঝিতে পারিলে মন আপনিই ধীরে ধীরে বাহির হইবার পথ খুঁজিবেই, কারাগারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেই। জাতির জীবন যখন সঙ্কীর্ণ হইয়া নির্জীব হইয়া পড়ে তখন যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে একটী নূতন চেতনার স্রোত আনিয়া দেন তিনিই ত জাতির শিক্ষক, প্রকৃত মহাপুরুষ,—তখন নবজাগ্রত জাতি নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া জননায়ককে বলিয়া উঠে "অসত্য হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিস্বরূপে লইয়া যাও।"

জাতীয় জীবনস্রোত, এতদিন যাহা গর্ত্তের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছিল, যখন সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া কল কল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন জলের গন্ধ আবর্জ্জনা আর কিছুই থাকিবে না। শীতের পর যখন বসন্তের প্রথম বাতাস্ বহিতে থাকে, নির্জীব গাছপালা তখন জীবন পায়, নব কিশলয়ের তরুণ সাজে সাজিয়া সমস্ত গাছগুলি নূতন আবেগে মর্ম্মরিয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব আনন্দের কোলাহলে চারিদিক ভরিয়া যায়। কুঞ্জকাননে ফুল ফুটিয়া উঠে, যে পাখী এত দিন নীরব ছিল এখন সে সঞ্জীবনী শক্তি পাইয়া পঞ্চম স্বরে গান ধরে। জাতীয় জীবনে ত ঠিক তাই। শিক্ষার আন্দোলন যেন জাতির মধ্যে একটী নূতন যুগ, এক অপূর্ব্ব আনন্দ আনিয়া উপস্থিত করে। কত নীরব কবি যাহারা কথা বলিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কথা কহিবার নিষেধ থাকায় যাহাদিগের প্রাণ এতদিন কাঁদিতেছিল, এখন তাহারা গাহিয়া

উঠিবে ; ভাবুক ভাবের তরঙ্গে ডুব দিয়া অতল জলে কত রতন খুঁজিয়া পাইবে। চিন্তার আন্দোলনে সকলেই অন্তরের ভিতর একটী নূতন প্রাণের আবেগ অনুভব করিবে ; প্রাতঃকালের সুনীল আকাশের উপর শুভ্র মেঘগুলি খুব সজোরে যেমন কোন সুদূর আকাশের দিকে ছুটিয়া যায়, তেমনি সকলেরই অন্তঃকরণ এই নূতন জাগরণের সহিত—যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, যাহা মঙ্গল তাহার দিকে জোরে দৌড়িয়া যাইবে, যিনি জাগরণের কর্ত্তা তাঁহাকে বলিয়া উঠিবে—"বাতাসকে যেমন আপনি প্রেরণ করিয়াছেন আমাদিগের মনকে তেমনি মঙ্গলের দিকে জোরে পাঠাইয়া দিন,—আমরা যেন শুধু মঙ্গলের কথা শুনি।" এ জাগরণ যে সকলের জাগরণ, সমাজের সমস্ত ব্যক্তিরই জাগরণ। ইহা ত উচ্চ শিক্ষা,—মাধ্যমিক শিক্ষার কথা নহে, এ সার্ব্বজনীন শিক্ষা ; ছোট বড় দীন দরিদ্র সকলেরই শিক্ষা। বাতাস যখন বহে তখন সে ত সমস্ত দক্ষিণ দিকটা হইতেই বহে, কোন সঙ্কীর্ণ রাস্তা বা গলি দিয়া ত বহে না, ছোট বড় সব গাছের প্রাণের ভিতর দিয়া সমান ভাবেই বহে। বড় গাছ উঁচু মাথা জোরে নাড়িয়া তাহাকে খুব ডাকে সত্য, কিন্তু উঁচু বলিয়াই সে যে বাতাসের নিকট বেশী দাবী পায় তাহা নহে। আর বাতাস যদি শুধু উঁচু গাছের উপর দিয়াই বহিত তাহা হইলে আমরা ফলমূল কিছুই পাইতাম না, সমস্ত সমতল ক্ষুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইত। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে শিক্ষা সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, বট অশ্বত্থ গাছের নিকট হইতে যেমন ছোট ছোট ফলের বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না, সে সমাজের শিক্ষাতেও সেরূপ উন্নতি আশা করা যায় না ; এবং বিস্তৃত সমাজক্ষেত্রে কত প্রতিভা বিদ্যালাভের সুযোগ অভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহারও ইয়ত্তা হয় না। ধনী বংশে অথবা উচ্চ জাতিতে অধিক অনুপাতে প্রতিভা থাকা সম্ভব ; কিন্তু সমাজের দরিদ্র এবং

নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী, সুতরাং এখানে প্রতিভার অধিক পরিমাণ অবশ্যম্ভাবী। এমন কি দেশের মধ্যে যত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তাহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মে। এই প্রতিভার যাহাতে অপব্যয় না হয় তাহা ত প্রত্যেক সমাজেরই অবশ্যকর্ত্তব্য, এবং ইহার জন্য যত অর্থ-ব্যয় হউক না কেন তাহার ভার সমাজের অকাতরে গ্রহণ করা উচিত। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, যদি দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া একজন নিউটন, ডারউইন, সেক্সপিয়ার বা বেসমারকে পাওয়া যায় তাহা হইলে সে অর্থব্যয়ও সার্থক। যে সমাজে ইহাদিগের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটে না সে সমাজ ত তাহার নিজেরই উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া রাখে। বেসমারের ব্যবসায়িক আবিষ্কারে কত সহরের লোকের শিক্ষা ব্যয় ফিরিয়া পাওয়া গেছে। আবার সব শিক্ষার বিনিময়েই যে সমাজ অর্থ পাইবে তাহা নহে, তাহা দ্বারা এমন অনেক জিনিষ পাওয়া যাইবে /যা/ অমূল্য। দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা মহৎ জীবনের ভাবুকতা মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না, অথচ এইগুলি আমাদিগের সব চেয়ে বড় জিনিষ। রামপ্রসাদ বাঙ্গলার কোন অপরি-চিত গ্রামের কোণে বসিয়া আপন মনে মৃদু কণ্ঠে গান গাহিয়াছিলেন, ফোনোগ্রাফে যাঁহারা গান দেন তাঁহাদের মতন তিনি সেজন্য কোন অর্থ পান নাই, অথচ তাঁহার গানগুলি এই কয় শতাব্দী ধরিয়া আমা-দিগের জাতীয় জীবনের মধ্যে এমন একটী সুন্দর ভাবুকতা আনিয়া দিয়াছে যাহা আমাদিগের চিরকালের সামগ্রী। এরূপ মহৎ জীবন যদি সমাজের বিধিনিষেধের মধ্যে বিকাশ লাভ না করিত তাহা হইলে আমাদিগের নিভৃত পল্লী-জীবনের নিরানন্দ আরও যে কত পরিমাণে

বাড়িয়া উঠিত তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। আমাদের দেশের সামাজিক অনুষ্ঠানের গুণে এ জীবন বিফল হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে কোন জাতির গঠন হইয়াছে, কোন জাতীয় উন্নতির চেষ্টা দেখা গিয়াছে সেইখানে সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিরাট আয়োজন দেখা যায়। কারণ সার্ব্বজনীন শিক্ষা ব্যতিরেকে সমগ্র জাতীয় শক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান লোক-শিক্ষা-প্রণালীর দোষ পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিয়াছেন। শিক্ষায় অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়, অথচ শিক্ষার সহিত জীবিকা অর্জ্জনের কোন সম্বন্ধ না থাকায় অন্ন সংস্থানের কোন সুবিধা হয় না। উপরন্তু অন্ধকারময় বিদ্যালয়গৃহে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য তাহাদিগের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে। স্বাস্থ্যহানির জন্য অনেকের পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসা চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার অনেকে বিদেশী শিক্ষার ফলে বিলাসী হইয়া জাতিগত ব্যবসায়কে ঘৃণা করিতে শিখে। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রণালীতে যদি আমাদিগের দেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষা গবর্ণমেণ্ট প্রচার করেন তাহা হইলে দেশে যে খুব ক্ষতি হইবে তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আমার বোধ হয় অনেকে এ প্রকার অবস্থা ও শিক্ষা-প্রণালীর ফলে বিরক্ত হইয়া সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিরুদ্ধপক্ষ হইয়াছেন। কিন্তু দোষ যে শিক্ষা-প্রণালীর,—শিক্ষা জিনিষটার নহে তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। বস্তুতঃ উপযুক্ত প্রণালীতে যদি সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার হয় তাহা হইলে যে, দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

সমগ্র জাতির উপযোগী শিক্ষা-প্রণালী কি তাহা আমাদিগের খুব একটা ভাবিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। বিদ্যালয় সমূহের

যাহারা ছাত্র হইবে তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব,—সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধি অনুসারে যদি তাহাদিগকে বিত্যালয়ে পড়িতে বাধ্য করা যায় তাহা হইলে বিত্যালয়ে শিক্ষাকাল এমন হওয়া উচিত, যাহাতে তাহাদিগের লেখাপড়ার সহিত জীবিকার্জ্জনের তুমুল ঝগড়া না বাধে। আমার মনে হয় আমাদিগের দেশে শ্রমজীবী কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থা যত দিন সচ্ছল না হয় তত দিন রাত্রিই তাহাদিগের পক্ষে শিক্ষা লাভের উপযুক্ত সময়। আমাদিগের দেশে দরিদ্র কৃষককে অনেক সময় সমস্ত দিন ক্ষেত্রে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রমের বিরাম নাই, গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা ভোজন করিবারও সময় পায় না। ইহাদিগকে যদি প্রাতঃকালে বা মধ্যাহ্নে জোর করিয়া বিত্যালয়ে পাঠান যায় তাহা হইলে ইহাদিগের পক্ষে জীবিকার্জ্জন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় যদি বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারিত হয় তাহা হইলে নৈশ বিত্যালয় আমাদিগের দেশে শুভফলপ্রদ হইবে, দিনের অন্য সময় বিত্যালয়ের জন্য নির্দ্ধারিত করিলে দেশের কৃষক এবং শিল্পীদিগের অবস্থার অবনতি হইবার আশঙ্কা আছে।

তাহার পর শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষার সহিত দৈনন্দিন জীবন যাপনের খুব নিকট সম্বন্ধ থাকা উচিত। জীবিকার্জ্জন যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই লোকে যাহাতে ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান ও নির্দ্দেশ পায় তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। কৃষি এবং শিল্প-শিক্ষার আয়োজন চাই। প্রত্যেক গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিয়া ছাত্রদিগকে আধুনিক প্রণালীতে কৃষি দেখাইতে হইবে। কারখানায় শিল্পীরা ছাত্রদিগকে সূত্রধরের

কার্য্য, বয়ন প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দিবে। আঁকা,—এবং কাদার ছাঁচ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া চাই। কারখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে এদেশে হস্ত শিল্পের উন্নতি শীঘ্র হওয়া সম্ভব। প্রাথমিক বিজ্ঞান ও অঙ্কনও বিদ্যালয়ে শিখাইতে হইবে। কৃষিশিল্প, ও বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মনীতি ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

লোকশিক্ষা জাতীয়শিক্ষা হওয়া চাই, তাহা না হইলে শিক্ষা অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়ে। আমাদিগের দেশে যেগুলি প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য—যেমন রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত, মনসামঙ্গল প্রভৃতি, তাহারা কত যুগ যুগান্তের সাক্ষী, কত বিপ্লব ঝঞ্ঝা তাহাদিগের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহারা যে সকল আদর্শ আমাদিগের নিকট উপস্থিত করে সেই আদর্শ আমাদিগের প্রকৃত অন্তরের সামগ্রী, তাহা ছাড়িয়া আমরা যদি অন্য আলোকের দিকে ছুটিতে যাই, তাহা হইলে চিন্তা জগতে একটা অস্বাভাবিক বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইবে। দেশের যেগুলি চিরন্তন আদর্শ, যাহা নানা রকমে গানে, কাব্যে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে আমাদিগের দেশে ধ্যানী জ্ঞানী ও কর্ম্মীগণ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, সেগুলি যাহাতে প্রত্যেক পল্লী-সমাজে বিকাশলাভ করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাই স্বাভাবিক এবং হিতকর, অতএব সেই শিক্ষারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশে পল্লী-সমাজে কয়েকটি আদর্শ খুব উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, সেগুলি যেন বাঙ্গালারই নিজস্ব সম্পত্তি, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। যেমন হর-গৌরীর ছড়া ও গানগুলি। প্রথমে কন্যার সহিত পরিবারের সুদীর্ঘকালের বিচ্ছেদ, তাহার জন্য মেনকার আক্ষেপ, পরে আগমনীর মিলন গান এবং পুনরায় বিজয়া দশমীর দিনে দুঃসহ বিদায়

বেদনা,—এ সমস্তই বাঙ্গালী পরিবারেরই সুখদুঃখের গান। দুর্গোৎসবের মিলন এবং তাহার পর বিদায় এমন বাঙ্গালীর অন্তরের জিনিষ যে এ উৎসব-বাদ্য একবার বাজিয়া উঠিলে সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী এক সঙ্গে তাহার সহিত সাড়া দেয়! সতীর নিকট ভূতনাথই দেবতা। দক্ষ জামাতাকে দেখিতে পারেন না, তাই পিতার অনাদর কন্যাকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তবুও তিনি পিতৃভবনে না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। পিত্রালয়ে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, সতী স্বামীর বাক্য না শুনিয়াই পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু দক্ষ তাঁহাকে আদর করিলেন না, তাঁহার স্বামীকে খুব নিন্দা করিতে লাগিলেন। দুঃখে কন্যার বুক ফাটিয়া গেল, তিনি আর দক্ষের কন্যা থাকিলেন না; পিতার পদতলে অকস্মাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হইল। তাহার পর ভূতনাথের যে দারিদ্র্য তাহা দক্ষের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা অনেকগুণে মহৎ তাহাই দেখান হইল! এই ত পুরাতন কথা। কিন্তু এ যেন আমাদিগের নিকট চিরনূতন। পতিভক্তি ও কন্যার অনাদর, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাহার জন্য কন্যার ক্ষোভ ও দুঃখ, গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে এরূপ ট্র্যাজেডি ত প্রতিদিনই দেখা যায়। হর-গৌরীর গানগুলি গৃহধর্ম্মের একটা সুন্দর আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছে; বঙ্গের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই একটা সুন্দর ভাবুকতা আনিয়া দিয়াছে। মহাদেব যখন সতীদেহ আপনার স্কন্ধে রাখিয়া ঘোর নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন প্রলয় উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল, বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া ফেলিলেন। যেখানে সতীদেহের কোন অংশ পতিত হইল সেই স্থানই আমাদিগের মহাপীঠ স্থান। গার্হস্থ্য জীবনে সতীর প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান আর কিরূপে দেখান যাইতে পারে? তাহার পর আমাদিগের পল্লী-সমাজে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গান—

গুলি। বৃন্দাবন প্রকৃত সংসার হইতে অনেক দূরে, সেখানে শুধু প্রেম ও আনন্দ, দুঃখজ্বালা অনুতাপ পরিতাপ কিছুই নাই। এই গানগুলি অপূর্ব্ব ভাব জগতের একটি সুন্দর ও পবিত্র চিত্র। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালী আপনার দুঃখময় জীবনকে কেমন কবিতাময় করিয়া তুলিয়াছে। হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের গান ও ছড়াগুলির মত আমাদিগের ব্রতকথাগুলিও জাতীয় চরিত্রগঠনের এক অপরূপ সম্পদ। বাঙ্গালার পল্লী-সমাজে বার-মাসে যে তের পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীগণ যে সকল ব্রতকথা কহিয়া থাকেন সেগুলি আমাদিগের ঘরে ঘরে কত শতাব্দী ধরিয়া, অতিথিসেবা, শুদ্ধাচার, নিষ্ঠা, সংযম, পাপে ভয় এবং পুণ্যে আনন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে কেমন নীরবে ও সরলভাবে শিক্ষা দিতেছে।

বিবাহ-উৎসব বা অন্য কোন শুভকর্ম্ম উপলক্ষে স্ত্রীলোকদিগের গান, আখ্যায়িকা বা মঙ্গলম্ তামিল, তেলুগু ও কানাড়া প্রদেশে বিখ্যাত। কুর্গের জাতীয় সঙ্গীত প্রাণস্পর্শী, বিবাহের গান হর্ষোৎফুল্ল, এবং মৃত্যুর গান অতি করুণ, হৃদয়-বিদারক। ব্যাঘ্র শিকার করিলে কুর্গ স্ত্রীলোকগণ 'নারি-মঙ্গলম্' গাহিয়া বীরত্বকে সম্বর্দ্ধনা করে।

এ আমাদিগের জাতীয় আদর্শগুলি যেরূপ সোজা ও স্পষ্টভাবে সেইগুলিতে প্রকাশিত হয়, অন্য প্রকার সাহিত্যে তাহা হয় না। এই সকল লোকসাহিত্যের আদর্শ লইয়াই আমাদিগকে আধুনিক লোকশিক্ষা গঠন করিতে হইবে।

তাহার পর বিদ্যালয়ের বাহিরে আমাদিগের দেশে লোকশিক্ষার যে সকল অনুষ্ঠান আছে সেগুলিরও প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই যে আমাদিগের দেশে মুসলমানেরা বহু শতাব্দী হইতে মহরমের সময় মিছিল বাহির করে ইহার ঐতিহাসিক তথ্য কে না জানেন? কয় শত

বৎসরেরও পূর্ব্বে কারবালার মরুভূমিতে মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যের তাপে পিপাসাকাতর হোসেনের স্ত্রীপরিবার ও শিশু বালকবালিকাগণের যে ক্রন্দনধ্বনি আকাশে উঠিয়াছিল সেই হৃদয়স্পর্শী ধ্বনি বৎসরের মধ্যে একবার রাস্তায় রাস্তায় আবার শুনা যায়। সে কোন্ সুদূর যুগের কোন্ অতীত ইতিহাসের কথা। তবুও আমরা হোসেন ও তাঁহার অনুচরবর্গের বীরত্ব ও অসাধারণ তেজ যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি, এবং তাঁহার তৃষ্ণার্ত্ত পরিবারের দুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকি। মর্শিয়ার করুণ রাগিণী যখন গীত হইতে থাকে এবং মুসলমান রমণীগণ হোসেনের তাজিয়ার সম্মুখের রাস্তা জলে প্লাবিত করিয়া ফেলে, তখন মনে হয় সেই অতীতকালে যে ভীষণ পাপকার্য্য কারবালা-ভূমিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে পাপের বুঝি এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। এমনই প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেক বৎসরই হয়। হোসেনের বীরত্ব প্রতি বৎসরই মুসলমানদিগকে নূতন তেজে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। এই মহরম উৎসব ও মিছিল সেই সুদূঢ়কালের ঘটনাবলী আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জাতীয় চরিত্রগঠনের সহায়তা করে। মহরম উৎসবের মত মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফকির অথবা কোন পীরের আস্তানায় সম্মিলনে এবং হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দু উৎসব অথবা সাধু পুরুষের জন্মদিন বা মৃত্যু উপলক্ষে মেলায় যে সকল গান ও অভিনয় দেখান হয় সেগুলিও ইউরোপের মধ্যযুগে Passion ও Miracle অভিনয়ের মত আমাদিগের লোক-শিক্ষার সুন্দর উপায় হইয়া এখনও সজীব আছে।

উত্তর ভারতের দেওয়ালী উৎসবের প্রীতি সম্বর্দ্ধনা এবং মিছিল সম্প্রদায়ের পবিত্র স্মৃতিরক্ষা লোকশিক্ষার সুন্দর উপকরণ; এবং দক্ষিণ ভারতের সমুদায় নগর ও পল্লীগ্রামে মন্দিরে দেবদেবীগণের মাসিক

শোভাযাত্রা অথবা সরোবর-উৎসব কোন না কোন ঘটনা বা আখ্যায়িকার সহিত জড়িত হইয়া জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায়তা করে। উত্তর ভারতের ভাট চারণ ও মিরাসী এবং দক্ষিণ ভারতের জঙ্গম হরি কথা, ভজন ওয়ালা, দেবদাসী ও নাটু ভানগন লোক সাহিত্যকে সজীব রাখিয়াছে।

আমাদিগের পল্লী-সমাজে এখনও যে হরিসভায় সঙ্কীর্ত্তন এবং চণ্ডীমণ্ডপে রামপ্রসাদী এবং কমলাকান্তের চণ্ডীগান হইয়া থাকে, সেগুলিও জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ ধৰ্ম্মভাব প্রচারের এক প্রধান উপায়। এখন অনেক পল্লীগ্রাম হইতে হরিসভা উঠিয়া যাইতেছে, চণ্ডীমণ্ডপে আর আসর জমে না। এই বিষয়ের প্রতি সকলেরই এই সময় হইতে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ একবার নষ্ট হইলে পুনরায় ইহাদিগের উদ্ধার করা অসম্ভব হইবে। তাহার পর আমাদিগের কবিওয়ালা ও যাত্রার দল। কবিদলের সংখ্যা এখন বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে নিতাই দাস ও ভবানীবেনের যুদ্ধ—প্রচলিত কথায় "নিতে বৈষ্ণবের লড়াই" ভদ্র এবং অভদ্র লোক কিরূপ আগ্রহভরে এবং আনন্দের সহিত শুনিত, এখন আমরা তাহা ভাবিতেই পারি না। বৈঠকে বসিয়া একজন কবি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অপর কবিকে গান গাহিয়া মুখে মুখে তাহার উত্তর দিতে হইত। ইহা ত বড় সহজ নহে, কারণ অনেক সময়েই প্রশ্নগুলি ধৰ্ম্ম দর্শনের এমন কূট এবং জটিল সমস্যাযুক্ত যে, মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিলে তাহা বুঝাই যায় না। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে সভায় অপমান, আর যে কবি সঙ্গীত যুদ্ধে উত্তরটি আরও জটিলভাবে দিতে পারেন, যাহার পুনরুত্তর দান অসাধ্য তাঁহারই জয়, সভায় তাঁহার গলে মাল্য প্রদত্ত হয়। এই কার্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করা কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তবুও সে সময়ে আমাদিগের দেশে

জনসাধারণের মধ্য হইতে কৃষ্ণ কর্ম্মকার, পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলু পাটুনী, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা প্রভৃতি নগণ্য লোকই সমাজের গণ্যমান্য লোকদিগের বাটীতে আসর জমকাইয়া রাখিত। আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে কবিগান এখন শুনিতেই পাই না, যাত্রাদলের সংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে নাট্যকারগণকে অনেকে জনসাধারণের উপযোগী করিয়া যাত্রার পালা রচনা করিতে বলিতেছেন। তাঁহারা যদি উপযুক্ত বিষয় লইয়া যাত্রার পালা রচনা করেন এবং ভদ্র সন্তানগণ কেবল থিয়েটারে না যাইয়া একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া জনসাধারণের সহিত একত্রে যাত্রাও শুনেন তাহা হইলে যাত্রাগুলি রূঢ়তা ও অশ্লীলতা দোষ হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগের জনসাধারণের চরিত্রগঠনের সহজ ও সুন্দর উপায় হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দেশের আরও দুইটি লোকশিক্ষার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথম কথকতা। উৎসব বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে পল্লী-সমাজে প্রায়ই কথকতা হইত। কথক মহাশয়েরা রামায়ণ মহাভারত হইতে গল্প বলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে গানও হইত। রামধন, শ্রীধর, ধরণীধর, দুর্ল্লভ গোঁসাই প্রভৃতি ভাল ভাল কথকগণ এমন সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতেন যে সকলেই বিশেষ মনযোগসহকারে ৫।৬ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে তাঁহাদিগের কথা শুনিত। বাস্তবিক আমাদের দেশে কথকগণই প্রকৃত বাগ্মী। বাগ্মিতাবলে মনে যুগপৎ নানা ভাবের সঞ্চার করিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল! এখনও এদেশ কথকশূন্য হয় নাই, তবে কথকতার এখন আর পূর্ব্বের মত আদর নাই।

এখনকার সাধারণ প্রচলিত শিক্ষায় মনুষ্যের মনোবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় না, স্বাধীনভাবে

মনুষ্যকে চিন্তা করিতে দিলে তাহার বুদ্ধিশক্তি প্রখর হইবে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে এদেশে বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়া স্মরণশক্তির উপরই অধিক নির্ভর করা হয়। এদেশের বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে নামে শিক্ষা দেওয়া হয়, সাধারণ শিক্ষকদিগের ইহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। তাঁহারা ছাত্রদিগের নিকট হইতে অনেক সময়ে এমন কি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পাঠও মুখস্থ লইয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত কথক যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেন তাহা জটিল হইলেও যাহাতে সকলেরই বোধগম্য হয় তাহার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা থাকে, অনেক যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা বিষয়-গুলি আলোচিত হইতে থাকে, এই উপায়ে সকলেরই স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি যথোচিতভাবে নিয়োজিত হইয়া সহজে উন্নতি লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ পুস্তকের উপর অতিরিক্তভাবে নির্ভর করিতে না দিয়া এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে যদি বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও মঙ্গল এবং বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিচালিত হওয়াতে তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অধিকতর উপযুক্ত করিয়া তুলে। কয়েক বৎসর হইল ইউরোপের ডেনমার্ক প্রদেশে ক্রিষ্টেন কল্ড্ নামক এক ব্যক্তি কৃষকদিগের মধ্যে কথকতার মত মুখে মুখে কথাচ্ছলে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যালয়গুলি খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই উপায়ে ডেনমার্ক প্রদেশের সাহিত্য, কৃষি এবং শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই কথকতা আমাদের দেশে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, পরন্তু উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে কথকতাই যাহাতে শিক্ষার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়ায় তার দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদিগের সমাজে পরিব্রাজক সাধুসন্ন্যাসী অথবা ফকিরগণ

জাতীয়জীবন গঠনের কিরূপ সহায়তা করে তাহা আমরা বড় ভাবিয়া দেখি না। কোন্ অতীত কাল হইতে ইঁহারা যে আমাদিগের দেশে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন তাহা বলা কঠিন। পরিব্রাজক কত তীর্থ কত দেশ গমন করিয়া কত পুণ্য কত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যখন গৃহে অতিথি হইয়া আসেন, গৃহী তাঁহার পাদোদক লইয়া বলে, "আপনার চরণরেণুতে কত তীর্থের ধূলিকণা রহিয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া, আমাকে পবিত্র করুন।" পরিব্রাজক তাঁহাকে পাদোদক্ দানে কৃতার্থ করেন। কত সুদূর প্রদেশের চিন্তাজীবনের মধ্যে দিন কাটাইয়া তিনি যে সকল নূতন আলোক পাইয়াছেন সে আলোক তিনি যতদিন গ্রামে গ্রামে বিতরণ করেন ততদিন তাঁহার বিশ্রাম নাই। তাই আমাদিগের সমাজে যত বড দেশব্যাপী আন্দোলন হইয়া গিয়াছে সকলেরই মূলে এই পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসী। আমাদিগের মধ্যে সাধুসেবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভিক্ষা দানের অনুষ্ঠান আছে, তাহা লোকশিক্ষার ব্যয় বহনের কেমন সুন্দর উপায়। বাঙ্গালী ভিক্ষুকেরা রামপ্রসাদের, দাশুরায়ের বা নীলকণ্ঠের অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব ভক্তের গান গাহিয়া কেমন নীরবে পল্লীগ্রামের গৃহে গৃহে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিই, কিন্তু যাহা পাই তাহা ত চিরকালের জিনিষ; তবুও এক মুষ্টি ভিক্ষা আমরা অনেক সময়ে সন্তুষ্ট হইয়া দিই না। পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আজকাল অনেকে ভিক্ষুকমাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু সাধু ভিক্ষুকের মধ্যেই ত ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈরাগ্যের আদর্শ প্রকাশ পায়; সে আদর্শ যেন আমরা নিন্দা না করি। কাঙ্গাল ভিক্ষুক যে চিরকালই ভারতবাসীর শিক্ষক, সে শিক্ষককে যেন আমরা চিরকালই মাথায় করিয়া রাখি। দেশে দেশে ঘুরিয়া এই কাঙ্গাল সাধুই ত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক

জীবনের ঐক্যের সম্বল ও প্রতিরূপ, তাহার গৈরিক ছিন্নগ্রন্থি অতীতের সাক্ষী হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছে।

লোকশিক্ষার এই সকল অনুষ্ঠানগুলি নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত অথবা নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া যাহাতে আধুনিক সমাজের বিশেষ উপযোগী হয়, সে সম্বন্ধে এখন সকলেরই চিন্তা করা উচিত। এখনকার সমাজে আমাদের পুরাতনশিক্ষার আদর্শ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলিরও সেরূপ প্রাণ নাই। ইহার ফলে আমাদিগের জাতীয় আদর্শগুলিও ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়িতেছে। নূতন যুগের নূতন চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের মধ্যে আমাদিগের স্বকীয় শিক্ষার আদর্শ-গুলি যাহাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং আমাদিগের দেশের শিক্ষার রীতি প্রণালী ও অনুষ্ঠানগুলি আধুনিক সমাজে যাহাতে আরও উপযোগী এবং কল্যাণপ্রদ হয়, তাহা আমাদিগের বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষীগণ আলোচনা করিয়া ঠিক করিয়া দিন,—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা!

বার্ত্তা আনিয়া দিতেছে। বিচিত্র তরুলতা, সুনীল আকাশ, অসংখ্য তারকারাজির সহিত তাহারা এখন নূতন পরিচয় লাভ করিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেছে। বাঙ্গালার কৃষক ও শ্রমজীবী সমাজে নবজীবনের উন্মেষ দেখা গিয়াছে। ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা শ্রমজীবীগণের মধ্যে যেমন নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে, শিল্পশিক্ষাও তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের সহায় হইয়া হৃদয়ে নূতন বল প্রদান করিতেছে।

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য।

সাত বৎসর হইল, আমাদিগের শ্রমজীবিশিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে আমরা কিছুই ফল পাই নাই, অকৃতকার্য্য হইলাম মনে করিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে শ্রমজীবিগণের উন্নতি দেখিয়া সকলেরই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে যে আমাদিগের উদ্যম কিয়ৎপরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় ; কারণ, শিক্ষার ফল কখনও শীঘ্রই পাওয়া যায় না। অনেক নিষ্ঠা ও সংযম অভ্যাসের পর অনেক দুঃখ ও ব্যর্থপ্রয়াসের মধ্য দিয়া ছাত্রের চরিত্র ফুটিয়া উঠে। তাই হঠাৎ ফল না পাইলে নিরাশ হইবার কারণ নাই। লোকশিক্ষা-প্রদানের কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের এই কথাটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মানুষকে ত একদিনে গড়িয়া তুলা যায় না ; তাই শিক্ষককে বহুবৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, ফলপ্রত্যাশী না হইয়া কর্ত্তব্যপথে ধীরভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। ফলের জন্য ব্যগ্র হইলে উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতে পারে। তাই অসংখ্য অসম্পূর্ণতার বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইয়া আমাদিগকে স্থির দৃষ্টিতে উচ্চতম

আদর্শকে নিরীক্ষণ করিতে হইবে, নৈরাশ্যের অন্ধকারকে একমাত্র আলোক মনে করিয়া অটল বিশ্বাসের সহিত দুরূহ ও কণ্টকময় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান লোকশিক্ষার ব্রতিগণকে সে বিশ্বাস দান করিয়া তাঁহাদিগের সহায় হউন।

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রমজীবিগণকে কতকগুলি বই মুখস্থ করান নহে। মানসিক বৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তুলা শিক্ষার চরম আদর্শ। আমাদিগের দেশের শ্রমজীবীদিগের চরিত্রে কতকগুলি দোষ আছে। গুণগুলি যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং দোষগুলি সংশোধিত হয়, শিক্ষকের তাহাই চিন্তার বিষয়।

জনসাধারণের চরিত্রগুণ।

আমাদিগের জনসাধারণের চরিত্রের প্রধান গুণ তাহাদিগের আধ্যাত্মিকতা। যে কারণে এই চরিত্রের প্রভাব হউক না কেন, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের বহুলপ্রচার ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা ও আন্দোলন জাতীয় চরিত্রের এই গুণটিকে এখনও উজ্জ্বল রাখিয়াছে। বাংলার কৃষক শ্রমজীবীদিগের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণতা পৃথিবীর অন্য দেশে নাই। কোন বাঙালী কৃষক সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা-শোক-দুঃখে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলেও সান্ত্বনার কথা বলিতে যাইলে সে এরূপ দুই একটি ভাব প্রকাশ করিবে, যাহা অত্যন্ত গভীর, যাহা জ্ঞানের নহে, অনুভূতির সামগ্রী, এবং যাহা তাহার অন্তরতম অন্তরের সামগ্রী বলিয়া সে গৌরব অনুভব করে। এরূপ ভাব, সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় ধারণা, ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তি, অদৃষ্টের প্রতি অটল নির্ভরতা, অন্য কোন জাতির জনসাধারণের হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। ইহা গবেষণার ফল নহে,

বিদ্যালাভের ফল নহে, বহুকালব্যাপী জাতীয় সংযম ও অভ্যাসের ফল! ইউরোপীয় জাতিসমূহের এই সাধনা নাই বলিয়া ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের এইরূপ প্রভেদ, এবং ইহার জন্যই ইউরোপীয় লোকসাহিত্যে ও ভারতবর্ষের লোকসাহিত্যে এইরূপ বৈষম্য। ইউরোপীয় জনসাধারণের গানে, গল্পগুজবে, আমোদ-আহ্লাদে জীবনের ক্ষুধা ও ইন্দ্রিয়ভোগ অধিক প্রতিভাত। আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রেম ও ভক্তি বশতঃ আমাদের লোকসাহিত্যে এরূপ একটা ভাবুকতা আছে—যাহা ইউরোপীয় জাতিসমূহের উচ্চ সাহিত্যেও বিরল। আমাদের কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবিগণের মধ্যে প্রচলিত রামপ্রসাদী গান, ভাটিয়াল গান, হরগৌরীর গান, বাউলের গান, প্রভৃতিতে এমন অনেক উচ্চ ভাব আছে, যাহা একজন ইউরোপীয় দার্শনিককে বিশ্লেষণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়।

মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা।

বাস্তবিক বাঙালীসমাজ যে এত ভাবুকতাপূর্ণ, সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া যে একটা ভাবুকতার সঞ্জীবনী স্রোত এখনও বহিয়া যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদের জনসমাজের উদার ও মহৎ প্রাণ। আমাদের মধ্যবিত্ত-সমাজ আধুনিক কৃত্রিম শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুভারে ক্রমশঃ হীনবল পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মধ্যবিত্তজীবন বহুবর্ষ হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে গঠিত হইতেছে। এ শিক্ষার আদর্শের সহিত জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য হয় নাই বলিয়া শিক্ষা জীবনকে একটা সার্থকতার দিকে লইয়া না যাইয়া, একটা সর্ব্বাঙ্গীন পরিসমাপ্তিতে

পর্য্যবসিত না করিয়া ক্রমশঃ একটা অন্ধকার অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছে। তাই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে এরূপ কৃত্রিমতা, এরূপ অস্বাভাবিকতা, এরূপ সরলতার অভাব। যাহা কৃত্রিম, তাহার বিকাশ নাই। যাহা সহজ, সরল, তাহার ত বন্ধন নাই, তাহাই উন্নতিশীল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, সমাজের দুর্ভাগ্য, এই কৃত্রিমতাপরিপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজ আপনার চিন্তা ও কর্ম্মের মাপকাঠিতে সমগ্র সমাজের আদর্শ গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। যদি মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ কখনও জনসমাজে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে সে সময় যে হিন্দু-সমাজ, ভারতীয় সভ্যতা ও জগতের সভ্যতার পক্ষে ঘোর দুর্দ্দিন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বিশ্বাস, সে দিন কখনই আসিবে না। কারণ, কৃত্রিমতার জয় কতদিন থাকে?

আধুনিক সাহিত্যের পঙ্গুতা।

আমাদের আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এই কৃত্রিমতা যে কত নিষ্ফল, তাহা বুঝিতে পারিব। বর্ত্তমান বাঙালা-সাহিত্যে এখন কৃত্রিমতা বুঝাইতে হইবে না। বাঙালা-সাহিত্যে এখন রচনাকৌশল আছে, বাক্যবিন্যাস আছে, কলাকৌশল প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু অকৃত্রিম ভাব নাই, সরলতা নাই, সহজ ও স্বাভাবিক ভাবুকতা নাই। ভাবুকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যখন বাঙালী ভাবুকতাকে জগৎসভ্যতা-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তখনও বলিতে হইবে, বাঙালা সাহিত্য সহজ নহে, সরল নহে, অকৃত্রিম নহে। আর এই সরলতার অভাবের জন্যই সাহিত্য তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়াছে। মধ্যবিত্তসমাজের আজীবন কৃত্রিমতার মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। তাই সাহিত্য সমাজের মর্ম্মস্থলের ভিতর

নিবিড় আনন্দ-সঞ্চার করিতে পারে নাই, সাহিত্যের বাণী সমাজের মর্ম্মস্থলকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। সাহিত্যের প্রাণ যে রক্তের মত সমাজের রুদ্ধ ধমনীসমূহের ভিতর দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হইয়া সমাজকে জীবন-চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিয়া তুলে, সমাজের জীবনস্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া এক অপূর্ব্ব পুলক, এক নিবিড় অনুভূতি আনিয়া দেয়। সে প্রাণ কি আমাদের আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের আছে?

প্রাচীন সাহিত্যে প্রাণের পরিচয়।

আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের সে প্রাণ নাই। সে প্রাণ, সে সঞ্জীবনী-শক্তি প্রাচীন বাঙালা-সাহিত্যে ছিল। সে প্রাণের পরিচয় কৃত্তিবাস-কাশীরামদাসে পাওয়া যায়; ধর্ম্মমঙ্গলে, মনসার ভাসানে পাওয়া যায়। সেই প্রাণে অনুপ্রাণিত দরিদ্র কবি মুকুন্দরামের কাব্য। কবিকঙ্কণের চণ্ডীর সহিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের তুলনা করিলে সাহিত্যে প্রাণ না থাকিলে কি দশা হয়, তাহা বুঝা যাইবে। জনসাধারণের বাণী মুকুন্দরামের কাব্যে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, আর কোন বাঙালীর কাব্যে সেরূপ প্রকাশ পায় নাই। বাঙালী সমাজ যদি আবার কখন জাতীয় আদর্শবিকাশে মহীয়ান্ হইয়া উঠে, তখন বুঝিবে, মুকুন্দরামের অকৃত্রিম ও ভাষাপারিপাট্যবিহীন সাহিত্য বাঙালীর মর্ম্মকথা এত স্পষ্ট, সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছে যে, আর কোন কাব্যসাহিত্য তাহা করিতে পারে নাই।

কবিকঙ্কণের কাব্যে কাহাদিগের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে? দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সাধ্বী বাঙালীরমণী ফুল্লরার চরিত্র; বাঙালী সদাগর ধনপতি শ্রীমন্ত ও সদাগরপত্নী খুল্লনার চরিত্র।

কবিকঙ্কণ দরিদ্রের ভাঙা কুটীর চিত্রিত করিয়াছেন, দরিদ্র বাঙালীর সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ জনসাধারণের কবি, তাই তাঁহার কালকেতু কুঁড়েঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও রামচন্দ্র অর্জ্জুনের সহিত সমান স্থান অধিকার করিয়াছেন; তাই ফুল্লরা ও খুল্লনা, অশিক্ষিতা নিম্নবংশীয়া হইলেও সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর সহোদরা ভগ্নী-রূপে গৃহীত হইয়াছেন।

কবিকঙ্কণের সাহিত্যের সহিত পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য তুলনা করিলে, ভারতচন্দ্রের যুগের কথা স্মরণ করিলে, দেখিতে পাই, সাহিত্য কিরূপ বিকৃত অবস্থায় আসিয়াছে। এ সাহিত্যে ভাষা সুন্দর ও মার্জ্জিত, কিন্তু আদর্শ হীন ও মলিন। এ সাহিত্যে আবেগ নাই, সরলতা নাই,—আছে কেবল অসংযম, হৃদয়হীনতা, কৃত্রিমতা। এ সাহিত্য মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে উহার গরল,—বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌এর মত। সাহিত্য তখন জনসমাজ—দেশের প্রাণ হইতে আপনার শক্তি সঞ্চয় করে নাই বলিয়া উহার এত দুর্দ্দশা। বিজাতীয় মুসলমানী আদর্শ, কুরুচি-কলুষিত মুসলমানী শিক্ষা-দীক্ষায় সাহিত্য পুষ্ট হইতেছিল বলিয়া সাহিত্য বিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু কবিওয়ালাগণ রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকিয়া নিভৃত পল্লীগ্রামে জনসাধারণের হৃদয়ের কথা গাইয়া এই বিকৃত রুচির দিনেও সাহিত্যের প্রাণকে সজীব রাখিয়াছিল।

তাহার পর বহুশতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। টেকচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব, বঙ্কিম, হেম, নবীন, মাইকেলের ভিতর দিয়া বাঙালীর সাহিত্যসাধনা এক নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে। আরও অগ্রসর হইবে,—বিশ্বসভ্যতা-মন্দিরের দিকে কতদূর অগ্রসর হইবে, বিশ্বসভ্যতা-মন্দিরে বাঙালা-সাহিত্য কি অঞ্জলি প্রদান করিবে, তাহার

পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে পাওয়া যাইবে। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ধারাগুলি ক্রমবিকসিত হইয়া আসিয়া মিশিয়াছে ; শুধু মিশিয়াছে নহে, সমুদ্রে নদীগণের মত একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-গৌরবের কেবলমাত্র উত্তরাধিকারী নহেন ; তিনি স্বয়ং একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি স্রষ্টা ও তিনি পরিদর্শক, যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সে জগতে শুধু বাঙালীর জাতীয়তা নহে, বিশ্বসভ্যতাও সার্থকতা লাভ করিবে, সে জগতে পৌঁছিবার পথ কবি তাঁহার গানে, কাব্যে, উপন্যাসে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালীর জনম বিফল নহে এ প্রাণ।"

তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য শুধু বাঙালীর সাহিত্য নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্য সার্ব্বজনীন নহে।

কিন্তু যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঙালীর যুগযুগান্তরের সাধনা নিহিত, যে রবীন্দ্রসাহিত্যে ভবিষ্যৎ বাঙালীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সূচিত হইয়াছে, সে সাহিত্য কি বাঙালীর অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত নিকটতম হইলেও এত দূরে কেন?

ইহা রবীন্দ্রনাথের দোষ নহে, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্য। আমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তা-প্রণালীর সহিত আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আধুনিক

সাহিত্য জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় বলা যায় না। কারণ, প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষিত উকীল, ব্যারিষ্টার, মাষ্টার, কেরাণী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতি, জোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।

সাহিত্য ও জনসমাজ।

ইহাদিগের ভাব ও চিন্তাই সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ। এই মূল প্রস্রবণের সঞ্জীবনী অমৃতধারা হইতে সাহিত্য যদি বহুকাল বঞ্চিত থাকে, তবে সে সাহিত্যে কাহারও পিপাসা মিটিবে না, সে সাহিত্য অস্বাস্থ্য আনিবে, স্বাস্থ্য আনিবে না। আর সে সাহিত্যের জীবনও অধিক কালের নহে। বালুকারাশির মত কৃত্রিমতা সে সাহিত্যধারার গতি রোধ করিবেই এবং অচিরে বাক্যবিন্যাস ও হৃদয়হীনতার শুষ্ক মরুভূমিতে সে সাহিত্যধারা জীবন হারাইবে। পক্ষান্তরে জনসমাজ—যাহা সমাজের মর্ম্মস্থল, সাহিত্যে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিলে, জনসমাজের অভাব ও আদর্শ সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করিলে, সাহিত্য অমর হইবে। নদীর স্রোতের মত সে সাহিত্য প্রতিমুহূর্ত্তে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমাজক্ষেত্রকে সুশ্যামলতা ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে, এবং সে সাহিত্যই জাতির সমগ্র ভাবরাশিকে বিশ্বসভ্যতারূপ মহাসমুদ্রের দিকে নিশ্চিতই পৌঁছাইয়া দিবে।

বিশ্বসাহিত্যে জনসাধারণের বাণী।

বিশ্বসাহিত্যে এ শক্তির পরিচয় যে প্রায়ই ঘটে, তাহা নহে। তবুও যখন কোন সাহিত্য এ শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন, তখনি ইহাকে অমর ও

অসীম তেজসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। উইলিয়ম ল্যাঙ্গল্যাণ্ড (William Langland) তাঁহার Piers the Plowmanএ দরিদ্রের ক্রন্দন প্রকাশ করিয়া অমর হইয়াছেন। জন বল (John Ball) তাঁহার When Adam delved and Eve span, Who was then the gentleman ছন্দে যখন স্বর তুলিয়াছিলেন,তাহা তৎকালীন ইংলণ্ডের সমাজে যে বিপুল আন্দোলন আনিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। Arthurian Legends ও Ballad গানেও জনসাধারণের বাণী অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ গান ও গল্পগুলিকে অবলম্বন করিয়া যখন কোন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তখনি তাহা জনসমাজের অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডে ওয়াল্টার স্কট (Walter Scott) পুরাতন চারণদিগের গানগুলি নূতনভাবে চালাইয়া দিয়া সাহিত্যে এক নূতন সুর আনিয়াছিলেন; জনসাধারণের আত্মাকে তিনি কিরূপ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার Wizard of the North নামেই প্রমাণ। রবার্ট বার্ন্স্ (Robert Burns) অসংস্কৃত ভাষায় কৃষকের প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়া সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইংলণ্ডে গ্রে, কলিন্স, কাউপার (Gray, Collins, Cowper) দরিদ্রের সুখদুঃখের কথা গাহিয়াছিলেন। জর্ম্মানসাহিত্যে হার্ডার, ফরাসীসাহিত্যে ভিক্তর হ্যুগো (Victor Hugo) এবং রুশ সাহিত্যে কারামসিন (Karamsin);—প্রত্যেকের প্রতিভা ও অকৃত্রিমতা জনসমাজের সহিত সমবেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিন জনই আপনাদের লেখনীপ্রভাবে স্ব স্ব সমাজে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। সাহিত্যসম্বন্ধে Karamsin কি বলিয়াছিলেন?—তুমি লেখক হইতে চাহ? তবে তুমি তোমার জাতির শত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখ-বেদনার কাহিনী পড়। তাহাতেও যদি তোমার অন্তঃকরণ না কাঁদিয়া উঠে, তবে কলম ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও। তোমার পাষাণ হৃদয়কে সকলে চিনুক।

Tolstoy বা Dostoeivesky নিপীড়িত জাতির চক্ষের জলে সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। গরকির সৃষ্টিছাড়া জোরালো গল্প-সাহিত্যের সঙ্গে ভোগবিলাসী কৃত্রিম পুস্কিন-সাহিত্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ। বাঙালা সাহিত্যের গতির সহিত জাতীয় সুখ-দুঃখময় জীবনের প্রাণধারার শুভ সম্মিলন হইলে রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী সাহিত্য অসীম শক্তির পরিচয় দিবে।

রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে"।

রবীন্দ্রনাথ একবার উদ্বেগকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন,

ওরে তুই ওঠ্ আজি
আগুন লেগেছে কোথা? কার কণ্ঠ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগতজনে? কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল?

*　　　*　　　*

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণকাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তারপরে, সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি';
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ; নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,

নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে,—এই সব মূঢ় ম্লান মুক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!

* * *

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ—
তবে তাই লহ সাথে—তবে তাই কর আজি দান;
বড় দুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দারিদ্র্য, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।
এবার ফিরাও মোরে,—লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী!
ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়!

* * *

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসর প্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে!
যে দিন জগতে চলে আসি
কেন মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি?

* * *

সে বাঁশিতে শিখেছি যে স্বর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে উঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে "বিশ্বাসের ছবি" আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সঙ্গীত, জনসাধারণকে, সমগ্রজাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুর্ভাগ্য আমাদের। দুর্ভাগ্য আমাদের সাহিত্যের।

পোষাকী সাহিত্য ও আটপৌরে সাহিত্য।

আমাদের সাহিত্যে কোন্ গান ও কোন্ কাব্য অমর হইয়াছে, কোন্ গান সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে যাইলে দেখিব, আমাদের আধুনিক সহিত্যিকগণের সহিত সমাজের কোন যোগই নাই। কোন্ কবির গান আমাদের সমাজে আদরণীয়? রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান নহে। জ্ঞানদাস চণ্ডিদাসের গান, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের গান, নীলকণ্ঠ ও বাউলের গান, ভাটিয়াল গান, গম্ভীরার গান, হরুঠাকুর, গোপাল উড়ের গান। অনেকে বলিবেন, আমাদের জনসমাজে ধর্ম্মসঙ্গীত ভিন্ন অপর সঙ্গীত সহে না তাহা অনেকটা ঠিক, কারণ, ধর্ম্মই আমাদের সমাজের অন্তরতম প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিগণ কি ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করেন নাই? তাঁহাদিগের ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি সার্ব্বজনীন.

হইল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর,—ইঁহাদিগের গানের ভাব সহজ নহে, সরল নহে, অকৃত্রিম নহে, ইঁহাদিগের ভাষাই এই কৃত্রিমতার প্রধান সাক্ষী। ভাব ও ভাষার কৃত্রিমতার জন্যই ইঁহাদিগের গানগুলি সার্ব্বজনীন হইতে পারে নাই। শুধু ধর্ম্মসঙ্গীতে কেন প্রেম-সঙ্গীতগুলিতেও এই কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়। আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যে প্রেমসঙ্গীতের অভাব নাই, কিন্তু শ্রীধর, রামবসু, নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত ভিন্ন বাঙালী কৃষক শিল্পী অপর কাহারও গান ত কখনই গাহে না।

এই সকল কারণে আমার অনেক সময় মনে হয়, আমাদের আধুনিক সাহিত্য পোষাকী, আটপৌরে নহে, ইহা বিলাসিতা, সৌখীনতার উপকরণ; জল বাতাসের মত আমাদের অত্যাবশ্যক, আমাদের আত্মীয় নহে; ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ইহা club, drawing room অথবা parlourএর কল্পনার সামগ্রী মাত্র। সেখান হইতে ইহার অন্য কোন স্থানে গমনাগমনের হুকুম নাই। আমাদের সাহিত্যের স্বাধীনতা নাই। আমাদের সাহিত্য শিল্পকলা, কারুকার্য্য, নৈপুণ্য ও অলঙ্কারের বোঝায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সাহিত্যের বাণী দেশের হাট মাঠ ঘাট বাটে শুনা যায় না।

"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি ঢালিব ঝরণা ধারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।"

আমাদের সাহিত্যের সে শক্তি, সে তেজ নাই।

লোকসাহিত্যের শক্তি ও স্বাধীনতা।

সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন হইতে হইলে সাহিত্যের ভাষা, উপমা, imagery বা শব্দের ছবি, ভাবের অভিব্যঞ্জনার পদ্ধতি সার্ব্বজনীন

হওয়া চাই। একটা উপমা, একটা imagery, বা শব্দের ছবি খুব সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহা যদি কল্পনার সামগ্রী হয়, দেশের সমাজের বাস্তবজীবনের সহিত যদি তাহার সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে উহা কবির মস্তিষ্কের একটা abstract বা বস্তু-অনপেক্ষ ভাবময় অলীক ধারণা হইয়া থাকিবে মাত্র, তাহা জাতির হৃদয়ে স্থান পাইবে না। গম্ভীরার গায়ক গাহিলেন,

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর
কর্ম্মক্ষেত্র এ ব্রহ্মাণ্ডক্ষেত্র তব হর।

* * *

মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে
কর্ম্ম-জুয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়ারজ্জু নাসায় ছেঁদে
কতই বা আর তাড় ?
সুখ দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জুয়ালে আছে যোতা
আশা লাঠির দিচ্ছে গুঁতা
ওহে দিগম্বর !

এ গানের imagery বা ছবিগুলি কল্পনা করিতে হয় নাই। কল্পনা বরং কবিকে আশ্রয় করিয়া এমন একটা সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল, যে, প্রত্যেক কৃষক পল্লীবাসীই সে ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইল। এ গান অমর, কারণ দেশের কৃষকের প্রাণকে ইহা স্পর্শ করিয়াছে। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ যখন বাউলের সুরে গাহিলেন।

দোকানি ভাই, দোকান সার না।
কত করবি আর বেচাকেনা॥

ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশলা, চোর দুজন মিলে,
(দোকানি);
ও তোর মহাজনের
(ওরে ও, ও দোকানি)
কি করিবি, তাগাদির দিন বল না॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
এখন, মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গো ব্যথা,
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল;
(তার মত আর দয়াল নাই রে)
শুনলে সাওয়াল, তোরে নিদয় হবেন না॥

অমনি সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী এ সুরে সাড়া দিয়া উঠিল। পূর্ব্ববঙ্গের মাঝি 'ভাটির স্রোতে ভাটার গড়ানে" নৌকা ছাড়িয়া যখন গাহিয়া উঠিল—

ওগো দরদী—আমার মন কেন
উদাসী হইতে চায়?
ও তার ডাক নাহি, হাক নাহি গো
আপনি আসে চইলে যায়।

ধৈর্য্য না ধরে অন্তরে
সদা কেঁপে উঠে মন শিহরে,
যেন নীরবে, স্বরবে সদা—
ডাকিতেছে আয় গো আয়।

যেন ভাটির স্রোতে ভাটার গড়ান
সাগর যেমন সদা গো টানে
নদীর পরাণ
সে টান এতই সরল, মনেরই গরল
অমৃত হইয়ে যায়।

তখন তাহার ভাব ভাষা কল্পনা একেবারে শ্রোতার মনের মধ্যে গিয়া পৌঁছে! যুগযুগান্তর ধরিয়া তুমি উদাসী হইয়া ব্যাকুল ভাবে ভগবানকে খুঁজিতেছ, সে খোঁজার অন্ত নাই, আড়ম্বর নাই, আছে কেবল ক্ষণে ক্ষণে পুলক-বেদনা ; আর তিনিও কত না যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমাকে নীরবে অথচ স্বরবে 'আয় আয় গো আয়' বলিয়া ডাকিতেছেন। এ ডাকে এ আকুল আকর্ষণে সাড়া না দিয়া থাকা যায় না, এ প্রেমের টানে তোমার সব কুটিলতা সব পাপ এক নিমেষে দূর হইবে। তুমি অমৃতময় হইবে। এ প্রকার সাহিত্য অমর, সার্ব্বজনীন। ইহার ভাব যেরূপ উচ্চ ইহার ভাবের অভিব্যঞ্জনার পদ্ধতি সেরূপ সহজ ও সরল। এ সাহিত্যে "ভাবের কুজ্ঝটিকা ও ভাষার ব্যাস-কূট" নাই। এ সাহিত্য মর্ম্মস্পর্শী, প্রাণোন্মাদনকারী।

লোকসাহিত্যে হিন্দুসমাজের বাণী।

আর যদি বাঙালীর বাঙালীত্ব কিছু থাকে তবে আমাদের এই সাহিত্যেই উহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, বাংলার দরিদ্র জনসাধারণ কৃষক শিল্পীগণই বাঙালীর বাঙালীত্বকে এখনও সজীব সতেজ রাখিয়াছে। বাঙালীত্ব কি তাহা পূর্ব্বেই সূচনা করিয়াছি,—ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর অনন্তবোধ ;—সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও একটা অসীমে প্রীতি একটা অনন্তের আকর্ষণ। শুধু যে একটা মুক্তির প্রতীক্ষা, বন্ধন ছিঁড়িবার আকাঙ্ক্ষা,

তাহা নহে ; দৈনন্দিন, কঠোর জীবনকেও এই অসীমে প্রীতির দ্বারা মধুর, সরস করিয়া তুলা, সংসারের ক্ষুদ্র কার্য্যকলাপ, অসীম মানবের সমস্ত বন্ধনকে ঐ অনন্তবোধের দ্বারা অনুরঞ্জিত করা,—সংসার ও সন্ন্যাস, বন্ধন ও মুক্তি, ভোগ ও ত্যাগ, ইন্দ্রিয় ও তুরীয়, সসীম ও অসীমের সমন্বয় সাধন।

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

ইহাই হিন্দুসমাজের, বাঙালী সমাজের অন্তরতম প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ; ইহাই হিন্দুসাহিত্যের, বাংলার লোকসাহিত্যের বাণী।

সমাজ ও সাহিত্য বিপ্লব।

এই আকাঙ্ক্ষা, এই সুর বাংলার জনসমাজে এখনও পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা, এই ভাবুকতা, এই আধ্যাত্মিকতাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক বাঙালা সমাজের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু দায়িত্ব। আধুনিক লোকশিক্ষকের ইহাই মহত্তম কর্ত্তব্য। এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ ও সাহিত্যের ভাব ও চিন্তার কৃত্রিমতাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। লোকশিক্ষক দেশের জনসাধারণের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যের আমূল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিবেন, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিপ্লবের তিনি নেতা হইবেন।

লোকশিক্ষক ও যুগান্তর।

জনসাধারণের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতা বিকাশের ফলে, আধুনিক বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যজগতে এই বিপ্লবসাধনের ফলে, বাঙালী সমাজ ও সাহিত্য আরও জাতীয়, আরও মহনীয় হইয়া উঠিবে, বাংলার

সমাজ ও সাহিত্য নূতন ফল ও নূতন প্রাণ লাভ করিবে, বাঙালীর বাণী বিশ্বজগতের চিন্তাক্ষেত্রে আরও বিচিত্র, মধুর ও অমোঘ সুরে বাজিয়া উঠিবে। বাস্তবিক লোকশিক্ষক বাংলার সমাজে এক যুগান্তর আনিবেন।

জনসাধারণের এই আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া লোকশিক্ষক যে সন্তুষ্ট থাকিবেন তাহা নহে। এই আধ্যাত্মিকতাকে তিনি কার্য্যকরী করিয়া তুলিবেন।

লোকশিক্ষকের কর্ম্মক্ষেত্র।

দেশে আধুনিক কালে জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা অবসাদ, আলস্য ও কর্ম্মের প্রতি অনাদর জন্মিয়াছে যাহা দূর করা অত্যাবশ্যক এবং যাহা দূর করা এখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। জনসাধারণের এখন অসংখ্য অভাব, নিত্যনৈমিত্তিক অভাবের তাড়নায় তাহারা জর্জ্জরিত, কিন্তু অভাব-সমুদয় মোচন করিবার জন্য তাহাদিগের বিশেষ ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুলতা থাকিলেও তাহাদিগের কার্য্যশক্তি অত্যন্ত অল্প। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছে। কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতাকে আপনার পল্লীসমাজে সজীব রাখিয়া জনসাধারণের কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে অনেককাল অভ্যাসের অভাবে কর্ম্মশক্তি ও সমবেত উদ্যোগ একবারেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। লোকশিক্ষক একদিকে যেমন জনসমাজের স্বাভাবিক চরিত্র-গুণকে, ভাবুকতাকে উদ্বুদ্ধ করিবেন, অপরদিকে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে কর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে এক বিপুল কর্ম্মজীবনে যোগদান করিতে আহ্বান করিবেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার কর্ম্ম আবদ্ধ থাকিবে না। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া

সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত হইবে। সমাজের যেখানে যাহা অভাব তাহা তিনি জাগাইয়া তুলিবেন, তাহা মোচন করিবার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করিবেন এবং সেই আয়োজনে অদম্য উৎসাহের সহিত জনসাধারণকে ব্রতী করিবেন। বিপন্ন মধ্যবিত্ত, নির্য্যাতিত শিল্পী ও অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণকে তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিবেন। স্বাস্থ্য চাই, বল চাই, অন্ন চাই, শিক্ষা চাই, দীক্ষা চাই, আনন্দ চাই,—তিনিই তাহাদিগের বিচিত্র অভাবনিচয়ের অভিযোগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন। নিজেই কর্ম্মী হইয়া বিচিত্র শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া এই সমস্ত অভাব যাহাতে জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যোগে মোচন করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

লোকশিক্ষকের আদর্শ।

লোকশিক্ষক কেবল যে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত থাকিবেন তাহা নহে। পাশ্চাত্যজগতের উন্নত কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম-প্রণালীর বিচিত্র খবর পল্লীসমাজে প্রচার করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন না। গ্রাম্যকৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি তিনি হাতে কলমে কাজ করিয়া পল্লীসমাজে প্রচার করিবেন। কেবল যে তিনি কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য-প্রচারক হইবেন তাহাও নহে। আমাদের প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার-সাধন করিয়া এবং নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি পল্লীসমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ধীর ও বিপুল আয়োজন করিবেন। সমগ্র পল্লীসমাজ তাহার নিঃস্বার্থ জীবন হইতে প্রাণ পাইবে, তাঁহার প্রাণ পল্লীসমাজের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া প্রসারলাভ করিবে।

তং বেধা বিদধে নূনম্ মহাভূতসমাধিনা।
তথৈব সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈ চ ফলা গুণাঃ॥

পঞ্চভূত যেমন শুধু সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত, সেরূপ তাঁহার সমস্ত গুণই সমাজ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। তিনি পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত হইবেন। লোকশিক্ষক এরূপ উপাদানে গঠিত না হইলে সমাজকে তিনি জাগ্রত করিতে পারিবেন না। সুপ্ত জাতিকে বহু-শতাব্দীর নিদ্রা ও অবসাদ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে ভগবানের অংশ-সম্ভূত লোকচরিত্রনিয়ামক কর্ম্মীর প্রয়োজন। তাঁহার চরিত্রে দুইপ্রকার গুণের সমাবেশ চাই। একদিকে তিনি বজ্রকঠোর, অসীমতেজসম্পন্ন হইবেন। তাঁহার ধূমকেতুর মত করালমূর্ত্তির তেজে সমস্ত বাধাবিঘ্ন শত্রুতা অসম্পূর্ণতা ম্রিয়মাণ হইবে। অপর দিকে তিনি কুসুমমৃদু,—নিরহঙ্কারী, অসীম প্রেম ও ভক্তির আধার হইবেন। যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে সমাজ তাঁহাকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছে এবং যৌবনে বিদ্যা অর্থ ও সম্মান গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে, যে সমাজ তাঁহার প্রাণে বল, কণ্ঠে ভাষা, বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি দান করিয়াছে, তাঁহার সেই শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরুর নিকট তিনি ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে বলিবেন,—

> —"ইহা আমি কিছুই না জানি
> যে তুমি কহাবে সেই কহি আমি বাণী।
> তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাট,
> সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ?
> হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী
> কি কহিব ভাল মন্দ কিছুই না জানি।"

সমাজের বাণী তাঁহার বাণী হইবে, জাতির সাধনা তাঁহার সাধনা, দেশের শক্তি তাঁহার শক্তি হইবে। সমগ্র সমাজের সুপ্ত কর্ম্মশক্তি হইতে তিনি ধীরে ধীরে আপনার শক্তি সঞ্চয় করিবেন। শুধু সমাজ

নহে, বিশ্বপ্রকৃতি হইতেও তাঁহার শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে। অমা-বস্যার নিবিড় অন্ধকার, বৈশাখ মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি, বর্ষারাত্রির ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রধ্বনি, দুর্গম গিরিকন্দর ও নিবিড় অরণ্য হইতে তিনি তাঁহার সাধনায় অসীম শক্তি লাভ করিবেন। রুদ্রপ্রকৃতির সমস্ত তেজ তাঁহার তেজ হইবে। বিশ্বপ্রকৃতি হইতে অমরজীবন লাভ করিয়া তিনি তখন নির্জীব সমাজকে জীবনদান করিতে পারিবেন। হীনবল জনসাধারণকে বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তিদান করিয়া তিনি তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রণোদিত করিবেন। তাঁহার পূর্ণ-জীবনে জীবন লাভ করিয়া জনসাধারণ জাগিয়া উঠিয়া একটা কর্ম্মঠ জাতিতে পরিণত হইবে। লোকশিক্ষক প্রকৃত লোকচরিত্রনিয়ামক—জননায়ক হইয়া নিজের ও জাতির জীবন সার্থক করিবেন।

সাহিত্যের সমাজ-গঠন-শক্তি

ইংরাজী ও জার্ম্মান-সাহিত্যের লক্ষ্য

আমরা পাশ্চত্যসমাজকে অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি; কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজকে ভাবিতে গিয়া আমরা উহার গণ্ডী অত্যন্ত ছোট করিয়া লইয়াছি। আমরা একটিমাত্র পাশ্চাত্য ভাষা জানি—তাহা ইংরাজী। ইংরাজী পুস্তকের ভিতর দিয়া আমরা সাধারণতঃ ইংলণ্ডের সমাজসম্বন্ধেই পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। ফলে, অনেক সময়েই পাশ্চাত্যসমাজের কথা বলিতে গেলে আমরা জার্ম্মানী ফ্রান্স রুস প্রভৃতি দেশের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া, ইংলণ্ডকেই আমাদের চিন্তাজগতের—শুধু কেন্দ্র নহে, উহাকে—সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলি।

এরূপ ভুল করিয়া আমাদের যে অনেক সময় খুব ঠকিতে হয় এবং এরূপ ঠকিয়া এখনও যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তাহা নিঃসন্দেহ। একটি উদাহরণ দিতেছি। আমরা এখন মনে করিতেছি, আমরা যদি ইংলণ্ডের মত বড় বড় কারখানা না ফাঁদিয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি অসম্ভব। এরূপ মনে করিয়া, আমরা বড় বড় কারখানা খুলিতেছি। এদিকে গ্রামের পারিবারিক শিল্পগুলির সর্ব্বনাশ হইতেছে। শুধু গ্রাম্যশিল্প নহে, গ্রাম্যকৃষির উপরও আমাদের বিশেষ নজর নাই। জার্ম্মানী অথবা ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক জীবনী সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকিলে আমরা উল্টাদিক্ হইতে আমাদের

কার্য্যারম্ভ করিতাম না। বিশেষতঃ, জার্ম্মানী বড় কারখানা গ্রাম্যশিল্প ও কৃষি সমানভাবে চালাইতেছে। ইংলণ্ডের মত জার্ম্মানী, তাহার নাগরিক-জীবনের পুষ্টিসাধন করিতে গিয়া, পল্লী-জীবনকে বিসর্জ্জন দেয় নাই। জার্ম্মানী, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, গ্রাম্য প্যারিবারিক শিল্পগুলির বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং কৃষিকর্ম্মও উন্নত প্রণালীতে চালাইতেছে। ইংলণ্ড তাহার খাদ্যের জন্য যে অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, আমরা ভাবিতেছি, আমরা ইংলণ্ডের মত কারখানা স্থাপন করিয়াই ধনী হইতে পারিব।

আমরা, এতকাল ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া, যে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে আনিয়াছি, তাহাতেও একটা বিশেষ ভুল হইয়াছে। সমাজে একটা ভুল আদর্শ প্রতিপত্তিলাভ করিলে যে তাহা বিশেষ অনিষ্টকর হয়, তাহা বলা বাহুল্য। ইংলণ্ডের সাহিত্যকে অনুকরণ করিয়া, আমরা একটা ভুল আদর্শকে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি; আমাদের ভাবিবার কারণ বা অবসর নাই যে, পাশ্চাত্য জগতে ইংরাজী সাহিত্যের স্থান ও অধিকার কিরূপ, তাহার দোষ ও গুণ সেখানে কিরূপভাবে বিচারিত হইয়াছে, এবং আমরাও, গুণগুলি অনুকরণ করিয়া, দোষগুলি কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিব।

ইংরাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিব—ইংরাজী সাহিত্য রাজা, রাজার পারিষদবর্গ, ভূম্যধিকারী, ধনী, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে বাড়িয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে, সব দেশের সাহিত্য এরূপভাবে গঠিত হয় নাই। বিশেষতঃ, জার্ম্মান-সাহিত্য একবারে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়াই বিকাশলাভ করিয়াছে। জার্ম্মান-সাহিত্য যে ভাবে কৃষক ও শ্রমজীবিগণের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, ইংরাজী সাহিত্যের তাহা করিতে পারে নাই।

আমাদের সাহিত্য, ইংরাজী সাহিত্য সাহায্যে আধুনিক কালে উন্নতিলাভ করিতেছে। ইংরাজী ভাষা আমাদের রাজার ভাষা, ইংরাজী সাহিত্যের মত আমাদের সাহিত্যও জনসাধারণের হৃদয় হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া,—দেশের হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া—নিজেই নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, স্বনির্ম্মিত সিংহাসনে প্রভুত্ব করিতেছে।

Anglo-Saxonএর King's English, জার্ম্মানের Minnesang.

Chaucer, এই "King's English," আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই ইংরাজী সাহিত্যের জন্মদাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই, শিল্পকলাকৌশলে মণ্ডিত হইয়া অবশেষে Shakespeare এর হাতে পৌঁছিয়াছিল। Germany তে Chaucer এর মত কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। Germanyর ইতিহাসের মধ্যযুগে, Nibelungen ও Gudrun এর গানের সহিত Beowulf এর তুলনা হয় না। Germanyর চারণ Walter Von der Vogelweide যদিও রাজসভার কবি ছিলেন, তবুও তাঁহার গান গুলিতে পল্লীগ্রামের সুরই শুনিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এত সরল ও অকৃত্রিম যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়কেই উহারা সমানভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাদিগের তুলনায়, ইংরাজী সাহিত্যের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গানগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজকবিদিগের মধ্যে যাঁহারা এ সময়ে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Walter Map ল্যাটিন্ ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, এবং Langland যদিও একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, তবুও উহা অত্যন্ত দীর্ঘ ও অসম্বদ্ধ বলিয়া দেশের প্রাণকে

বিশেষরূপে স্পর্শ করে নাই। অপরদিকে Germanyতে Wolfram যে Romaunt of the Graalএর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইয়া সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করিয়াছিল। Wolfram মধ্যযুগের Teutonদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতা—'The greatest Teutonic poem of the middle ages,'—মধ্যযুগে Teutonদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি Germanyতে কোন Chaucer জন্মগ্রহণ করেন নাই। যখন Chaucerএর অনুবর্ত্তী কবিগণ Chaucerএর King's English এর পুষ্টিবিধান করিতেছিল, ঠিক সেই যুগেই জার্ম্মানীতে "Minnesang," "Meister sang" এ পরিণত হইতেছিল। জার্ম্মানীতে সাহিত্যের উপর জনসাধারণের প্রভাব আমরা প্রথম হইতেই দেখিলাম।

Wars of the Roses ও ইংরাজী সাহিত্যের দুরবস্থা

Chaucerএর পর হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীদেশ হইতে ইংরাজগণ বিতাড়িত হয়। সমগ্র জাতি এই অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছিল। সাহিত্যের উন্নতি এ সময়ে অসম্ভব। কোন জাতি যদি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের অশ্রুবিগলিত ধ্বনি শুনা যাইতে পারে। Ireland ও Walesএর সাহিত্য, জার্ম্মানীর উপর ফরাসীর প্রভাব-বিস্তারের সময়ে জার্ম্মানসাহিত্য, Polandএর সাহিত্য ও আমাদের সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু যখন শুধু অপমান হইয়াছে, জাতিকে একবারে দাসখৎ লিখিতে হয় নাই, তখন জাতির এমন একটা

দুঃসহ শোক হয় না যাহা সাহিত্যের ভিতর দিয়া ক্রন্দন-ধ্বনিতে ফুটিয়া উঠিবেই ;—কাজেই সাহিত্যের সেরূপ পুষ্টি হয় না। ইংলণ্ডের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তাহার পরই প্রায় ত্রিশ বৎসরব্যাপী গৃহবিচ্ছেদ ও যুদ্ধ,—Wars of the Roses.—ধনী ও ভূম্যধিকারিগণ যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত, কবিগণকে উৎসাহ দিবার তাঁহাদের অবসর ছিল না। কবিগণ জনসাধারণের সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতেন ; সাহিত্যে তাঁহাদিগের নূতন কিছু বলিবার ছিল না। শুধু Scotlandএ Dunbar, Gawain Douglas, Lyndsay ও Hennyson Chaucer এর সম্মান রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে Surrey ও Wyatt Dante, Ariosto ও Petrarchকে অনুকরণ করিয়া দুই চারিটি সুন্দর প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী নহে—ইতালীয় সাহিত্যের প্রভাবই তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়।

নবশিক্ষা ও ধৰ্ম্মসংস্কার

তাহার পর, Renaissance. ও Reformation য়ুরোপের সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে নবযুগের সূচনা। France, England ও Germany Florence ও Rome নগরী হইতে প্রাচীন সাহিত্যের আলোক পাইয়াছিল। Luther প্রথম স্বদেশী ভাষায় Bible অনুবাদ করিলেন। Englandএ William Tyndale, Lutherএর অনুবাদের আদর্শ অবলম্বন করিয়া Bibleএর ইংরাজী অনুবাদ করিলেন। জার্ম্মানদিগের প্রার্থনা ও পদাবলী অনূদিত হইয়া Edinburg ও Londonএর গির্জ্জায় ব্যবহৃত হইত। জার্ম্মানজাতি Reformation ধৰ্ম্মসংস্কার-প্রবর্ত্তনে অগ্রণী হইয়াছিল ; কিন্তু Renaissanceএ Germany সেরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। ইতালীর Ariosto ও Tasso, Franceএর Mosot ও Rabelais, Portugalএর Camoeons,—

এমন কি Spainএর Freillaর নিকট Germanyর সাহিত্যিকগণ একে-বারে হতপ্রভ।

Englandএরও সেই এক দশা। Englandএর বিশ্ববিদ্যালয়ে Colet, More এবং Erasmus যে প্রাচীন জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া-ছিলেন,তাহা সমাজের ধর্ম্মান্দোলনের ব্যস্ততার মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তাঁহার জাতভাই জার্ম্মানের মত শিক্ষাসংস্কার ও প্রাচীন বিদ্যা ছাড়িয়া ধর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত হইল। অবশেষে Elizabeth যখন ধর্ম্মের গোলমাল থামাইলেন, যখন সমাজে শান্তি আনিলেন, যখন—

"………Every man shall eat in sefety Under his own vine, what he plants and sings The merry songs of place to all his neighbours."

সমাজের শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অবশেষে Renaissanceএর সুফল ফলিল,—এমন ফলিল, যে য়ুরোপের অন্য দেশে সেরূপ ফলে নাই। কিন্তু সেই একই কথা,—কবিগণ সকলেই রাজসভার কবি—১৫৯০ হইতে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে George Chapman, Daniel, Drayton, William Shakespeare এবং Raleigh লণ্ডনের রাজসভায় আসিয়া-ছিলেন। ইহা ছাড়া Donne, Spenser ও Ben Jonson লণ্ডন সহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলেই রাজভক্ত, রাজার দয়ার পাত্র,— Courtiers, ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে শুধু রাজভক্ত ছিলেন তাহা নহে,—Elizabethএর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাঁহারা কোন কথা বলিতেন, তাঁহাদের উপর ইহাদের বিশেষ আক্রোশ ছিল। Puritanদিগকে Edmund Spenser পশু বলিয়াছিলেন,—'Blatant beast.' Raleigh রাণীর নিকট তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। রাণী তাঁহাকে Pension ও জমি দিয়াছিলেন। রাণীর অনুগ্রহ পাইয়া

এরূপে অনেকেই Puritanদিগকে খুব বিদ্রূপ গালাগালি করিয়াছিলেন ; কিন্তু Spenser, Shakespeare, Ben Jonson প্রমুখের প্রতিভা ইংলণ্ডকে অবশেষে সেই 'Blatant beast' Puritanদিগের গভর্ণমেণ্ট হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিল না। Spenser, Shakespeare যুগের পরবর্ত্তী যুগেই—রাজা ও পিউরিটানদিগের মধ্যে যুদ্ধ। শেষে Cromwellএর দলই জয়লাভ করিল। Elizabeth-যুগের সাহিত্য যদি সার্ব্বজনীন হইত, তবে প্রজাবিদ্রোহ ও প্রজার অভ্যুত্থান অসম্ভব হইত।

অপরদিকে জার্ম্মান-সাহিত্য renaissance হইতে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। জার্ম্মান-সাহিত্যে কলাকৌশল ছিল না। Sir Philip Sydneyর সহিত জার্ম্মানীর Hans Sachsএর তুলনা করিলে, রাজপুরুষ ও মুচীর সহিত তুলনা করা হয়। নাট্যকারদিগের মধ্যে দুই একজন স্বদেশী ভাষা ছাড়িয়া লাটীন্ ভাষায় লিখিতেন। দুই চারিখানি Shakespeare-নাট্য স্বদেশী ভাষায় অনূদিত হইল ; কিন্তু সেগুলিতে কাহারও মন উঠিল না। জার্ম্মান জাতি কলাকৌশলের বিশেষ পক্ষপাতী নহে, বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াও হজম করিতে পারিল না।

Thirty years war ও জার্ম্মান-সাহিত্যের হীনাবস্থা

সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীতে সাহিত্যের ঘোর দুর্দ্দশা। জার্ম্মানী এই সময়ে Thirty years warএ বিধ্বস্ত হইল, Lutherএর দেশে ধর্ম্মের স্বাধীনতা থাকিল না। Peace of Westphaliaতে জার্ম্মানী তাহার রাষ্ট্রনৈতিক একতা হারাইল। Louis XIVএর প্রভাবে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। জাতীয় জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অবনতি হইল। জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজগণ

ফরাসীদিগকে অনুকরণ করিতে লাগিল। ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে এক প্রাণহীন কৃত্রিম সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। শেষে ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শ, জার্ম্মান জাতিকে তাহার নিজের আদর্শের দিকে ফিরাইয়া আনিল। Lessing, Corneille, অথবা Racine অপেক্ষা Shakespeare এর প্রভূত্ব স্থাপিত হইল। গ্রীক ও ফরাসী নাট্যের অনুকরণের স্রোত হইতে তিনি জার্ম্মান-সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Heine তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'Lessing was the literary Arminius who freed our theatre form foreign rule.'

উন্নতির সূচনা

Klopstock ও Weiland সেই সময়ে কবিতা লিখিলেন। উভয়েই বিদেশীয় প্রভাব স্পষ্ট বুঝা যায়,—Weilandএ ফরাসী ও Klopstockএ ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব; কিন্তু বিদেশীয় প্রভাবের ভিতর দিয়া দুই জনের স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশের আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয়। দুই জনের গানগুলি সার্ব্বজনীন। Milton এর Paradise Lost ইংলণ্ডবাসী জন সাধারণের পক্ষে একখানি Æenead অথবা Inferno; কিন্তু Paradise Lostএর অনুকরণে লিখিত Klopstockএর মহাকাব্য সার্ব্বজনীন হইয়াছিল। Miltonএর মহাকাব্যের রচনা পদ্ধতির পরিণতি, Goetheর Hermann und Dorothea। জার্ম্মানজাতিকে ইহা গভীর ভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল,—The revolutionary song of paradise inspiring the song of a village durning the great revolution'—Hermann সম্বন্ধে একজন আধুনিক সমালোচনায় ইহা বলিয়াছেন।

Sturm und drung-প্রবর্ত্তক Herderএর লোকসাহিত্যালোচনা।

তাহার পর জার্ম্মানীর সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা—Sturm und drung. বিপ্লবের পূর্ব্বে অশান্তি ও ব্যাকুলতা লক্ষিত হয়। Herder এই বিপ্লবের প্রবর্ত্তক, Goethe ইহার কেন্দ্র, এবং Schillerএ ইহার সমাপ্তি।

তিন জনেরই কবিতা, নাট্য ও কাব্য সার্ব্বজনীন—তিন জনেরই সাহিত্যে জনসাধারণের সহিত সহানুভূতি, জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতি ভক্তি লক্ষিত হয়। Percy's Reliques of Ancient Poetry পাঠ করিয়া Herder ও যুবক Goethe,—Alsatiaর কৃষকগণের নিকট হইতে গান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। Herder, সাহিত্যিক-গণকে সবজাতিরই লোকসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে বলিয়া, কবিতার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহার কল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল; তাই তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক-সাহিত্য ও প্রাচীন কাহিনীগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রশংসা করিতে পারিয়া-ছিলেন। Herderএর প্রতিভা, লোক সাহিত্য-চর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়া, জার্ম্মানসাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিএবং উহার সহানুভূতি ও অকৃত্রিমতাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। Herder য়ুরোপে লোকসাহিত্যের প্রধান-ভক্ত।

Goethe Schillerএর সার্ব্বজনীন সাহিত্য

Herder—Goetheর প্রথম বয়সের শিক্ষক। Schiller, Goethe অপেক্ষা দশবৎসরের ছোট। Goethe ও Schiller দুই জনেরই নাট্যে Shakespeareএর রচনাকৌশল লক্ষিত হয়; কিন্তু Goethe ও Schillerএ রাজভক্ত Shakspeareএর স্থান নাই। রাজভক্ত Shakes-

peare জনসাধারণকে শুধু বিদ্রূপ করিবারই জন্য তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চে আনিতেন। Shakespeare তাঁহার A Midsummer Nights Dreamএ Theseus এবং তাঁর পারিষদবর্গ ও Bottomপ্রমুখ প্রজাবৃন্দের শিক্ষা ও আদব-কায়দার যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহা রাণী ও তাঁহার মুষ্টিমেয় Courtierগণের মনোরঞ্জক হইতে পারে ; কিন্তু সমগ্রজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে উহা অন্তরায় হয়। Goetheর Gotz von Berlichingen ও Schiller এর Robbersএ, Shakespeare জার্ম্মানীর আবহাওয়ায় প্রজাভক্তে পরিণত হইয়াছেন। প্রজাশক্তির উপর ভক্তি না থাকিলে Goethe ও Schiller কখনই Germanyতে সকলেরই পাঠ্য হইতেন না। এ সম্বন্ধে একজন আধুনিক সমালোচক লিখিয়াছেন,—

"No poem of their great English contemporaries, neither of Wordsworth and Coleridge, nor of Byron and Shelley, has ever been chanted by children in London Streets, by peasants in English hamlets, remoulded in their mouths, as several of Goethe's and Schiller's are."

Goethe এবং Schillerএর কবিতার মত Wordsworth ও Coleridgeএর কবিতা রাস্তায় রাস্তায়, অথবা গ্রামের কুটীরে কুটীরে, গীত হয় নাই। আমরা Goethe ও Schillerএর সাহিত্যের শক্তিসম্বন্ধে, পরে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিব। এক্ষণে ইদানীন্তন ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি।

ফরাসী সাহিত্য ও রাষ্ট্রবিপ্লব

ফরাসী বিপ্লব, য়ুরোপে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। Herder, ইহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার ও Reformationএর সহিত তুলনা

করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মার মহিমা প্রচার করিয়াছিল। মধ্যযুগের ধর্ম্ম-সংস্কার, মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে আর কোন ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানকে মধ্যস্থ বলিতে অস্বীকার করিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, সকল লোকের ঐক্য প্রচার করিল। চিন্তা হিসাবে Rousseau এই বিপ্লবের নেতা। তাঁহার Social Contract এর প্রথম বাক্য এই,—সকল মনুষ্য স্বাভাবিক ঐক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে সকল ক্ষেত্রেই সে পরাধীন—শৃঙ্খলাবদ্ধ। Rousseauর সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা মন্ত্রে ফরাসী জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছিল। Rousseau অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি যাহাই বলিয়াছিলেন, তাহা এমন সহজ সরল স্পষ্ট ও সোজা কথায় বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজে তাঁহার প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

Rousseaর প্রভাব

আমরা Rousseauর এই প্রভাব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। Rousseauর মত জগতে কোন লেখক সমাজ ও জাতীয় জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই ক্ষমতা কি হইতে হইল? Voltaire তাঁহার জীবনেই অতিপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজের সাহিত্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই স্বদেশের সব লোক সেই সময় ভাবিতেছিল; তাহাদের চিন্তাই তাঁহার সাহিত্যে ভাষা পাইয়াছে বলিয়াই তিনি অত শীঘ্র সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া পড়িলেন।" Rousseauর সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি শুধু দেশের চিন্তাকে নহে, ফরাসী-জাতির শুধু অভাবও আকাঙ্ক্ষাকে তাঁহার সাহিত্যে যে ভাষা দিয়াছেন তাহা নহে, সমগ্র ফরাসীজাতির বহুবৎসরের সঞ্চিত দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা,

সজীব হইয়া তাঁহার লেখনীকে চালাইয়াছে; লেখককে চিন্তা করিতে, ধীরভাবে যুক্তির সাহায্য লইতে অবসর দেয় নাই। এই কারণে Rousseauর সাহিত্য অযৌক্তিকতায় পরিপূর্ণ; তবুও Voltaire-এর যুক্তি অপেক্ষা Rousseauর অযুক্তিতেই সমগ্র সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল। নিজে দারিদ্র্যের অসহ্য পীড়া যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, তিনি দীনদরিদ্রদের বাণীই জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। Voltaire ধনী ছিলেন, রাজ-দরবারে তাঁহার সম্মান ছিল, বিভিন্নদেশের রাজাদের সহিত তাঁহার চিঠিপত্র চলিত; Voltaire সৌখীন, বিলাসী; Voltaire theatre-ভক্ত,—তিনি একজন তথাকথিত সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী,—তিনি কেন দেশকে মাতাইতে পারিবেন!—দেশকে যিনি মাতাইয়াছেন, তিনি একজন রাস্তার লোক, ঘড়িওয়ালার ছেলে, যিনি চিরজীবনই কষ্টে কাটাইয়াছেন, ধনী ও বড় লোক মাত্রেরই নিকট অসম্মান ভিন্ন সম্মান পান নাই; কিন্তু গরীবলোক—রাস্তার লোকের নিকট হইতে যিনি অযাচিত প্রেম ও ভালবাসা পাইয়াছেন, যিনি বুঝিয়াছেন জগতের পবিত্র মহত্ত্ব—সেই তথাকথিত সভ্যসমাজ কর্তৃক যাহারা ঘৃণিত, যাহারা পদদলিত—সেই অত্যাচারপীড়িত জনসমাজের মধ্যেই সুপ্ত আছে।

চরিত্রের এই মহত্ত্ব কি উপায়ে জাগ্রত করিতে হইবে?—শিক্ষার দ্বারা। Voltaire যে শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা নহে। Voltaireএর শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে—সমাজের কতিপয় লোক খুব উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনাদ্বারা আপনাদের মনোবৃত্তির উন্নতিসাধন করিয়া, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন; কিন্তু সমগ্র জাতি যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। তাই Rousseau সে শিক্ষা চাহিলেন না। Rousseauর Emile ধনীলোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে শিক্ষা

লাভ করিল, সে শিক্ষা অত্যন্ত দীন দরিদ্র রাস্তার লোকও পাইতে পারে—তাহা ব্যয়সাধ্য নহে—তাহা প্রকৃতির অযাচিত দান। তাই, Joseph Chenier—Rousseauর প্রণালী-অবলম্বন করিয়াই সমগ্র দেশবাসিগণের জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। সে শিক্ষা যে শুধু সার্ব্বজনীন ও অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে তাহা নহে,—সে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ব্যক্তিতে এরূপ ভাব ও গুণ উদ্বুদ্ধ করা, যাহার ফলে সে যাবজ্জীবন সমাজের উপযুক্ত সেবা করিতে সমর্থ হইবে। অত্যাচারপীড়িত সমাজে, অনৈক্যের মধ্যে এরূপ সেবা-ধর্ম্ম মৈত্রীর বাণী-প্রচার দেশে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। সে সময়ে অসাম্য অনৈক্যেই ফরাসীসমাজের গোড়াপত্তন ছিল। প্রথমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনৈক্য, ভদ্রলোক ছোটলোকে অনৈক্য; বিচারালয়ে অনৈক্য—ভূম্যাধিকারী ও পাদরীদিগের জন্য এক প্রকার বিচার, জনসাধারণের জন্য আর এক প্রকার বিচার; করস্থাপনের অনৈক্য—ভূম্যধিকারী ও পাদরীদিগকে কর দিতে হইবে না, জনসাধারণ রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যয় বহন করিবে,—মাঠের ঘাস খাইয়া, কাপড় এমন কি দরজার খিল পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া কর দিবে। সমাজে শুধু অনৈক্য নহে—অনৈক্যের উপর নির্যাতন। ফরাসী ভূম্যধিকারীর ভূমি নাই, বিলাসভোগের জন্য তিনি কৃষককে ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন, অথচ তাঁহার ভূমিস্বত্ব রহিয়াছে; তাহার জন্য তিনি কৃষককে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া লইতেছেন, কৃষকের ক্ষেত্রে তিনি পাখী শিকার করিতেছেন ও তাহার শস্য নষ্ট করিতেছেন। ফরাসী ভূম্যধিকারীর রাজদরবারেও বিশেষ সম্মান নাই; তিনি পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রামের first citizen মাত্র; তবুও তিনি অধিকাংশ সময়ে গ্রামে থাকেন না। তাঁহার দাবী পুরা মাত্রায় আছে; অথচ সমাজে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই। তাঁহার

পর ফরাসী কৃষককে চার্চ্চকে tithe দিতে হইবে; Voltaire দেখাইয়াছেন, চার্চ্চ তখন পবিত্রতা নহে, পাপের প্রতিমূর্ত্তি। এই অনৈক্য ও অত্যাচারের মধ্যে Rousseau তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার করিলেন; তিনি বলিলেন,—মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, ধনী-নির্ধনে অনৈক্য, রাজাপ্রজায় অনৈক্য—তাহা আধুনিক সভ্যতার কুফল; রাজা—প্রজার চাকর মাত্র, প্রজাশক্তির অনুমোদনই রাজার শক্তি; প্রজাশক্তি রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তি, প্রজাশক্তির বিকার নাই, বিনাশ নাই, তাহা চিরন্তন, অবিনাশী, অনশ্বর। Le Contract Social-এ Rousseau এই প্রজাশক্তির উদ্বোধন-মন্ত্র গাহিলেন। অমনই গ্রামের কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিল, গাছের পাতা ছিঁড়িয়া Cockade তৈয়ারী করিল, কৃষকপত্নী যুদ্ধের পোষাক ও তাম্বু-শেলাই আরম্ভ করিল, বালক-বালিকাগণ আহতদিগের জন্য lint তৈয়ার করিতে লাগিল; যাহারা রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ, অস্ত্র ধরিতে অক্ষম, তাহারা গ্রামে গ্রামে ক্ষেত্রের কৃষক-গণকে উৎসাহ দিতে লাগিল, অথবা গ্রামের কামারশালায় অস্ত্র তৈয়ার আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে তিন কোটি লোক মাঠ ঘাট হইতে বাহির হইল। অতীতের সমস্ত অপমান-অত্যাচারের হলাহল গণ্ডূষ করিয়া, ত্রিস্রোতা সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার ভাব-গঙ্গা মস্তকে ধরিয়া দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যপীড়িত সর্ব্বস্বান্তের জীর্ণ কন্থা পরিধান করিয়া, ফরাসী কৃষক প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বিষাণ- la marseillaise, ডমরু Vive la nation, কুমারী Jeanne d'Arcএর আত্মা প্রজাশক্তির রাক্ষসী মূর্ত্তি লইয়া আবার রণরঙ্গে ছুটিয়া আসিল। Bastile, Castle Archive, Church চুরমার হইল। দক্ষ প্রজাপতি Louis XVI-এর মস্তক ভূমিবিলুণ্ঠিত হইল। ধনমানগর্ব্বিত পাদরী ভূম্যধিকারীদের শহ-

কার চূর্ণ হইল। দেশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে প্রলয়-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে Feudalism, Despotism ও Priestcraft ভস্মীভূত হইল। তাহার পর Reign of Terror, মৃত্যুর বিভীষিকা—Guillotine, মরণের উন্মত্ত কোলাহল, ধ্বংসের মহানন্দ। নিজ শক্তির মৃতদেহ স্কন্ধে ধরিয়া, Rights of man লইয়া ফরাসীজাতি সমগ্র য়ুরোপের সমর-ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তের মত বাহির হইল। তাহার Viva la Republique ধ্বনিতে Czar, Monarch, Emperor-এর সিংহাসন টলিল। এশিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মহাপ্রলয়ের সূচনা হইল। জগতে যিনি সংহারিণী লীলার প্রতিরোধ করেন, তিনি শেষে প্রলয়াবতারকে নিরস্ত করিলেন। ফরাসীজাতি যে Rights of man, যে সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতা—প্রজাতন্ত্রের অধিকারের জন্য পাগল হইয়া জগৎকে তোলপাড় করিতেছিল, প্রজাপুঞ্জের সে মহাশক্তি ভগবান খণ্ডবিখণ্ড করিলেন, মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ জগতে ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বজগৎময় প্রজাশক্তির পীঠস্থান হইল! যেখানে দক্ষরাজের অত্যাচার ও প্রজাশক্তির অপমান ও লাঞ্ছনা হইয়াছে, সেখানেই শক্তির উদ্বোধন হইয়াছে, প্রজাশক্তির পুরোহিত Rousseauর প্রভাব প্রতীয়মান হইয়াছে।

কৃষককবি Burns.

Rousseau-কে অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়াছি। তাঁহার 'Rights of man'-তত্ত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তির প্রভাব-ঘোষণা য়ুরোপে যুগান্তর আনিয়াছিল।

ফ্রান্সে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রজগতে যুগান্তর আনিল। ফরাসী-বিপ্লবের প্রারম্ভে ইংলণ্ডেরও যুগান্তর আসিবার উপক্রম হইল।

Rousseau যে ঐক্যমন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বপ্রথম কৃষক-কবি Burns-এর ভাঙ্গা ভাষায় Scotlandএ উচ্চারিত হইল। "A man's a man for a' that', the rank is but the guinea's stamp, the man's the gowd for a' that"—ইহা Rousseauর 'All men are born equal'-এর স্কটলণ্ডীয় সংস্করণ। Burns মেঠো সুর ধরিয়া লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহাব গান রচনা করিতেন। তাঁহার গান রচনার সময় অসময় ছিল না, তিনি কোন নিয়ম-কানুন আদবকায়দার ধার ধারিতেন না। সাধারণ মানুষ যেমন আপনার হৃদয়ের কথা সহজ-ভাবে ব্যক্ত করে, কোন নিয়ম তাহার ভাবপ্রকাশে বাধা দেয় না, Burns সেরূপভাবে আপনার হৃদয়ের ভাবগুলি ব্যক্ত করিতেন। Burns নিজেই বলিয়াছেন, তিনি যখন গান ধরিতেন, তখন তাঁহার মনের ভাবগুলি এক সঙ্গে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিত, যতক্ষণ তিনি সে গুলিকে কোন রকমে কবিতায় সম্বদ্ধ না করি-তেন, ততক্ষণ যন্ত্রণার সীমা ছিল না। Burns-এর গান শুনিলে আমরা একটি সরল ও নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় পাই, মানুষের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহার আত্মার সন্ধান পাই, রূপ ছাড়িয়া ভাবের খেলায় মুগ্ধ হই। একজন ফরাসী সমালোচক Burns-এর কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'At last after so many years, we escape from the measured declamation, we hear a man's voice! Much better, we forget the voice in the emotion which it expresses, we feel this emotion reflected in ourselves, we enter into relations with a Soul. Then form seems to fade away and disappear. I will say that this is the great feature of modern poetry; Burns has reached it'. 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ',—রূপ ও ভাবের এই নিত্যসম্বন্ধ যিনি ক্ষণেকের জন্যও ঘুচাইতে পারেন, যাহার নিকট আমরা ভাবের খেলা, আত্মার রূপ দেখিতে পাই, তিনিই প্রকৃত কবি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Burns কৃষকের ভাষায় গান-রচনা করিয়াছিলেন। Scotlandএর কৃষকের ভাষাই তিনি ব্যবহার করিতেন এবং কৃষকের দৈনন্দিন জীবন হইতে তিনি তাঁহার উপমা ও বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেন। তাই তিনি কৃষকের প্রাণকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। কৃষকের সুখদুঃখের কথা বলিয়া,

See yonder poor, o'erlabour'd night
So abject, mean, and vile,
Who begs a brother of the earth
To give him leave to toil;
And see his lordly fellow-worm
The poor petition spurn
Unmindful, though a weeping wife
And helpless offspring mourn.

Man was made to mourn, কৃষকের ক্রন্দন প্রকাশ করিয়া, তাহার মহত্ত্ব প্রচার করিয়া, তিনি জন-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে Romanticism ও আত্মসর্ব্বস্ব সাহিত্য

Burns-এর মত Wordsmorth. Coleridge ও Southey ফরাসী-বিপ্লবের ফলে প্রজাশক্তির উন্মেষের সূচনায় প্রথমে অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু Burke যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃগণ যখন সেই হত্যা ও লুণ্ঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের

মন ফিরিল। কিন্তু ফরাসীবিপ্লব চিন্তাজগতে যে ব্যক্তির স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিল, সমাজ বা রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি ব্যক্তির পদতলে মস্তক অবনত করিবে বলিয়া, যে ব্যক্তি-পূজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে Wordsworth, Coleridge ও Southey এবং বিশেষতঃ Byron ও Shelley মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কেহই তখনকার সমাজ এবং সাহিত্যের আদর্শ ও রচনাপ্রণালী আর মানিলেন না। সকলেই নিজেদের নূতন নূতন আদর্শ, নূতন নূতন মাপকাঠি তৈয়ারী করিলেন। কবি কোন বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতির বন্ধনে আপনাকে আর শৃঙ্খলিত রাখিলেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে যুগান্তরের ফলে ব্যক্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত হইল,—সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি, নিয়ম, আইন, কানুন যে ব্যক্তিকেই কেন্দ্র ও ব্যক্তিত্ববিকাশকেই উদ্দেশ্য করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইল, সাহিত্যক্ষেত্রেও সেই যুগান্তরের প্রভাব লক্ষিত হইল। আপনার ভাব-প্রকাশই কবির প্রধান লক্ষ্য হইল, এমন কোন রচনাপদ্ধতি, কোন নিয়মকে তিনি মানিলেন না, যাহা তাহাদের এই আদর্শের নিকট না পৌছাইয়া দেয়। কবির ভাবের সমাদর আরম্ভ হইল, ভাষার আদর কমিল। অতীন্দ্রিয় তুরীয়ের প্রতি ভক্তি বাড়িল, রূপ—ইন্দ্রিয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিল। ইহার নামই Romanticism.

Wordsworth প্রচার করিলেন, কবিতার ভাষা কৃষকের দৈনন্দিন ভাষার মত সহজ ও সরল হওয়া চাই ; কবির কাজ—প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও দৈনন্দিন ঘটনাবলী হইতে অন্তঃকরণের নিগূঢ় ভাবশক্তি প্রকাশ করা। Byron-এর নিকট কবিতা—অস্ত্রস্বরূপ, সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য, ব্যক্তিকে সমাজের কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিবার উপযোগী শাণিত তরবারি-স্বরূপ। Shelleyর নিকট কবিতা একটা সুন্দর অপরূপ ভাবরাজ্য গঠন করার উপায় মাত্র—সে রাজ্যে

সমাজের বন্ধন—সুখদুঃখ নাই, আছে শুধু স্বাধীনতা, পবিত্র প্রেম ও বন্ধুত্ব। তিন জনই প্রতিভাবান্ কবি, তিনজনই বর্ত্তমানের অসংখ্য অসম্পূর্ণ বন্ধনকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনজনই ব্যক্তিপূজার পুরোহিত। কিন্তু ইঁহাদের সকলেরই সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহাদের সাহিত্য ব্যক্তিগত ছিল,—সমগ্র সমাজের চিন্তা ও কর্ম্মের উপর উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য ও সমাজের বিয়োগ

তাহার পর একযুগ চলিয়া গিয়াছে। Shelley ও Byron-এর কবিতার আবেগ ও জ্বালার পরিবর্ত্তে এখন ধীর চিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ আসিয়াছে। Landor ও Keatsএ যে শিল্প ও কলানৈপুণ্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা Mrs. Browning, Hood, Matthew Arnold ও Proctor এর কবিতা-জীবনের ভিতর দিয়া অবশেষে Tennyson এর নিকট চরম উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে। সকলেরই মধ্যে Wordsworthএর কল্পনা ও আত্মচিন্তা রহিয়াছে। Browning এ গভীর চিন্তা-বিশ্লেষণের উৎকর্ষ-সাধন, Swinburneএ তাহার পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে। কবিতা যে পথে এতকাল ধীরভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এখন তাহা সে পথের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর ক্রমবিকাশের কারণ ও আয়োজন নাই। 'ততঃ কিম্' নাই। তাই এখন যাহা কিছু নূতন, দেশের এখনকার চিন্তা-জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা কিছু বিদেশের সরস নবীনতাপূর্ণ, তাহাই আদৃত হইতেছে। পুরাতন নিয়মে পুরাতন ধারায় ইংরাজী কবিতা আর বিকাশলাভ করিবে না।

আমরা যে সকল কবির নাম উল্লেখমাত্র করিলাম, তাঁহাদের

সকলেরই কবিতা, নাট্য ও কাব্য ব্যক্তিগত ছিল, সমাজকে গভীরভাবে আন্দোলিত করিতে পারে নাই। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে poet-laureate-গণ রাজার সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপার তাঁহারা কেহই প্রচার করেন নাই। যখন Parliamentএর বক্তৃতায়, বড় বড় সহরের মহাসভায়, খবরের কাগজপত্রে, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বহুবৎসর ধরিয়া চলিল, তখন Rudyard Kipling তাঁহার কলম ধরিলেন। অথচ ইংরাজ সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ,—সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দ্বারা জগতে শিক্ষা ও ধর্ম্মবিস্তার,—সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা সাম্রাজ্য-রক্ষার দ্বারা জগতে নিজেদের গৌরব অটুট রাখা।

জার্ম্মান জাতীয় জীবনের উপর Goethe ও Schillerএর প্রভাব—Aufklarung

জার্ম্মান-সাহিত্যে এ অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয় না, কারণ জার্ম্মানীতে সাহিত্য জাতির জীবন্তভাবের—প্রাণের প্রতিমূর্ত্তি। সেখানে জাতীয় আদর্শের সহিত সাহিত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে! সেখানে সাহিত্যের গতি সমাজের অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জার্ম্মান-সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের মত রাজসভায় ধনিগৃহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিপুষ্ট হয় নাই। জার্ম্মান-সাহিত্যের প্রাণ জার্ম্মানজাতির হৃদয়ে। তাই যখন জার্ম্মান-সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নব-জীবন লাভ করিয়াছিল; তখন সমগ্র সমাজে এমন একটা আন্দোলন হইয়াছিল, যাহাতে জার্ম্মানজাতি একবারে নূতন প্রাণ পাইয়াছে। Schillerএর Robbers সমাজে একটা অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন আনিয়াছিল। Byronএর Childe Harold ও Walter Scottএর Waverly নভেলের

প্রভাবের তুলনা উহার সহিত করা যায় না। Schillerএর সহিত সমগ্র জার্ম্মানজাতি ভাবিল যে, স্বাধীনতা সহর হইতে এখন বনে নির্ব্বাসিত, এবং সকলেই দস্যু Karl Moorএর ন্যায় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। Schillerএর Cabale und Liebeএ যখন তাহারা পড়িল, তাহাদের ঘৃণিত রাজা কিরূপে দুর্ভাগ্য সৈন্যদিগকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার জন্য ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, তখন তাহারা রাষ্ট্রসংস্কার জাতির প্রধান প্রয়োজন বলিয়া বুঝিল। তাঁহার Don Carlosএ যখন Marquis Posa বলিয়া উঠিল, Sire, give us freedom of Speech, তখন সমগ্র জাতির অন্তঃস্থল হইতে সে বাণী উচ্চারিত হইল। Schiller প্রভৃতি কবিগণই তখন জার্ম্মানজাতির হৃদয়ে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দুই জন নেপোলিয়নের বীরত্ব ও বাহুবল জার্ম্মানজাতির নিকট হইতে সে রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। Schillerএর আত্মাই অলক্ষ্যে Waterloo ও Sedan যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মান সৈনিকগণের জয়লাভের সহায় হইয়াছিল। প্রথমে নেপোলিয়ন, তাহার পর দেশীয় রাষ্ট্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সমগ্র জার্ম্মান জাতি স্বাধীনতার যুদ্ধে যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—জার্ম্মান-সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতা, এবং জাতীয় জীবনে এই সার্ব্বজনীন সাহিত্যের প্রভাব।

WEIMARISM.

তাহার পর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। Goethe ও Schillerএর যৌবনকালের নাট্যের আবেগ ও জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে কলা ও শিল্পনৈপুণ্য আসিয়াছে। Goethe ও Schiller, Weimarএ গিয়াছেন। Schlegel সুন্দরভাবে Shakespeareএর অনুবাদ করিলেন। এদিকে Goetheও

Iphigenia ও Faust রচনা করিলেন। জার্ম্মান-কবিতায় কারুকার্য্য, শিল্প নৈপুণ্য ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেল।

গ্রীক সাহিত্যের সৌন্দর্য্য জার্ম্মান-সাহিত্যে Goetheর Hermann und Dorothea ও Schillerএর William Tellএ প্রতিফলিত হইল। Weimarএ এই গ্রীকসাহিত্য পুনর্জ্জীবিত হইল। কিন্তু বিপরীত দিকে স্রোত ফিরিতে বিলম্ব হইল না। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্বন্ধ শিথিল হইতেছিল, তাহার প্রতিরোধ হইল।

আধুনিক য়ুরোপের সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ

আমরা পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে Romanticism সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি,—Wordsworth, Shelley, Byron প্রভৃতি সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিলেন, প্রচলিত রচনাপদ্ধতি ও আদর্শ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নূতনভাবে সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাহিত্যে নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ আনয়ন করিয়াছিলেন, রূপের মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভাবের খেলায় মুগ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন, ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা ভাবের মাধুর্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের সাহিত্য ব্যক্তিগত ছিল, কারণ তাঁহারা যে ভাবের রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন তাহার সহিত জাতীয় জীবনের কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। Burnsএর সাহিত্যে সে সামঞ্জস্য ছিল, Sturm und drungএর জার্ম্মান-সাহিত্যে সে সামঞ্জস্য ছিল; Wordsworth, Shelly ও Byronএর কবিতায় সে সামঞ্জস্য ছিল না। Goethe ও Schillerএর প্রথম যুগের কাব্যে ও নাট্যে সে সামঞ্জস্য ছিল, কিন্তু

Goetheর Hermann und Dorotheaতে, Schillerএর William Tellএ, তাঁহাদের Weimarismএ সে সামঞ্জস্য ছিল না। ইংলণ্ডে সে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা হইল না। বরং অসামঞ্জস্য আরও বৃদ্ধি পাইল। পরের যুগের সাহিত্য Matthew Arnold, Browning or Swinburneএর সাহিত্য দুই কারণে জাতির হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই,—প্রথমতঃ নবযুগের প্রারম্ভের কবিগণ ভাষার পারিপাট্য উপেক্ষা করিয়া যে সাহিত্যস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন,শেষে তাহার প্রতিরোধ হইল, ইংরাজী সাহিত্যে পুনরায় ভাষার সমাদর, রূপের প্রতি অনুরাগ—classicism ফিরিয়া আসিল। দ্বিতীয়তঃ যে ভাবের রাজ্য তাঁহারা গঠন করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হইল, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি সে রাজ্য-গঠনের একমাত্র উপাদান ছিল না, বাস্তব জীবনের বন্ধন ও সম্পূর্ণতা ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাস্তব-জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল, অথচ মুক্তি অসম্ভব বলিয়া, নিরাশার অন্ধকার অবশেষে Mephistophelesএর হৃদয়ের অন্ধকারের মত সে রাজ্যকে ঘেরিয়া ফেলিল। নেতি নেতি, অবশেষে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে অবিশ্বাসে পরিণত হইল। আমরা সাহিত্য ও সমাজের বিয়োগের চূড়ান্ত শেষে পাইলাম।

HEGEL কর্ত্তৃক WEIMARISM এর আত্মসর্ব্বস্বতার প্রতিরোধ

Goethe ও Schiller শেষ বয়সে জার্ম্মান-সাহিত্যে যে ভাষার পারিপাট্য, ও কারুকার্য্য—যে রূপের আদর—Classicism, আনিতে-ছিলেন, "Romantiker"গণ তাহা হইতে সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Schlegel, Novalis, Eichendorf ও Heine এই নূতন আন্দোলনের নেতা—Sturm und drung সাহিত্যিকগণের উত্তরাধিকারী। এই নূতন আন্দোলন অবশেষে—Heineএর সাহিত্যে তাঁহার নিজের দোষ

নিজেই প্রকাশ করিল। অত্যধিক আত্মম্ভরিত্বের ভারে সাহিত্য পঙ্গু হইয়া পড়িল। ব্যক্তির প্রবৃত্তির তাড়নায় সাহিত্য জর্জ্জরিত হইল। তখন Hegel তাঁহার বিশ্ব-বিজ্ঞান লইয়া সাহিত্যজগতে অবতীর্ণ হইলেন। ব্যক্তি নহে, ব্যক্তির প্রবৃত্তি নহে,—সমগ্র মনুষ্যজাতি, বিশ্ব-জগৎ,—বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিশ্ব-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। Fichte ও Schellingএর যুগ চলিয়া গেল। ব্যক্তি এখন ভাবরাজ্যের কেন্দ্র হইবে না। Romanticismএর কুফল হইতে জার্ম্মান সমাজ ও সাহিত্য রক্ষা পাইল। দার্শনিক Hegel চিন্তা-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। সমাজ, জাতি, ও বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

আধুনিক জার্ম্মান-সাহিত্য

তাহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশে নূতন নূতন সমস্যা আসিয়াছে। সাহিত্যেও পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান-সাহিত্যের জন্ম হইতে যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব ছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। এখনও জন-সাধারণের আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে; শুধু ভাষা ও রচনাপ্রণালী classicism আন্দোলনের ফলে আরও মার্জ্জিত হইয়াছে; রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ফলে বর্ণনা আরও গভীর হইয়াছে। Realism আরও বিচিত্র হইয়াছে। আর এক বিশিষ্টতা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজ্যে সাহিত্যের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তজ্জন্য জার্ম্মান-সাহিত্যের বৈচিত্র্য আছে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তায় সেরূপ বৈচিত্র্য নাই। লণ্ডনই দেশের সমগ্র চিন্তা ও সাহিত্যের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, মফঃস্বলের সমস্ত বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলিতেছে।

জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য-হেতু জার্ম্মান-সাহিত্য সতেজ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু মফঃস্বলের সাহিত্যের বিশেষত্ব সাহিত্যের রাজধানী Weimarকে অবজ্ঞা করে নাই।

SUDERMANN ও HAUPTMANNএর সাহিত্যে দরিদ্রের ক্রন্দন ও জাতীয়সমস্যা

এদিকে রাষ্ট্রীয় রাজধানী Berlinএ শ্রমজীবীদিগের সহিত ধনিগণের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদিগণ Berlinএ তাঁহাদের মত প্রচার করিতেছেন। কবি ও নাট্যকারগণ সেই খানেই দরিদ্রের নির্য্যাতন, খৃষ্টান জগতে ধনীর অভিমান সমাজকে দেখাইতেছেন। Suddermann তাঁহার "Ehre" এবং "Heimat"এ তাহা সুন্দর-ভাবে দেখাইয়াছেন; Hauptmann তাঁতীদিগের দুঃখকাহিনী গায়িয়াছেন; মাতালের কন্যা "Hannele"র করুণ ক্রন্দন সমাজকে শুনাইয়াছেন। জার্ম্মান-সাহিত্য দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এখন Social democrat-গণ খুব প্রবল হইতেছে।

জার্ম্মান-সাহিত্য—সার্ব্বজনীন

সমাজের সহিত—জাতীয় জীবনের সহিত জার্ম্মাণ-সাহিত্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Luther সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া Schlegel বলিয়াছিলেন,—

"No other country in modern Europe has possessed so many remarkable, comprehensive, powerful and intellectually important *popular* writers as Germany. How inferior soever the higher classes of Germany may have

been during same ages and those of other lands, or how late soever they may have attained to a fair standard of refinement ; in no other country did *the people as a whole,* evince so great a degree of general mental power from the earliest times on record, or so much of that natural energy which lies in the depths of humanity."

ইহার যথার্থতা আরও প্রতীয়মান হইতেছে। একজন আধুনিক সমালোচক সম্প্রতি বলিয়াছেন, Germany presents the grandest example of what popular literature can do for a nation.

বাঙ্গালা সাহিত্যে Romanticism

য়ুরোপীয় সাহিত্যে Romanticismএর মত আমাদের সাহিত্যেও যুগান্তর আসিয়াছে। সাহিত্যে নূতন চিন্তা নূতন আদর্শ পৌঁছিয়াছে। জার্ম্মান-সাহিত্যে Sturm und drungএর কবিতার মত, ইংরাজী সাহিত্যে Wordsworth, Shelley, Byron এর কবিতার মত, বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতিকাব্যে সমাজ-জীবনের সহিত ব্যক্তিগত চিন্তার বিরোধ, ও তাহার ফলে অশান্তি ব্যাকুলতা—Sturm und drung—বিপ্লব-সাধনের ফলে, বাঙ্গালার সাহিত্য পর্ব্বত-গুহায় সুপ্ত নির্ঝরের মত নূতন আলোক পাইয়া স্বপ্নের মোহ ত্যাগ করিয়াছে, এখন সে নূতন প্রাণে নূতন আশায় সমস্ত সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিতেছে—

"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" আমরা সাহিত্য-জগতে এই যুগান্তরের চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা Sturm und drungএর অশান্তি ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাই, Goetheর Werther ও Schillerএর Robbersএর অশান্তি ও ব্যাকুলতা পাই, Wordsworthএর মত ক্লিষ্ট মানবাত্মার প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ পাই,—What man has made of man পাই,—Byron ও Shelleyর বিপ্লববাদ পাই, নূতন করিয়া জগৎ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা পাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আত্মসর্ব্বস্বতা

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা ভাবের রাজ্য তাহার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাবের রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য, Shelleyর মত একটা Utopia। তাহার সবই সুন্দর, সবই মহৎ, শুধু তাহা সজীব নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। "প্রকৃতির পরিশোধ," "অচলায়তনে" তিনি এক অপরূপ জগৎ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন; Goethe ও Schiller, Novalis ও Heine যে বস্তুর জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি সে জগৎ গড়িতে পারেন নাই; তাঁহার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, তাহা তাঁহার কল্পনায় ধারণা হইয়াছে মাত্র, জাতির হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার "গোরায়" আমরা একটি সজীব বস্তুর জগৎ-গঠনের উপাদান পাইয়াছি মাত্র; সে উপাদানগুলি ব্যবহার করিয়া একটি সম্পূর্ণ বাস্তব-জগৎ এখনও গঠিত হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা।

আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য ও নাট্যের এই অসম্পূর্ণতার জন্যই ভাষা ও রচনা-প্রণালী জটিল হইয়া পড়িতেছে, ইংরাজী সাহিত্যে Romanti-

cismএর একজন নেতা Wordsworth, যে দৈনন্দিন জীবনের ভাব ও ভাষা কবির লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার উল্টা আমরা করিতেছি। দৈনন্দিন জাতীয় জীবন হইতে দূরে থাকায় আমাদের সাহিত্য কৃত্রিম, পঙ্গু হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতার প্রধান কারণ,—কবিগণের ভাবপ্রবণতা, আত্মসর্ব্বস্বতা, সাত্মকেন্দ্রকতা Egoistic subjectivity, কিম্বা বাস্তব-জগতের অভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেদের কল্পনার তৃপ্তিসাধন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহার কারণ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থাহেতু আমাদের কর্ম্ম-প্রবণতার অভাব। তাই আমাদের সাহিত্য চিন্তার সহিত বাস্তব-জীবনের বিরোধ কিছুতেই ঘুচাইতে পারিতেছে না। দেশে কর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে সাহিত্যক্ষেত্রে আর একবার যুগান্তর আসিবে। তখন আমাদের সাহিত্য Shelley, Byronএর সাহিত্যের মত শুধু একটা অশান্তি, একটা ব্যাকুলতা, একটা নূতন সমাজ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না; তখন সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লববাদের সহিত অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, তখন চিন্তার সহিত বাস্তবজীবনের অতি সুন্দর সমন্বয়-সাধন হইবে, একটা নূতন জগত সৃষ্ট হইবে; জার্ম্মান-সাহিত্যের মত আমাদেরও সাহিত্য Goethe ও Schiller, Suddermann ও Hauptmann প্রভৃতির ন্যায় কবিগণ-সমন্বিত হইয়া একটা সজীব বাস্তব-জগৎ গড়িবে; সে জগতে সমগ্র সমাজের দীন দরিদ্র ধনী মধ্যবিত্তদের অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হইবে; তখন আমাদের সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইবে, দেশের প্রাণকে আন্দোলিত করিবে, মাতাইতে পারিবে এবং তখনই আমাদের কবিগণ স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি-স্বরূপ আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন।

স্বদেশে নূতন কর্ম্ম ও নূতন চিন্তার সূচনা হইয়াছে; স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তির স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব হইবে না।

সাহিত্যের আভিজাত্য

প্রত্যেক সাহিত্যকেই তিনটি স্তর অতিক্রম ক'রতে হয়; (ক) ভাবুকতার প্রথম যুগ; নবজীবনের সূচনা, নূতন ভাবের উদ্বেগ। সাহিত্যে অশান্তি ও ব্যাকুলতার পরিচয়, স্বাধীনতা ও বিপ্লববাদ—কল্পনারাজ্যগঠন, বাস্তবজীবনের সহিত সাহিত্যের বিয়োগ; আত্মকেন্দ্রতা ও আত্মসর্ব্বস্বতা। Shelley ও Byronএর কবিতা, Goetheএর The Sorrows of Werther, Pushkin ও Lermonteffএর romance, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির পরিশোধ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও তাঁহার প্রথম বয়সের খণ্ডকবিতা এই স্তরের।

(খ) ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সংমিশ্রণ।—অশান্তি ও বিপ্লবের পর একটা সামঞ্জস্যবিধানের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। বিপ্লববাদের পর একটা ধীর সমালোচনার প্রয়োজন হয়। পুরাতন আদর্শের সহিত নূতন ভাবের একটা সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা হয়। সাহিত্য আত্মসর্ব্বস্ব না হইয়া ক্রমে মনুষ্য ও সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সহিত একটা নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করে। জার্ম্মান সাহিত্যে Goethe, Novalis, Richter ও Heine, ফরাসী সাহিত্যে Victor Hugo, Gauttier ও Musset, ইংরাজী সাহিত্যে Browning ও Swinburne, এইরূপে একটা নূতন পুরাতনে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভাব-রাজ্য

বাস্তবজীবনের একটা সমন্বয়-বিধানের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতায় আমরা পুরাতন ভাবগুলি নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন', 'অচলায়তন', 'রাজা' ও 'ডাকঘরে' আমরা একটা নূতন সমাজ-গঠনের উপাদান দেখিতে পাই; রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে, তাঁহার জীবন-দেবতায়, নৈবেদ্যে, মরণ-সঙ্গীতে আমরা একটা নূতন ব্যক্তিত্বের—একটা নূতন জীবনের পরিচয় পাই।

(গ) বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা,—সাহিত্য তখন কবির কল্পনার সামগ্রী নহে, কবির সাধনার ফল এবং কবির সাধনা তখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কবি অনেক সাধনার পর ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের একটা সুন্দর সমন্বয়সাধন করিতে পারিয়াছেন; এবং তিনি জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, সমাজের যুগধর্ম্ম আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন; এবং সাহিত্যের দ্বারা সেই জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। Ibsen ও Maeterlinck কাব্য-নাট্যে, Tolstoy ও Dostoeiveskyর নাটকে উপন্যাসে, Suddermann ও Hauptmann-এর কাব্যে নাটকে আমরা এই তৃতীয় স্তরের সাহিত্যের পরিচয় পাই।

আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য এখন তৃতীয় স্তরে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যের গুণগুলি আমাদের সাহিত্যে যেরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা অপর কোনও সাহিত্যে দুর্লভ। সাহিত্যে অশান্তি ও বিপ্লববাদের পরিচয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ, বন্ধনের ভিতর পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের রবীন্দ্রনাথেই আছে। নূতন জগৎ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। নূতন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সবগুলিই

স্বপ্নের রাজ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' ও 'গোরা'য় যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত বাস্তবজীবনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে একটা আদর্শ জীবন বলিতে পারি না; কারণ, তাহা একেবারেই অনধিগম্য।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য তৃতীয় স্তরের ছিল। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে, বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতিতে শুধু ভাব-রাজ্যের কথা আছে, মুক্তির কথা আছে, সংসারের—বাস্তবজীবনের কোনও কথা নাই। কিন্তু বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা লইয়াই আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য নহে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, রঘুবংশ আছে; নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র আছে; শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা আছে। বেদান্ত প্রভৃতির আরম্ভ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ব্রহ্মলাভের উপায় কি, এই সব প্রশ্নের আমাদের মোক্ষশাস্ত্রে মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসাহিত্য শুধু মোক্ষ লইয়া ব্যস্ত নহে, শুধু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা লইয়া ব্যস্ত নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কামও হিন্দুসাহিত্যে আছে; "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র সহিত, "সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে" তাহারও উপদেশ আছে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্যবোধের সমন্বয় হইয়াছে, ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য যে ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়াছে, তাহা—

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of heaven and home."

আমাদের মহাভারত কি? আমরা বলি,—"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" ভারতাত্মার স্বপ্রকাশ হইয়াছে মহাভারতে। মহাভারত ভারতের মহাকাব্য; ভারতের মহাকাব্যে আমরা কি

দেখিতে পাই? বেদান্ত উপনিষদে যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সত্যগুলিই সমাজ ও সংসারের কাজে লাগিয়াছে,—মহাভারতে। মহাভারতে,—আমরা দেখি টাকার ঝন্‌ঝনানি, বিলাসিতার আড়ম্বর, ভোগবাসনার প্রবল তাড়না, নারীর অবমাননা, পাশাখেলা, ব্যসন সমুদায়ের চরিতার্থতা, বৈষয়িক অবস্থার চরম উন্নতি, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তুমুল প্রতিদ্বন্দিতা, আন্তর্দ্দেশীয় সন্ধি, যুদ্ধবিগ্রহ,—ইহসংসারের সর্ব্ববিধ-উন্নতি, ভোগবাসনার চরম;—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত উপনিষদের স্বর বেশ শুনা যাইতেছে, দুর্য্যোধনের সঙ্গে ভীষ্মও আছেন, —দুর্য্যোধনের অসীম শক্তি, অসীম ভোগ, ভীষ্মের রাজমুকুট ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত-অবলম্বন, কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ, মহাযুদ্ধের প্রত্যেক অঙ্কে পরাজিত শত্রুর প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শন, নিষ্কামসেবাব্রত, বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা—সবই মহাভারতে আছে,—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শত্রৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রসবা ইব॥

মহাভারতে সংসার ভোগের চরিতার্থতা-সাধনের পথ দেখাইতেছে, ধর্ম্ম ভোগকে সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সংসার কর্ম্মস্পৃহা জাগাইতেছে, ধর্ম্ম ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণ শিখাইতেছে; সংসার অর্থাগমের সুযোগবিধান করিতেছে; ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও দানব্রতের মহিমা প্রচারিত করিতেছে; সংসার গৃহস্থালী শিখাইতেছে; ধর্ম্ম প্রতিবেশী অতিথি অনাথদিগের মধ্যে গৃহবিস্তার শিখাইতেছে। সংসার বলিতেছে,—তুমি তোমাকে অজয় অমর মনে করিয়া বিদ্যা ও অর্থের চিন্তা কর; ধর্ম্ম বলিতেছে,—সংসার এখনই আছে, এখনই নাই,—পদ্মপত্রে জলের মত, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিসাধনের জন্য প্রস্তুত হও।

মহাভারতে আমরা মোক্ষধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের সমন্বয়সাধনের চরম দেখিয়াছি ; ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্যবিধানের চরম দেখিয়াছি।

আমাদের রামায়ণেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি। ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাসের উপর ত্যাগধর্ম্মের—সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবোধের নিকট ইন্দ্রিয়সুখের বলিদান রামায়ণে আছে।

আমাদের পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি জনসমাজে মোক্ষধর্ম্মের মহনীয় ভাবগুলির প্রচার করিয়াছে। ভাবুকতা বা mysticism গল্প, কাহিনী উপন্যাস, রূপকথার ভিতর দিয়া বাস্তবজীবনের ভিত্তির উপর গ্রথিত হইয়া জনসমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, এবং তাহার চরিত্রগঠন করিয়াছে।

আমাদের সাহিত্য কখনই একটা অলীক ভাবুকতা—একটা অপকৃষ্ট mysticism লইয়া সন্তুষ্ট ছিল না। আমাদের সাহিত্য চিরকাল ব্যক্তির সংসার বন্ধনের মধ্যে আপনার কর্ত্তব্যসাধনের পন্থার নির্দ্দেশ করিত। আমরা শকুন্তলায় কি দেখি ? উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যে যৌবন-আবেগ romantic loveএর চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ; শকুন্তলায় সেই romantic loveএর পরিণাম ইঙ্গিতে সূচিত হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত তপস্বিনী শকুন্তলাকে চাহিলেন। কাম সমাজ-বন্ধন মানিতে চাহিল না। তপস্বিনীও রাজমহিষী হইতে চাহিলেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপ ভগবান বা সমাজের অমোঘ বিধানের মত ইন্দ্রিয়সুখভোগের অন্তরায় হইল। তপস্বিনা রাজগৃহিণী হইতে পারিলেন না। রাজা তপস্বিনীকে ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পাইলেন না। শেষে সংসার ও সমাজের জন্য আপনার কর্ত্তব্যসাধন করিয়া, আপনাদের নিজ নিজ আশ্রমে স্বধর্ম্ম-নিরত থাকিয়া, অসহ্য অনুতাপ-

দুঃখের দ্বারা পবিত্র হইয়া,—দুই জনের romantic loveএর নহে,—প্রেমের মিলন হইল। শকুন্তলা মারীচের তপোবনে "বসনে পরিধূসরে বসানা" হইলেন, "নিয়মক্ষামমুখী" হইলেন; তবেই তিনি দুষ্মন্তকে পাইলেন। তাঁহার প্রকৃত প্রেম হইয়াছিল—আমরা তখন বুঝিতে পারি, যখন তিনি মিলনকালে দুষ্মন্তকে কোনও দোষ দিলেন না, শুধু কাঁদিতে লাগিলেন,—আপনার ভাগ্যকে দোষ দিলেন। দুষ্মন্তেরও প্রকৃত প্রেম হইয়াছিল, তাই তিনি অগ্রে পুত্র ভরতকে পাইলেন, তাহার পর ভরতজননীকে পাইলেন। "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্", ইহাই ধর্ম্ম। শান্ত, সংযত, অথচ প্রবল পুত্রস্নেহের ভিতর দিয়া,—মোহোন্মত্ততার ভিতর দিয়া নহে,—দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইলেন। Romantic love সংসারের শাসন অবজ্ঞা করিয়া একটা বিরোধ আনিয়াছিল। কিন্তু বিরোধ দূর হইয়া শান্তি আসিল। কাম প্রেমে পরিণত হইল। যৌবনলীলার ভাবরাজ্যের সহিত সংসারের কল্যাণ-কর্ম্মের কোনও অসামঞ্জস্য থাকিল না। শকুন্তলা আরম্ভ হইয়াছিল উদ্বেগে, অসংযমে; শেষ হইল গভীর শান্তি ও শুদ্ধতায়। শকুন্তলার মত হিন্দুজীবন এইরূপেই ভাবুকতার সহিত সংসারধর্ম্মের সমন্বয়সাধন করিয়া প্রকৃত শান্তি অনুভব করিয়াছে। শকুন্তলায় আমরা ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের সুন্দর মিলন দেখিলাম। ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের এই সুন্দর সম্মিলন লক্ষ্য করিয়াই Goethe বলিয়াছিলেন,—মর্ত্ত ও স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চাহে, সে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের সমন্বয়বিধান mysticism, realismএর সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আর একটা বড় আদর্শেরও পুষ্টিবিধান হইয়াছিল।

যেখানে mysticism ও realismএর একটা সামঞ্জস্যবিধান না

হয়, সেখানে সাহিত্য জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া যায়; সাহিত্যে অধিকারভেদের সৃষ্টি হয়, অভিজাত্য-গৌরব সে সাহিত্যকে আক্রমণ করে। তখন একটা ধারণা জন্মে,—সাহিত্যে সকলের সমান অধিকার নাই,—সাহিত্যের মহনীয় ভাবগুলি সার্ব্বজনীন নহে। আমাদের সাহিত্যে তাহা হইতে পারে নাই। হিন্দু ঋষিগণ যে সমস্ত মহনীয় ভাব উপলব্ধি করিতেন—সেইগুলিই নানা গল্প রূপকথার ভিতর দিয়া লোকসমাজে প্রচারিত হইত। আমরা মহাভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতের গল্পগুলি ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দু ঋষিগণের মহনীয় ভাব সমুদয় সার্ব্বজনীন হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন—কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ গ্রামে গ্রামে জাতীয় চরিত্রের গঠন করিতেছে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় 'এপিক'। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলি দেবতা বা অতিপ্রাকৃত নহে। রামও মানুষ, কৃষ্ণও মানুষ; ভীষ্মও মানুষ, পাণ্ডবগণও মানুষ। রামায়ণের চরিত্র-বর্ণনায় রামচন্দ্র যদি দেবতা হইতেন, তাহা হইলে, তিনি কখনই বহু-শতাব্দী ধরিয়া সকলের হৃদয়ে স্থান পাইতেন না। মুদী যখন সন্ধ্যার সময়ে দোকানের কেনাবেচা শেষ করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে থাকে, এবং খেয়ার মাঝি, গ্রামের কামার, ছুতার চাষা মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসে, তখন তাহারা সকলেই জানে, তাহারা দেবতাদের অতিপ্রাকৃত জীবনের কথা নহে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের সুখ দুঃখের কাহিনী পাঠ করিতেছে। রামায়ণ মহাভারতে যে ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর প্রেম, ভৃত্যের প্রভুসেবা, মাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি

প্রভৃতি দেখান হইয়াছে, তাহাদের সহিত আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনও ঘটনার সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবিয়া থাকে। এই উপায়েই তাহাদের চরিত্র গঠন হয়। রামায়ণ মহাভারত গৃহজীবনের এক একটা প্রকাণ্ড কাব্য। ইহারা epic বটে, কিন্তু Prometheus, Samsonএর অতিপ্রাকৃত ঘটনার আশ্রয় না করিয়া দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া একই সঙ্গে আপামর জনসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিয়াছে।

লোক-সাহিত্যের আরও দুইটি প্রধান ধারা লক্ষিত হয়। প্রথম, চণ্ডী-সাহিত্য।—এখানেও ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। কালিদাসের কুমার-সম্ভবে ইহার সূচনা। পার্ব্বতী মহাদেবকে বিবাহ করিবেন। মহাদেব তাপস-শ্রেষ্ঠ। পার্ব্বতী বসন্ত-পুষ্পাভরণা হইয়া ললিত যৌবন-সৌন্দর্য্যের ছবির মত যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অকাল বসন্ত ও বসন্তসখা লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। তাই মহাদেব তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহার-পর পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা ও মহাদেবের সহিত মদনভস্মের পর প্রেমের মিলন। বাঙ্গালী-কন্যারা এখনও স্বামী লাভ করিবার জন্য মেনকা-কন্যার মত মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যে কালিদাসের বর্ণনা-মাধুর্য্য নাই। কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পার্ব্বতীর বিবাহ, শ্মশানচারী জামাইকে দেখিয়া সখীগণের খেদ, মহাদেবের ভুবনমোহন রূপ, পার্ব্বতীর শ্বশুরালয়ে যাত্রাকালে বিদায়-দুঃখ,বৎসরান্তে একবার কন্যার পিতৃগৃহে আগমন ও সকলের আনন্দ উৎসাহ এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, মনে হয়, কালিদাস নহে, ইঁহারাই হর-পার্ব্বতীর গল্পকে গৃহজীবনের একটি সুন্দর মহাকাব্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভবে, রাজসভার কবি

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, জনসাধারণের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যে আমরা হরগৌরীর আখ্যান পাইয়াছি। কালিদাসের হরগৌরী কৈলাসের শিবপার্ব্বতী ; কৈলাসেই তাঁহাদের ঘর-সংসার, দেবদারুগাছ, কৃষ্ণসার মৃগ ; কিন্নরদিগের মধ্যে শিবপার্ব্বতী সংসার পাতিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম শিবপার্ব্বতীকে একেবারেই বাঙ্গালীর ঘরে আনিয়া বসাইয়াছেন। বিশেষতঃ মুকুন্দরাম হরগৌরীকে আমাদের পর্ণকুটীরের সমস্ত দৈন্য ও ক্ষুদ্রতার দ্বারাই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিন জনেই একটা ভাবরাজ্যের কল্পনাকে গৃহধর্ম্মের শিক্ষায় পরিণত করিয়াছেন। যাঁহার নিকট দেশের জন-সাধারণ সর্ব্বাপেক্ষা আপন, তিনি হরগৌরীকে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা আপন করিতে পারিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম ব্যতীত আরও অনেক কবি হরগৌরীর আখ্যায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সকলেই কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা নূতন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন ; অন্যে কালিদাসের অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

লোকসাহিত্যের আর একটি ধারা—বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্য এক অপরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যের, অনন্ত প্রেমের রাজ্য গড়িয়াছে। কিন্তু এ রাজ্যের সহিত কি সংসারের কোনও সম্বন্ধ নাই? বৈষ্ণবের গান কি শুধু বৈকুণ্ঠের—রাধাকৃষ্ণের, এ সংসারের নহে? বৈষ্ণবের প্রেমগান এ সংসারের, শুধু রাধাকৃষ্ণের নহে। প্রত্যেক গৃহের নর-নারীর মিলনের ছবি বৈষ্ণব কবিগণ আঁকিয়াছেন।—

"এই প্রেম-গীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

বৈকুণ্ঠের সহিত সংসার কিরূপ মিশিতে পারে, দেখিলাম ; চরম ভাবুকতার সহিত সংসার-ধর্ম্মের সম্বন্ধ-স্থাপন দেখিলাম।

আমরা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মূলস্থত্রগুলির ইঙ্গিত করিয়া, তাহাই অবলম্বন করিয়া সমাজে হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের বিষয়ক সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি, সাহিত্যের প্রথম স্তর—একটা নূতন ভাব ও আদর্শের শক্তি—স্বাধীনতা, অশান্তি ও বিপ্লববাদ ; যতদিন সে ভাব ও আদর্শের সহিত পুরাতন সমাজের একটা সামঞ্জস্যবিধান না হয়, ততদিন সেই অশান্তি ও বিপ্লবের শেষ হয় না। দ্বিতীয় স্তরে ঐ নূতন আদর্শ লইয়া সমাজের একটা ভাঙ্গা গড়া হয় ; শেষে ভাঙ্গা গড়ার পর যখন সমাজ ঐ নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়া একবারে পূর্ণগঠিত হয়, তখন সাহিত্যের বাণী সার্থক হয়।

প্রথমে আমরা লোকসাহিত্যে ,অশান্তি ও বিপ্লববাদের কথা বলিতেছি। ভারতবর্ষ চিরকাল গৃহধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে। ভারতবর্ষে সমাজ চিরকালই ব্যক্তির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার, জাতি ও আশ্রমের অনুবর্ত্তী থাকিয়া ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। সমাজতন্ত্রই ভারতে ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যক্তির এক দিকে স্বাধীনতা আছে ; সে স্বাধীনতার উপর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তাহা ধর্ম্মের দিকে—ব্যক্তি আপনার মুক্তিসাধন আপনিই করিবে। আপনার নিজের সাধনা ভিন্ন মুক্তিলাভ অসম্ভব। ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস—হিন্দু আপনার

অধ্যাত্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী। সমাজ এক দিকে তাহাকে কর্ম্মবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতেছে; ব্যক্তি আর এক দিকে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তি সাধনের প্রয়াসী হইয়াছে—এই রূপেই হিন্দু-ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। অনেক সময়েই সমাজের এই কর্ত্তব্যবন্ধন খুব কঠোর বলিয়াই মনে হয়। সাহিত্যে এই বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। আমরা হরগৌরীর গান ও রাধাকৃষ্ণের গানে তাহা পাইয়াছি।

হিমালয়ের তপোবনে মহাদেব যোগনিমগ্ন রহিয়াছেন। এমন সময় বসন্ত আসিল। বিশ্বপ্রকৃতির উন্মত্ত অবস্থার নামই বসন্ত। মনুষ্য-প্রকৃতিতেও একটা উন্মত্ত প্রেমের উন্মেষ হইল। সে উন্মত্ত প্রেম দেশকালপাত্রকে অগ্রাহ্য অপমানিত করিয়া এক জন তপস্বীর নিকট এক "বসন্তপুষ্পাভরণা" কুমারীকে গৃহপ্রাঙ্গন হইতে বিচ্যুত করিয়া লইয়া আসিল। প্রেমের দুর্নিবার শক্তি যোগীর তপোভঙ্গের—গৃহধর্ম্মের পরাভবের সূচনা করিল; সমাজের কর্ত্তব্য-বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিবার সুযোগ পাইল।

বৃন্দাবনেও রাধা কুলশীল জাতিমান সবই ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

"বঁধু, কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি।
এ কুলে ও কুলে, গোকুলে দু কুলে আপন বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি কমল-পায়॥"

কলঙ্ককে বরণ করিতে দ্বিধা করিলেন না,

"কলঙ্কী বলিয়া ভাবে সব লোক,
তাহাতে নাহিক দুখ;

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।”

রাধাকৃষ্ণের গানে আমরা যে শুধু সংসারের কর্ত্তব্যবন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখাইতেছি, তাহা নহে। এখানে প্রেমের দুর্নিবার স্রোতে—শুধু সমাজ নহে, শুধু “জাতিকুল” নহে,—মান সম্ভ্রম, ধর্ম্ম—“দু কুল” ভাসিয়া গিয়াছে। হরগৌরীর গান অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের গানে আমরা প্রেমের সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদিনী শক্তির অধিক পরিচয় পাই। গৌরীর প্রেমে আমরা গৃহের শাসন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখি; নিন্দা ও লজ্জাকে কখনও বা অগ্রাহ্য করা দেখি, কিন্তু রাধার প্রেমের মত মান-সম্ভ্রম ত্যাগ, কলঙ্কের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিতে পাই না।

“কুলবতী হইয়া, কুলে দাঁড়াঞা
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥”

হর-গৌরীর গানে আমরা এই ‘তুষের অনলে’ আত্মসমর্পণ ও আত্মবিস্মৃতি দেখি না। রাধাকৃষ্ণের গানে প্রেমের দুর্নিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, হরগৌরীর গানে নহে।

কিন্তু গৌরীর প্রেম ও রাধার প্রেম, দুইই হিন্দুসমাজনীতির হিসাবে দোষের। তাই হিন্দু সাহিত্য যখন উন্মত্ত প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছে, তখন তাহাকে সমাজের বাহিরে সংসার হইতে অনেক দূরে রাখিতে ভুলে নাই। হিমালয়ের তপোবন, বৃন্দাবনের কুঞ্জের সহিত আমাদের সমাজের কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রেম ব্যক্তিকে সমাজবন্ধন অবজ্ঞা করিতে বলিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তির এই বিপ্লব প্রকাশ্যে সমাজের ভিতর

দেখা যায় নাই, গোপনে সংসার হইতে অনেক দূরে এই বন্ধনবিহীন প্রেমের লীলা দেখা গিয়াছে।

তবুও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমের এই বিপ্লব-সাধনের সহিত সংসার-ধর্ম্মের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে।

মহাদেব গৌরীর উন্মত্ত প্রেমকে অগ্রাহ্য করিলেন; মদনকে ভস্মীভূত করিলেন। মহাদেব যেমন তপস্যা করিয়াছেন, পার্ব্বতীও সেইরূপ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কোনও মুনিও পার্ব্বতীর মত এত কঠিন তপস্যা করেন নাই। সুকঠোর তপস্যার দ্বারা পার্ব্বতী মহাদেবকে বুঝিলেন। তাঁহার প্রকৃত প্রেম জন্মিল। তাই যখন মহাদেব তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিলেন, তিনি কোনও লজ্জা বা দ্বিধা না করিয়া মহাদেবের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলেন। তপস্যার পূর্ব্বে পার্ব্বতীর হৃদয় সংশয়রহিত ছিল না। সখীদিগের সহিত মহাদেবের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায়, মাতার সহিত কথোপকথনে, আমরা তাহার পরিচয় পাই। পার্ব্বতী অপরিচিত সন্ন্যাসীর নিকট মহাদেবের অপমান শুনিয়া অবশেষে নিঃশঙ্ক-চিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—

“মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে॥”

আমার মন মহাদেবেই আসক্ত রহিয়াছে। কামবৃত্তি লোকাপবাদ ভয় করে না। পার্ব্বতী আপনাকে যখন “কামবৃত্তি” স্বীকার করিলেন, তখন তাঁহার প্রকৃত প্রেম হইয়াছে। মহাদেব প্রেমমূর্ত্তি তপঃকৃশা পার্ব্বতীকে আর প্রত্যাখ্যান করিলেন না। “তবাস্মি দাসঃ”; তুমি আমাকে তপস্যার দ্বারা কিনিয়া লইয়াছ, এই বলিলেন। তাহার পর মহাদেব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা সপ্ত ঋষিগণকে জানাইলেন। তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন মেঘের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করে,

সেইরূপ দেবগণ আমাকে পরহিতব্রত জানিয়া আমার নিকট সন্তান প্রার্থনা করিতেছেন। 'যাজ্ঞিক যেরূপ অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্ত অরণি আহরণ করেন, আমি সেইরূপ সন্তান উৎপাদন করিবার জন্ত পার্ব্বতীকে চাহিতেছি।' ঋষিগণ পার্ব্বতীর পিতার নিকট যাইয়া মহাদেবের জন্য পার্ব্বতীকে চাহিলেন।

যাবন্ত্যেতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
মাতরং কল্পয়ন্ত্যেণামীশো হি জগতঃ পিতা॥

চরাচর সমগ্র বিশ্ব তোমার কন্যাকে মা বলিয়া সম্বোধন করুক; কারণ, মহেশ জগতের পিতা।

বসন্তের ভাবরাজ্যের উন্মত্ত প্রেমের, স্থনিয়ম সংযমের "প্রতিকূলবর্ত্তী" বসন্তে মদনের আবির্ভাবে, "বসন্তপুষ্পাভরণা" গৌরীর ললিত যৌবনের সৌন্দর্য্যে আরম্ভ হইয়াছিল, স্থকঠোর তপস্থায়, "অতিমাত্রকর্ষিতা" "দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদা" গৌরীর কল্যাণী মূর্ত্তিতে জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের "অত আহর্ত্তুমিচ্ছামি পার্ব্বতীমাত্মজন্মনে" এই অভিলাষে শেষ হইল। মহাদেব পার্ব্বতীর বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। বিবাহের দিনে—

তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা, প্রফুল্লচক্ষুঃকুমুদঃ কুমার্য্যাঃ।
প্রসন্নচেতঃসলিলঃ শিরোহভূৎ সংসৃজ্যমানঃ শরদীব লোকঃ॥

শরৎকালে চন্দ্রোদয়ে যেমন কুমুদকুল ফুটিয়া উঠে, এবং জল নির্ম্মল হয়, সেইরূপ কুমারীর সহিত মিলিত হইয়া মহাদেবের চক্ষু প্রফুল্ল কুমুদপুষ্পের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইল, এবং তাঁহার মন নির্ম্মল জলের মত প্রসন্ন হইল। কবি ইহার সঙ্গে কি সুন্দর শান্তি ও সংযমের মঙ্গলময় ছবি আঁকিয়াছেন,—

হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।

মহাদেব, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন চঞ্চল,—ধৈর্য্যহীন হয়, সেইরূপ

হইলেন। তুলনা করিলে আমরা কুমারসম্ভবের তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্বর্গের প্রভেদ বুঝিতে পারি।

বিবাহের দিনে মেনকার খেদ—

কান্দয়ে মেনকা গৌরীর মায়া-মোহে
ঝলকে ঝলকে খসে লোচনের লোহে॥
বর দেখি আইয়ো স্থয় করে কাণাকাণী
চক্ষু খাউক কন্যার পিতা, চক্ষে পড়ুক ছানি॥

শিবের মদনমোহন-বেশধারণ, নারীগণের পতিনিন্দা, কিন্তু—

সতী রমণী বলে খালি আপন জাতিকুল।
আপন স্বামী কনকচাঁপা, পর শিমুলের ফুল॥

গৌরীর সহিত মেনকার কলহ,—গৌরীকে মেনকা বলিতেছেন—

যদি দুগ্ধ উতলয়ে নাহ দেহ পাণী,
পাশা খেল সবে মিলি দিবস রজনী।
মিছা কাজে ফিরে স্বামী, নাহি চাষ বাসা,
ভাত কাপড় কত আর যোগাব বার মাসা।

গৌরী উত্তর দিলেন—

জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।
তাহে হয় মাষ মসুরী তিল কাজলে ধান॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মা গো কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তোমার ঘরে পুঁতিলাম কাঁটা॥

হরগৌরীব কৈলাসত্যাগ, হরগৌরীর কলহ প্রভৃতি বাঙ্গালী কবি এমন ভাবে গায়িয়াছেন যে, আমরা মনে করিতেছি,—হর ও গৌরী বাঙ্গালীর কুটীরেরই নরনারী, তাহাদের সুখদুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কবি সুন্দরভাবে দেখাইয়া গৃহধর্ম্মের সহজ ও সরল উপদেশ দিয়াছেন।

হরগৌরীর কথাগুলি গ্রামে গ্রামে কাব্য, গান, কবিতা ও ছড়ার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীকে গৃহধর্ম্ম শিখাইয়া আসিতেছে। হরগৌরীর কথায় প্রথমে আমরা প্রেমের বন্ধনবিহীনতা দেখি প্রেমের আবেগে সমাজবাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সূচনা দেখি; কিন্তু শেষে বন্ধনবিহীন প্রেমের পরাজয় হইল, প্রেম বন্ধনে সার্থকতা লাভ করিল। তখন অকাল-বসন্ত, গৌরীর একাকিনী মহাদেবের নিকট আগমন, মদনের শরসন্ধান রহিল না। সংসারের সকলেই প্রেম-মিলনে যোগদান করিল, কিছুই গুপ্ত, কিছুই অপ্রাকৃত রহিল না, সবই সহজ, সরল, ব্যক্ত, শুভ হইল। হরগৌরীর কথা আরম্ভ হইয়াছিল সমাজ-বন্ধনের অবজ্ঞায়; শেষ হইল সমাজনিয়মের প্রতিষ্ঠায়। হিন্দুসমাজ স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন বরণ কখনও স্বীকার করে নাই; সাহিত্যক্ষেত্রে, কবিগণের কাল্পনিক জগতে, তাই আমরা ইহার বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব দেখিলাম; সে বিপ্লবে অশান্তি ও অসংযম রহিল না, সমাজে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হইল। সাহিত্যই এই সামঞ্জস্যবিধান করিল; ধর্ম্ম এই সামঞ্জস্যবিধানের সহায় হইল। কবিগণের কল্পনা-জগতের সহিত গৃহসংসারের একটা সুন্দর সমন্বয় দেখা গেল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরগৌরীর গান অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের গানে প্রেম অধিক দুর্নিবার হইয়াছে। আমরা হরগৌরীর কথায় এই প্রেম ও সংসারধর্ম্মের একটা সামঞ্জস্য-স্থাপন দেখিলাম। রাধাকৃষ্ণের গানেও একটা সামঞ্জস্য-স্থাপন হইয়াছে, তাহাও গৃহধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপন। বৈষ্ণব কবিগণ নর-নারীর দুর্নিবার সমাজ-বিরোধী প্রেমের নিন্দা-লজ্জা-ভয়ে অবজ্ঞা ও পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতিকে নূতন চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহারা এই আত্ম-বিস্মৃতির সহিত জীবের সহিত ঈশ্বরের নিগূঢ় সম্বন্ধের উপমা দিয়াছেন। সংসার-সমাজের সমস্ত বাধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

করিয়া আপনার জাতি-কুল-মান সব ভুলিয়া ভগবানের চরণে একাকী সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলে জীবন সার্থক হয়, বৈষ্ণব-কবি ইহাই বুঝিয়াছেন।

"পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন ভায়॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম তোমার চরণখানি।"

চণ্ডীদাসের "তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি"—ইহার সঙ্গে "ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ" মিলাইলে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইব না। যখন বিদ্যাপতি তাঁহার সুললিত কণ্ঠে গান ধরিয়াছেন, তখন ভগবৎ-প্রেমের বিহ্বলতা ও অতৃপ্তিই বর্ণিত হইয়াছে।—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশন গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

কবি চণ্ডীদাস সমাজের হিসাবে অত্যন্ত কুকাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি—গোপনে, অস্পষ্ট ভাষায় নহে,—সহজ ও সরলভাবে গাহিলেন:—

শুন, রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি॥

তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও পিতৃ মাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

যখন তিনি বলিলেন,—

"কামগন্ধ নাহি তায়,"
"তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র,
তুমি উপাসনা রস॥"

তখন যে সমাজ ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণের অধিকারভেদ স্থাপন করিয়া গর্ব্ব করিয়াছে, সে সমাজ তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল না। চণ্ডীদাসের প্রেমের আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইল, এবং শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী গানগুলিকে প্রেমের সুগভীর মন্ত্র বলিয়া বরণ করিয়া লইল। যে প্রেম চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সরল, মধুর ও গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনার ধন হইয়াছিল। আর এই জাতীয় সাধনার প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনই চণ্ডীদাসের গীতি কবিতার মত। চণ্ডীদাস যে প্রেমের কথা গাহিয়াছেন, চৈতন্যদেব নিজ জীবনে তাহা দেখাইয়াছেন :—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল-ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয় তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥

পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥”

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাঙ্গালা দেশে ইহা গানের পদ নহে,—জীবনের কথা ছিল। শুষ্ক বিজ্ঞানচর্চ্চা ও কঠোর জীবনযাত্রার দিনে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিতেছে না যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রেমের কি অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যেরূপ প্রেমের সৌন্দর্য্য ও মহত্ব বুঝিয়াছিল, অন্য কোনও জাতি তাহা বুঝিতে পারে নাই। প্রেমের সৌন্দর্য্য সাদী, হাফেজ, ওমার খায়াম কিছু বুঝিয়াছিলেন। মহম্মদীয় সুফীগণও কিছু বুঝিয়াছিলেন। লয়লামযজুনের গল্পে আমরা গভীর প্রেমের, বিশ্ববিস্মৃতি, বিরহের অনন্ত বেদনা বিশ্বপ্রকৃতির গভীর সমবেদনা কিছু পাই। লয়লা-মযজুনে গল্পের রূপকে আমরা ভগবৎ-প্রেমের সাম্যাবস্থার কিছু পরিচয় পাই। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে প্রেমের মাধুর্য্য ও মহত্বের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে।

যে সমাজ বন্ধনের দ্বারা, সমাজ-সংসারের অসংখ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বারা, ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের পথ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সেই সমাজে বৈষ্ণব-সাহিত্য সর্ব্ববাধাহীন, সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী, সর্ব্বত্যাগী, কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেমের মহিমা গান করিল। কিন্তু তাহাতে সমাজের বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যে শক্তির প্রভাবে ব্যক্তি সমাজের বন্ধন মানিতে চাহিল না, সেই শক্তিই তাহাকে পার্থিব প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করাইল, এক অনন্ত অফুরন্ত স্বর্গীয় প্রেমের নিকট তাহাকে পৌঁছাইয়া দিল। সে প্রেমে কামগন্ধ নাই; সে প্রেম “উপাসনারস”। রাধার সহিত কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, প্রত্যেক মানুষ জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার দ্বারা প্রেমময় ভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিল।

বৈষ্ণব কবিগণ রাধার কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণনার রূপক দিয়া, ভগবৎপ্রেমের বিহ্বলতা ও মাধুর্য্য গান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনেন নাই; বরং সমাজকে এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্মলোকে সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, যেখানে চিরবসন্ত, অনন্ত-প্রেম, অনন্ত যৌবন অনন্ত ভোগ, এবং—

"লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

বৈষ্ণব-সাহিত্যে নর-নারীর প্রেমের দুর্নিবার শক্তি যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, অন্য কোনও সাহিত্যে তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রেম এখানে বিপ্লবসাধন করে নাই। প্রেম এখানে ব্যক্তিকে অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য্যের রসে মুগ্ধ করিল। প্রেমের এখানেও প্রচণ্ড শক্তি, তাহা কোনও বাধা-বিঘ্ন মানে না; কিন্তু এ শক্তির ভিতর বিপ্লবের বীজ নাই, একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তি-সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের বীজ সুপ্ত আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য বাহ্যতঃ একটা ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা বিপ্লবের পরিপোষক; কিন্তু ভিতরে ইহা অত্যন্ত কঠোর সংযম ও তপস্যাকে বরণ করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য এই উপায়েই সমাজকে ভাঙ্গে নাই, একটা নূতন জীবন ও নূতন সমাজ গড়িয়াছে।

হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সাহিত্যে আমরা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের তৃতীয় স্তরের ভাবুকতা ও সমাজ-জীবনের সমন্বয় দেখিলাম। সাহিত্য-বিকাশের প্রথম স্তরের স্বাধীনতা অশান্ত ও অসংযত। দ্বিতীয় স্তরের আত্মবিশ্লেষণ ও তৃতীয় স্তরের বাস্তব ভাবের সমন্বয় হইয়াছে বলিয়াই হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের গান ভারতবর্ষের প্রাণ এত গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে; সমগ্র ভারতবর্ষে এত শীঘ্র সর্ব্বপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী ও কলঙ্কিনী

রাধার গানে যে স্বাধীনতা আছে, তাহা অন্য প্রকার লোক-সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। তাই, যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন বরণ কখনও মানে নাই, তাহার নিকট উহা এত প্রিয় বোধ হইল। তাই, অন্য প্রকার লোক-সাহিত্য হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সাহিত্যের অনেক নিম্নবর্ত্তী। কিন্তু এই স্বাধীনতার গান শেষে সাহিত্য ও সমাজের সাধনার ফলে সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতার গানে পরিণত হইল না। সমাজের নিয়ম সংযম প্রতিষ্ঠায় এই স্বাধীনতার গান পর্য্যবসিত হইল। স্বাধীনতা ও সংযমের, ভাবুকতা ও সমাজ-জীবনের একটা সমন্বয় সাধিত হইল। লোকসাহিত্যের এই দুইটী প্রধান ধারা এখনও সজীব রহিয়াছে, বাঙ্গালীর অন্তঃস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া উহাকে শীতল ও পবিত্র করিতেছে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের যে সমন্বয় ছিল, আজ-কালকার সাহিত্যে তাহা লক্ষিত হয় না। আমাদের সাহিত্যকে একটা অলীক ভাবুকতা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কল্পনার দ্বারা একটা ভাবরাজ্য গড়িতেছি; সাধনার দ্বারা বাস্তবজীবনের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারিতেছি না। আমাদের সাহিত্য ভাবরাজ্যের সহিত বাস্তবজীবনের কোনও সমন্বয়সাধন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহা সমাজকে গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই কারণেই সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইতেছে না। বস্তুতন্ত্রের অভাব দূর না হইলে আমাদের সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইবে না। আমাদের সাহিত্য একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাহিত্যে অধিকারভেদ আসিয়াছে; আভিজাত্য দোষ আসিয়াছে। জনসমাজের প্রাণ হইতে দূরে থাকিয়া আমরা শুধু বাক্যবিন্যাস ও রচনাকৌশলের উন্নতিবিধান করিতেছি

নবীন সুকবি কালিদাস রায় নীলকণ্ঠ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের লোক-সাহিত্য সম্বন্ধেও সাধারণভাবে বলা যায়,—

"নহ তুমি শিল্পিকবি,—অনুশীলনের ফল করনি সম্বল ;
অকৃত্রিম বনফুল গীতি তব, ভাব-মধু যাহে ঢল ঢল।
মাননি শাসন-রীতি, রীতি তব ছন্দঃশাস্ত্র অলঙ্কার ছাড়া,
আছে ভক্তি, আছে প্রাণ, লাবণ্য সে অনবদ্য, সর্ব্বভূষাহারা।
হিমাংশুর রাজ্ঞীগণ সম নাহি অঙ্গে ভূষণসম্ভার,
কাঙ্গাল সে ভিখারীর প্রিয়া সম আছে রূপ সতীতেজ তার।
তবুও সঙ্গীত তব কোলাহলে পল্লীপ্রান্তে যায়নাক ডুবে,
যদিও সে গীত শুধু গোপীযন্ত্রে, বাঁশী আর গাবগুবাগুবে,
পল্লীবাটে, মাঠে ঘাটে, ইক্ষুক্ষেত্রে, জেলেদের তালডিঙ্গি' পরে,
ওগো কণ্ঠ! কণ্ঠ তব শুনা যায় এক গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে।
প্রেমিক সে সাড়া দেয় মাঠ হ'তে, তব গানে, প্রেমিকারে তার ;
সন্ধ্যামুখে কৃষিজীবী ও গীত-সলিলে ধোয় কষ্ট-ক্লান্তি-ভার।
সর্ব্বভীতিহরা গীতি গায়ি, পান্থ জানায় সে গ্রামের প্রবেশ,
ভিখারী-সম্বল গান দূরিল হৃদয় হ'তে চিন্তা-চেষ্টা-লেশ।
ওগো কণ্ঠ! কণ্ঠ তুমি বঙ্গ-মার চিরমুক্ত সর্ব্ববাধাহারা—
সহজ সরল লঘু পরাণের ক্ষরে যাহে আনন্দের ধারা।
সমগ্র এ বঙ্গভূমে করিয়া রেখেছ তুমি চির-বৃন্দাবন—
"কানু বিনা গীত নাই'—কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে নন্দের নন্দন।"

কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য সম্বন্ধে কখনই বলা যায় না,—

"কণ্ঠ তুমি বঙ্গ-মার চিরমুক্ত সর্ব্ববাধাহরা—
সহজ সরল লঘু পরাণের ক্ষরে যাহে আনন্দের ধারা।"

আমাদের সাহিত্যে আর "অনবদ্য সর্ব্বভূষাহারা" লাবণ্য নাই।

আমরা সাহিত্যে Art for Art's sake তত্ত্বে মাতিয়া আছি। আর্টের চরম আদর্শ আমরা এখনও সাহিত্যে আনিতে পারি নাই। Tolstoyর বিখ্যাত আর্টবিষয়ক গ্রন্থে সেই আদর্শের ব্যাখ্যা আছে। সেই আদর্শ কি? আর্ট যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত করে। যুগধর্ম্ম যেরূপ প্রত্যেক লোকেরই পালনীয়, যুগধর্ম্ম যেরূপ একজন ব্যক্তির নহে, কোনও যুগের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহা গ্রাহ্য,—সেইরূপ আর্টও সার্ব্বজনীন; কোনও বিশিষ্ট দল বা সম্প্রদায়ের জন্য নহে। Lowell কৃষক-কবি Burns সম্বন্ধে কবিতায় বলিয়াছেন,—

All that hath been majestical
In life or death, since time began
Is native in the simple heart of all
The angel heart of man.

মহনীয় ভাবগুলি সকল হৃদয়কে সমানভাবে আকর্ষণ করে। কেবলমাত্র দুই এক জন চিন্তাশীল ব্যক্তির বোধগম্য রচনা অপেক্ষা, যে রচনা খুব সরল ও সহজ, যাহা প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাহাই ভাল।

It may be glorious to write
Thoughts that shall glad the two or three
High Souls, like those far stars that came in sight
Once in a century
But better far it is * * *
* * * * *

To write same earnest verse or time
Which seeking not the praise of art,
Shall make a clearer faith and manhood shine
In the untutored heart.

Lowell বলিয়াছেন, যে লেখক সকল হৃদয়কে স্পর্শ করেন, তিনি artist না হইতে পারেন, কিন্তু তিনিই চিরসম্মাননীয় থাকিবেন। Tolstoy বলিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত artist তাঁহারই হাতে আর্টের চরম সার্থকতা। একজন artist বড় কি ছোট, তাহার বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, তিনি খুব মহনীয় ভাবগুলি সকলেরই বোধগম্য করিতে পারিয়াছেন কি না; তাঁহার ভাবগুলি দেশের জনসাধারণের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে কি না। তাঁহার art সার্ব্বজনীন কি না।—

Tolstoy maintains that it is just the immensely difficult task of carrying high messages of art to the common man—that is the supreme test of an artist's capacity to render mighty service to humanity.

আমরা এখনও এ আদর্শকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখি নাই। আমরা এখন সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছি। সাহিত্য যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে কি না, সমাজের উপর সাহিত্যে কিরূপ প্রভাব, তাহা আমরা দেখিতেছি না। তাই আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দলাদলি। এক সাহিত্য এক দলের, আর এক সাহিত্য আর এক দলের হইয়াছে। আসল সাহিত্য যে কোনও দল বিশেষের নহে, কোনও দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই যে আর্ট সমানভাবে সেই যুগের উপযোগী কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত করিয়া দেয়, তাহা আমরা ভুলিয়াছি। সেই জন্য সাহিত্যচর্চ্চা এখন সাধনার নহে, বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। সাহিত্য আধ-ঘুমন্ত

আবছায়া, আয়াসে ও অলঙ্কার ভারে আলুলায়িত, প্রস্ফুট, প্রখর, সুতীক্ষ্ণ নহে। অধ্যাপক Rudolf Eucken তাঁহার বিখ্যাত 'Main currents of modern thought' গ্রন্থে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন,—যেখানে আর্টচর্চ্চায় এইরূপ একটা কর্ত্তব্যবোধ না লক্ষিত হয়, সে আর্ট বাহিরের অলঙ্কারের ভারে পঙ্গু হইয়া যায়।

An art devoted preponderatingly to form easily becomes a mere matter of professional dexterity, the first concern of which is to display (to itself if not to others) its own skill. This gives rise to a predilection for the eccentric, paradoxical, and exaggerated and, in seeking after effects of this kind, the promised freedom only too easily becomes merely another kind of dependence of the artist upon others and upon his own moods. Genuine independence is to be found only when the creation work proceeds from an inner necessity of the artist's own notion. But this cannot take place unless there is something to say, nay something to reveal.

আমাদের সাহিত্যের প্রাণ জ্ঞান ও সাধনা নহে, বিদ্যা ও বুদ্ধি হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে রচনাকৌশল, বাক্যবিন্যাস, ছন্দঃশাস্ত্র, অলঙ্কার আছে, মহনীয় ভাব ও সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে না। আমাদের সাহিত্যে এখন অনুকরণের স্রোত খুব প্রবল। সাধনার ফলে কেহই একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাব-রাজ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতেই সকলে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বস্তুতন্ত্রহীনতার অভাব জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকৃতভাবে দেশের যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে ঐতিহাসিক নাটকের শরণাপন্ন হইতে হয়,—প্রতাপাদিত্য, শাহাজাহান, মেবার-পতন, ভীষ্ম, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি নাটকের শরণাপন্ন হইতে হয়; অথবা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের শোণিত তর্পণের মধ্যে ঢুকিতে হয়, বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবন হইতে সাহিত্য realism খুঁজিয়া পায় না। আমাদের অনেকগুলি সুন্দর সামাজিক নাটক আছে সত্য, কিন্তু সমগ্র দেশ বা সমাজের যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত তাহাতে পাওয়া যায় না; তাহাতে গৃহধর্ম্ম, পরিবার-ধর্ম্ম ও জাতি ধর্ম্মের দুই একটি সমস্যা পূরণের চেষ্টা হইয়াছে মাত্র উপন্যাস-ক্ষেত্রেও তাহাই। হিন্দু. ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃষ্টান, পার্শী ও মুসলমানের যুগধর্ম্ম নাটক উপন্যাসে ব্যক্ত হয় নাই। ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা নাটক উপন্যাসে এখনও পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও "অচলায়তনে" আমরা কেবল সূচনা দেখিয়াছি। যৌবন-আবেগকে আশ্রয় করিয়া স্নেহের ও প্রেমের গভীর তত্ত্ব সাহিত্য ফুটাইয়াছে সত্য,—কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের মহনীয় ভাব ও চিরন্তন সমস্যার ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি না।

সাহিত্যে এখন নূতন .আদর্শের প্রচার করিতে হইবে। Art for Art's sake সূত্র এখন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সাহিত্যে এখন রচনাকৌশল, বাক্যবিন্যাস ওস্তাদির চরম হইয়াছে। সাহিত্যের শরীরে আর অলঙ্কার চাপাইলে, অলঙ্কার বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। হিন্দু ত চিরকালই রূপক ছাড়িয়া ভাবের সাধনা করিয়াছে; রূপসাগরে ডুব দিয়াও অরূপ রতনকে খুঁজিয়াছে; তবে সাহিত্যে কেন রূপের সমাদর থাকিবে? সাহিত্যে এখন ভাবের আদর বাড়াইতে হইবে।

এখন নূতন সাধনা, নূতন ভাব চাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবগুলি পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কাব্যে এখন আমাদের অরুচি হইয়াছে। কাব্য এখন একঘেয়ে হইয়াছে; কাব্যের আর প্রাণ নাই। কাব্যে কালোপযোগী ভাব নাই। এখন নূতন সাধনার ফলে যুগোপযোগী নূতন ভাব-আবিষ্কারের প্রয়োজন। কাব্য ও সাহিত্যকে নূতন প্রাণ দিতে হইলে আধুনিক সমাজের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার আলোচনা করিতে হইবে,—ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের আদর্শকে লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যার দ্বারা নহে, পরানুকরণের দ্বারা নহে, আপনার নিজের সাধনার দ্বারা যুগধর্ম্ম কল্পনা, অনুভব ও ব্যক্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে কাব্য ও সাহিত্য পুনর্জ্জীবিত হইবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যে যুগধর্ম্মের উপযোগী দরিদ্র-জনসাধারণই চিন্তার কেন্দ্র হইবে। জনসাধারণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমাদের সাহিত্য নূতন জীবন লাভ করিবে। আমরা দেশে এখন কৃষকের স্থান ও অধিকার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি;—এতদিন পরে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পরানুকরণের ফলে দুর্ব্বল হইয়াছে। কৃষকগণের মধ্যে হিন্দুজাতির মহাপ্রাণ আজিও জাগ্রত রহিয়াছে। পরানুকরণ স্পৃহা তাহাদিগকে এখনও নির্জীব করে নাই। হিন্দুজাতি, হিন্দু-জনসাধারণ, হিন্দু কৃষকগণের মধ্যেই জীবিত রহিয়াছে; তাই হিন্দু-জনসাধারণ, হিন্দু কৃষকগণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ হইতেই তাহার নূতন জীবন ও নূতন শক্তি গ্রহণ করিবে। নিখিল-আশা-আকাঙ্ক্ষাময় কৃষক-জীবন হইতে যখন সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার হইবে, তখন তাহার বস্তুতন্ত্রের অভাবদোষ দূর হইবে। কৃষকের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ বুঝিতে আরম্ভ করিলে সাহিত্যে খাঁটী ও সুন্দর realism আসিবে; সাহিত্য

তখন একটা নূতন তেজ ও শক্তির পরিচয় পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিব,—

নিখিল-আশা-আকাঙ্খাময়
দুঃখে সুখে
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গপাত
ধরব বুকে।
মন্দ ভালোর আঘাত-বেগে
তোমার বুকে উঠব জেগে,
শুন্‌ব বাণী বিশ্বজনের
কলরবে,
প্রাণের পথে বাহির হতে
পার্‌ব কবে ?

আমাদের সাহিত্যে এখন অলীক ভাবুকতার আর প্রয়োজন নাই। ভাবুকতার চরম হইয়াছে; এখন ভাবুকতাকে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে।

রুশ সমালোচক Blienski রুশ সাহিত্যিকগণকে অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন। Romance খুব হইয়াছে,—The elements of a new romantic art shall be found in the life of the masses. Blienskiর পর রুশ-সাহিত্যে যুগান্তর আসিয়াছিল। আমরা Blienskiর পরবর্ত্তী রুশ-সাহিত্যের ধারা ও সমাজের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমাদের সাহিত্যিকগণকে এখন সেই একই কথা শুনাইতে হইবে। আমাদের সমাজে আমরা এখন কৃষক-সমাজের স্থান ও অধিকার বেশ অনুভব করিয়াছি; তাহারই ফলে দেশে পল্লীপরিষৎ-গঠন, পল্লীসেবা,

পল্লী-সংস্কারের আয়োজন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, নৈশ-বিদ্যালয়-স্থাপন প্রভৃতি দেখিতেছি। কিন্তু সাহিত্যে এই নবজাগ্রত জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা এখনও প্রকাশ পায় নাই। গীতিকাব্যে আমরা দেবতাকে দীন-দরিদ্র কৃষকের সাজে দেখিয়াছি,—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
ক'রছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার পরে।

"কিন্তু তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধূলার পরে"—এ আহ্বান এখনও সাহিত্যে শুনা যায় নাই। আমাদের সাহিত্য এখনও ধনী ও শিক্ষিত লইয়াই রহিয়াছে। আমাদের সাহিত্য এখনও "একলা ঘরের আড়াল ভাঙ্গিয়া" হাটের পথে বাহির হয় নাই।

রুশ-সাহিত্য Dostoeiveski ও Tolstoyর সাধনার ভিতর দিয়া প্রবল প্রেমে হাটের পথে বাহির হইয়াছে। Dostoeiveski ও Gorkyর পাপী, তাপী দরিদ্রের পূজায়, তাঁহাদের Religion of human sufferingএ; রিক্তভূষণ Tolstoyর অধম দীনদরিদ্রের জন্য সাহিত্যসেবায়, তাঁহার আর্টবিষয়ক আলোচনায়, আন্দ্রিভের সহজ, প্রস্ফুট ভাবুকতায় আমরা সাহিত্যকে অপমান নির্য্যাতন মাথায় রাখিয়া দীন-হীন পতিতের ভগবানকে পূজা করিবার জন্য ধূলায় নামিতে দেখিয়াছি।

আমাদের সমাজে দরিদ্রনারায়ণের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। The religion of human suffering-এর মর্ম্ম আমরা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, নর-নারায়ণ-পূজা আমাদের নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য এখনও সহজ ও সরল প্রেমে অধম ও পতিতকে আলিঙ্গন করে নাই। বীণা, বেণু, মাতলী ও মল্লিকা ফুলের ডালি আমাদের সাহিত্য ছাড়িতে পারে নাই। বস্ত্র ছিঁড়িবে, অলঙ্কার হারাইবে, ধূলা বালি লাগিবে এই ভয়ে আমাদের সাহিত্য রাস্তায় বাহির হয় নাই, ঘরের ভিতর দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া আছে। বাহিরের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের আলাপ হইতেছে না; তাই তাহার realism এর অভাব দূর হইতেছে না; তাই তাহা এখনও শুধু কল্পনার সামগ্রী রহিয়াছে। এখন সাহিত্যকে অন্ধকার ঘর ছাড়িয়া বৈশাখের রৌদ্রে রাস্তার কুলী মজুরের সঙ্গে বাহির হইতে হইবে। পূর্ণিমা-নিশি ও মায়া-কুহেলিকার মোহ দূর করিতে হইবে। ফুল, মালা, অলঙ্কার এখন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অলঙ্কার ভারাবনতা কুলবধূর সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন কৃষক-বধূর প্রয়োজন নাই, সাহিত্য কৃষক-বধূর মত একরত্তি রাঙা সূতা হাতে বাঁধিয়া আট গাছা মল বাজাইয়া গৃহাঙ্গনে, মাঠে, ঘাটে হৃদয় কাড়িয়া লইবে। কৃষক-বধূর মত রাস্তার ধূলা, মাঠের কাদা, মাথার ঘাম এখন সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। শুভ্র পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ছাড়িয়া সাহিত্যকে কৃষক-বধূর অপরিচ্ছন্ন অল্প বস্ত্রে সাজিতে হইবে। কৃষকের নিখিল দুঃখ দারিদ্র্যের বোঝা বুকে করিয়া, কৃষক-বধূর সহিত নীরবে নির্ব্বিবাদে ক্লান্তিবিহীন কাজের মধ্যে প্রভাত-কুসুমের ঘ্রাণ লইয়া, সন্ধ্যার পাখীর গান শুনিয়া সাহিত্যকে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। সাহিত্য রাজার বেশ না ছাড়িলে, রাখাল-বেশ না পরিলে, কুলী-মজুর কৃষকের

সঙ্গে পথের মাঝে, রৌদ্র, বায়ু, ধূলা কাদায় না ছুটিলে কখনও প্রাণ পাইবে না; সতেজ, সবল, সুস্থ হইবে না; খেলা ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে না—

"যেথায় বিশ্বজনের মেলা
সমস্ত দিন নানান খেলা
চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,—
সেথায় সে যে পায় না অধিকার,
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণি-রতন-হার।
খেলা ধুলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে
বসন ভূষণ হয় যে বিষম ভার।"

সাহিত্যে জনসাধারণের বাণী

রুশ ও জার্ম্মান সাহিত্য

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সাহিত্যজগতে যে যুগান্তর,—যে বাস্তব জীবনে অপ্রীতি, নবজীবনের আকাঙ্ক্ষা, অতীন্দ্রিয়ের প্রতি ভক্তি আনিয়াছিল, তাহা বিভিন্ন সমাজকে একই ভাবে আন্দোলিত করে নাই। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই একটা নূতন প্রকার ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে Byron, Shelley প্রভৃতি একটা নূতন জগৎ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার সহিত বাস্তবজীবনের কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। ইংরাজ কবিগণ আপনাদের কল্পনার সংসারে, দৈনন্দিন জীবন হইতে বহুদূরে সরিয়া থাকিলেন; নিজের মনগড়া জগৎ—একটা Utopia—সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন। জার্ম্মান সাহিত্যে Romanticismএর সহিত বাস্তবজীবনের একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। Goethe ও Schiller শেষ বয়সে যে Classicismএর দিকে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তাহার প্রতিরোধ হইল। জার্ম্মানীতে Weimarism সমগ্র সাহিত্যকে গ্রাস করিতে পারে নাই; বরং বিপরীত দিকেই স্রোত ফিরিল। এক্ষণে জার্ম্মান সাহিত্যে ভাবুকতার চরম আছে; কিন্তু সে ভাবুকতা সমাজ-বিমুখ নহে,—জাতির দৈনন্দিন অভাবনিচয়, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, সে ভাবুকতা যথোচিত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। এ কারণে জার্ম্মান-সাহিত্য জাতীয়-জীবনকে এমন সুন্দরভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইংরাজী সাহিত্য তাহা করিতে পারে নাই।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব প্রসূত সাহিত্যের ভাবুকতা যে বাস্তবজীবনের কাজে অতি সুন্দরভাবে লাগিয়াছে তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, আধুনিক রুশ-সাহিত্যের ক্রমোন্নতি হইতে পাওয়া যায়। জার্ম্মান সাহিত্য ৪০ বৎসর মধ্যে হঠাৎ জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথমে—অশান্তি ও বিপ্লববাদ,—বর্ত্তমানের সমস্ত অসম্পূর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়তঃ—আত্মচিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ, আত্মকেন্দ্রতা, এবং অবশেষে আত্মসর্ব্বস্বতা, আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যমিথ্যা, সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য, ভালমন্দ বিচার করা—বর্ত্তমান সমাজের সমস্ত মাপকাটি পরিত্যাগ করিয়া একটা Utopia সৃষ্টি করা। তৃতীয়তঃ—একটা অলীক ভাব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ভাব-জগতের সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা, ভাবুকতাকে বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। ফরাসী-বিপ্লবের পর ইউরোপে প্রত্যেক দেশেই সাহিত্য উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। জার্ম্মান-সাহিত্যে এই উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীণভাবে লক্ষিত হয়। Herder ও Burger এর সাহিত্যে, Goethe'র Werther এ, ও Schiller এর, Robbers এ, Sturm und drung এর সাহিত্যে, আমরা অশান্তি ও বিপ্লববাদ, আত্মচিন্তা ও আত্মকেন্দ্রতার পরিচয় পাই; শেষে Goethe ও Schiller এর শেষবয়সের কাব্যনাট্যে Novalis ও Eichendroff, Richter ও Heine এর সাহিত্যে আমরা ভাবুকতার চরম দেখিতে পাই; অথচ সেই ভাবুকতা সমাজবিমুখ নহে, বরং বর্ত্তমান বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের দৈন্য-নিবারণ তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। কিন্তু এই উন্নতির সময় লাগিয়াছিল—মাত্র চল্লিশ বৎসর।

আমরা রুশ-সাহিত্যকে ঐ পন্থাই অবলম্বন করিতে দেখিব,—ঐ

তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে দেখিব; কিন্তু জার্ম্মান-সাহিত্যকে এক পুরুষেই যেমন উচ্চতম সোপান অতিক্রম করিতে দেখিতে পাই, রুশ-সাহিত্যকে তাহা দেখি না। রুশ-সাহিত্য ধীরপাদক্ষেপে উন্নতিলাভ করিয়াছে,—প্রায় ৭৫ বৎসর ব্যাপিয়া এই ক্রমবিকাশ ও উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং উন্নতির স্তরগুলি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যের প্রথম যুগ—
অশান্তি ও বিপ্লববাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশিয়ায় Catherineএর ভক্তগণের মধ্যে সাহিত্যালোচনা আবদ্ধ ছিল। ফরাসী-সাহিত্যের আদর্শই রুশ-সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। Voltaire তখন সাহিত্য-জগতে একচ্ছত্র নরপতি; সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া তাঁহার রাজত্ব ছিল। রুশ-সাহিত্যও Voltaireকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর যখন Alexander I সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন রুশিয়ায় নবজীবনের সূচনা হইল। ঐতিহাসিক Karamsin এক বিপুল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়া Alexander I কে উপহার দিলেন। রুশিয়ায় জাতীয়তার সেই সূত্রপাত হইল। Karamsin রুশিয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া রুশ-সমাজে জাতীয়তার স্রোত প্রবাহিত করিলেন। সেই স্রোতই শেষে Muscovite, Panslavistগণ দ্রুতগতিতে সমগ্র রুশ-সমাজে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। আর একদিক হইতে ফরাসী-আদর্শের গৌরব ক্ষীণ হইতে লাগিল। Joukovsky রুশ-সাহিত্যে Goethe ও Schillerএর আদর্শ আনিলেন। Pushkin ও Lermentoff, Byronএর আদর্শ সাহিত্যে প্রচার করিলেন।

Voltaireএর সাহিত্যের—ফরাসী সাহিত্যের Classicismএর—

অনুকরণের স্রোত হইতে ইঁহারা রুশ-সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। বিশেষতঃ Pushkin রুশ লিখিত-ভাষাকে মার্জ্জিত করিলেন, একটা নূতন রচনাপ্রণালীর সৃষ্টি করিলেন; তবুও তাঁহার সাহিত্য বিদেশী ভাবেই অনুপ্রাণিত ছিল। Pushkinএর মত, Lermentoffও Childe Haroldএর আদর্শে তাঁহার কবিতা ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। Byronএর বিপ্লববাদ, অশান্তি, বর্ত্তমানের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার আকাঙ্ক্ষা, একটা অসহ্য যন্ত্রণাবেদনার অনুভূতি Pushkin অপেক্ষা Lermentoffএ অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। Lermentoffএর A hero of our time উপন্যাসে আমরা Byron এর আবেগ, জ্বালা, ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাই, প্রণয়ের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা পাই, সমাজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাই, প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ সুন্দর ভাবে পাই।

Pushkin ও Lermentoff সাহিত্যে যে স্রোত আনিয়াছিলেন, রুশিয়ার অনেক সাহিত্যিকই সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। আমরা রুশ-সাহিত্যে Romanticismএর প্রথম সোপান দেখিলাম। অশান্তি, ব্যাকুলতা, সমাজের বন্ধন ছিঁড়িবার আকাঙ্ক্ষা,—বিপ্লববাদের চরম পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সোপানের আত্মকেন্দ্রতা, আত্মসর্ব্বস্বতাও পাইলাম। সাহিত্য সমাজের দোষগুলি প্রকাশ করিয়া—একটা গভীর নিরাশা, একটা তীব্র যাতনা আনিয়াছিল; নবজীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেক সমাজ যে বেদনা ও অশান্তি, যে Sturm und drung অনুভব করে, তাহা রুশিয়ার সমাজ অনুভব করিল।

ব্লায়েনস্কি প্রবর্ত্তিত নব্য-সাহিত্য

তাহার পর সাহিত্যক্ষেত্রের একজন নবীন ও জ্ঞানী সমালোচক আবির্ভূত হইলেন। ইনিই রুশ-সাহিত্যের ভবিষ্যগতি নির্ণয় করিয়া

দিলেন। তিনি বলিলেন, উদ্দাম ভাবুকতা, চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতার আর প্রয়োজন নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা, এখন সমাজের উন্নতির অন্তরায় হইতেছে। এখন সমাজ, সাহিত্যের নিকট আরও বেশী কিছু দাবী করিতেছে। লোকে এখন কাব্য বুঝিতেছে না, অথবা কাব্য চাহিতেছে না। এখন নূতন প্রকার কিছু চাই; ভাবজগতের সৌন্দর্য্য, সমাজের পিপাসা মিটাইতে পারিতেছে না। তিনি প্রচার করিলেন, এখন সাহিত্যে আর "কাব্যির" আবশ্যক নাই। এখন চাই সাহিত্য শুধু মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, অভাব ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করুক; যে সব মানুষ এ জগতের বাহিরে, তাহাদের ভাব ও চিন্তা লইয়া একটা অলীক জগৎ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই। বাস্তব-জীবনে মনুষ্যের বৃত্তি ও অভাবনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সাহিত্যে যে একটা মিথ্যা ও অলীক ভাবুকতা প্রশ্রয় পাইতেছিল, তাহা দূর হইবে; সাহিত্য তখন সবল, সতেজ হইবে,—সাহিত্যের স্নায়ুদৌর্ব্বলতা দূর হইবে। সাহিত্য তখন সমাজ হইতে জীবনী-শক্তি লাভ করিবে, সমাজকেও নূতন জীবন দান করিতে পারিবে।

সমালোচক Blienski একটা নূতন প্রকার সাহিত্য চাহিয়াছিলেন। সাহিত্যে তিনি এক নূতন সুরের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণকে তিনি এক নূতন কর্ত্তব্যের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

তাঁহার আহ্বান ব্যর্থ হয় না। Lermentoff যখন তাঁহার শেষ-কবিতাগুলি প্রকাশিত করিলেন, Gogol তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত করিলেন। সমালোচক Blienskiর তীক্ষ্ণদৃষ্টি Gogolএর প্রতিভা বুঝিতে পারিয়াছিল। Blienski কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া Gogol দৈনন্দিন জীবন—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রজীবন সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। Blienskiর আশা পূর্ণ

হইল। Blienski তখনকার রুশ-সাহিত্যের কি প্রয়োজন, তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি সমালোচক ছিলেন মাত্র, কবি বা ঔপন্যাসিক ছিলেন না; কিন্তু তিনি রুশ-সাহিত্য-জগতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে রুশ-সাহিত্য নব-জীবন লাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যে দ্বিতীয় যুগ।

Romanticismএর ফলে যে ভাবুকতা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা এতকাল পরে বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাস্তব ও অতীন্দ্রিয়,—Realism ও Romanceএর সমন্বয় সাধিত হইল। Romanticism সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা সাহিত্যের বিকাশের যাহাকে তৃতীয় স্তর বলিয়াছিলাম, রুশ-সাহিত্য Gogolএর উপন্যাস প্রকাশের সহিত সেই স্তরে উপস্থিত হইল; সাহিত্যের ভাবুকতা সমাজের প্রাণসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল।

Gogolএর উপন্যাস সমূহে, The Mantle, Dead Souls প্রভৃতিতে এবং তাঁহার প্রহসন The Inspector Generalএ রুশিয়াবাসী তাহার নিজের চিত্র দেখিতে পাইল,—সে দেখিল, লঘুজীবন শাসনকর্ত্তাদিগের অসংখ্য, ছোট বড় অত্যাচার নির্যাতন, তাহাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা, কেরাণী-চাকুরেদিগের কাপুরুষতা, শঠতা, ঘুস লইবার প্রবৃত্তি; আর দেখিল, অসংখ্য Serfদিগের অসহায় নিরুপায় অবস্থা—তাহাদের দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা ও ক্লেশ। রুশ-সমাজ Gogolএর সাহিত্যে নিজের চিত্র স্পষ্টভাবে দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল,—"My countrymen looked at my play in terror." Gogolএর কল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল; মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদিগের তিনি অসংখ্য চিত্র আঁকিয়াছিলেন, এবং সব চিত্রে তিনি একটা জীবনী-শক্তি দান

করিতে পারিয়াছিলেন। দীনদরিদ্র নির্যাতিতদের প্রতি তাঁহার ভাল-বাসা ও সহানুভূতি বিশেষ লক্ষিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "The national characteristic of the Russian is his pity for the fallen." তাঁহার উপন্যাসেও তাঁহার ঐ গুণই বিশেষ প্রকাশিত হয়, এবং এই গুণের দ্বারাই তিনি যাহারা সমাজে নগণ্য, সমাজে যাহাদের কোন স্থান বা অধিকার নাই, তাহাদিগকে অত্যুজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; দারিদ্রের মধ্যে সম্মানার্হ গুণসমূহের বিকাশ দেখাইয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It is my peculiar power to display the triviality of life, to share all the dullness of the mediocre type of man, to make perceptible the infinitely unimportant class of persons who could otherwise not be seen at all. That is my special gift". এই সব গুণ তাঁহার ছিল বলিয়া রুশিয়ায় তাঁহার এরূপ প্রভাব। একজন অনুবর্ত্তী ঔপন্যাসিক লিখিয়াছিলেন, "We have all come forth from the mantle of Gogol." বাস্তবিক Gogolএর অঙ্কিত চরিত্রগুলি সাহিত্যজগতে কেন—সমগ্রসমাজেই চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। Gogol এর Ichitchkoff মৃত Serfগণকে ক্রয় করিয়া registerএ তাহাদের নাম লিখিয়া তাহাদের স্বত্বে যে টাকা ধার করিতেছে,—সে কথা রুশ এখনও ভুলিতে পারে নাই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সমালোচক Blienski প্রচার করিয়া ছিলেন, রুশ-সাহিত্যে Romanticismএর দিন গিয়াছে; এখন সাহিত্যে অলীক ভাবুকতার প্রয়োজন নাই, বাস্তবজীবনের ভিত্তির উপর সাহিত্যের গোড়া পত্তন করিতে হইবে, এবং তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, রুশিয়ায় যে নূতন সাহিত্য সৃষ্ট হইবে, তাহা জনসাধারণের অভাব, অভিযোগ,

তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ হইতেই জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিবে—"The elements of a new art shall be found in the life of the masses." তাহাই হইল। Blienski পথপ্রদর্শক, Gogol ঐ নূতন পথের প্রথম পথিক। রুশ-সাহিত্য ঐ পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পথের ধারে পতিত পদদলিত নির্যাতিত দীনদরিদ্রকে সাহিত্য আপনার কোমল ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ায় বিপ্লবপন্থী ও সমাজ-তন্ত্রবাদীদের আন্দোলন সম্রাট্ Nicholasএর কঠোর শাসনে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক আলোচনা নাট্যমঞ্চে বা সংবাদপত্রে প্রকাশ সবই অসম্ভব হইল। তখন হইতে রুশ-সাহিত্যের সমস্ত শক্তি উপন্যাসেই প্রয়োজিত হইতে লাগিল। উপন্যাস একই সঙ্গে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার কাজ করিতে লাগিল, রুশিয়ার সমগ্র জাতীয় শক্তি ও সাধনা উপন্যাসের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাহিত্যের অন্য অঙ্গগুলি রাষ্ট্রের শাসনে অবশ হইয়া পড়িল। সমস্ত শক্তি এক সঙ্গেই পুঞ্জীভূত হইল, তাই তাহা অত সতেজ, সবল হইল। শিক্ষিত রুশের সমস্ত প্রতিভা আসিয়া রুশ-উপন্যাসকে অসীম শক্তি সম্পন্ন করিয়া তুলিল।

এ কথা ভুলিয়া যাইলে আমরা রুশ-জাতীয়-জীবনের উপর রুশ-উপন্যাসের প্রভাবের কারণ কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। এ কথা না জানিলে, রুশ-উপন্যাসের সমাজ-গঠন-শক্তি আমরা কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিব না।

যাহা হউক Blienski যে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, Gogol যে পথে চলিয়াছিলেন,—পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণ সেই পথই অনুসরণ করিলেন।

আমরা এইবার ইহাদিগের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

Gogolএর অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, Turgenieff. তাঁহার প্রথম পুস্তক, "Sportsman's Sketches" ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের পরই প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে রুশিয়ার প্রধান সমস্যা Serfদিগকে স্বাধীনতা-দান। Turgenieff তাঁহার ছোট ছোট কৃষকজীবনের চিত্র আঁকিয়া রুশ-কৃষকের অবস্থা দেখাইলেন;—Serfগণের দারিদ্র্য, তাহাদের অসহায় অবস্থা, তাহাদের হৃদয়ের ঘোর অন্ধকার সমাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। Serfগণের নিরাশা, তাহাদের অন্তঃকরণের হীনতা ও পশুভাবের কারণও, তিনি ইঙ্গিত করিলেন। সমগ্র রুশিয়া Turgenieffএর চিত্রে তাহার দাসত্ব ও দাসসুলভ দুর্ব্বলতা দেখিয়া ভয় পাইল; ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল;—Turgenieff এক মুহূর্ত্তেই প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উপন্যাস লেখা সার্থক হইল। রুশ-সমাজ দাসগণকে স্বাধীনতা-দান করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। Turgenieffএর পূর্ব্বে সমালোচক Blienski এবং Griboedoff ও Grigovovich প্রভৃতি লেখক দাসদিগকে স্বাধীনতাদানের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু Turgenieffএর লেখনীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে সমাজের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল।

ইউরোপে তাঁহার ক্ষুদ্র গল্পগুলি খুব বিখ্যাত হইয়াছিল। M. Taine তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'No one, since the Greeks, had cut a literary cameo in such bold relief, and in such rigourous perfection of form'. তাঁহার মৃত্যুর পর, ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত Atheneam পত্রে তাঁহার পুস্তকগুলি সমালোচনার সময়ে

লিখিত হইয়াছিল, "Europe has been unanimous in according to Turgenieff the first rank in contemporary literature."

কিন্তু নিজের দেশে শেষ বয়সে Turgenieff সম্মান হারাইয়াছিলেন। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া, দেশের লোককে অগ্রাহ্য করিলেন, রুশ তাহা ভাবিল। তিনি ফরাসী রচনা-প্রণালীর আদর্শ সাহিত্যে অনুকরণ করিলেন, ফ্রান্সে বহুকাল বাস করিলেন, স্বদেশকে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন,—রুশ ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। তিনি তাঁহার উপন্যাসে রুশ-স্বদেশ-প্রীতিকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, রুশ তাহা ভুলে নাই। Turgenieff যে নিজে একজন স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু তিনি যখন স্বদেশভক্তের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন,—স্বদেশভক্ত বিপদে পড়িলে একবারে ভীরু কাপুরুষ হইয়া দাঁড়ায়, অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অলস হইয়া পড়ে,—যখন তিনি দেখাইলেন, স্বদেশভক্তের বিষয়বুদ্ধির অত্যন্ত অভাব,—তখন রুশজাতি, Turgenieff যে তাঁহার দোষ-সংশোধন করিতে চাহিতেছে, তাহা না বুঝিয়া, তাঁহাকে স্বদেশ-দ্রোহী ভাবিল। রুশের পক্ষে Turgenieff এর একটী দোষ ছিল, যাহা একেবারেই অমার্জ্জনীয়।

স্লাভোফাইলগণের আন্দোলন

রুশিয়ায় তখন একদল সাহিত্যিক জাতীয়তার পুষ্টি-সাধন করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের দলের নাম, Slavophiles. Turgenieff সে দলভুক্ত ছিলেন না বরং ঐ দলকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। তিনি ঐ সাহিত্যিকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "the Russia-leather school of literature"—তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতিকে বিদ্রূপ করিয়া

বলিতেন—"In Russia two and two make four, and make four with greater boldness than elsewhere."—এ অপমান রুশগণ সহ্য করিতে পারে নাই; তাই তিনি যখন মাঝে মাঝে St. Petersburg অথবা Moscow যাইতেন, তখন সেখানকার যুবক-সম্প্রদায় তাঁহাকে পূর্ব্বের মত অভ্যর্থনা করিত না। ইহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। যৌবনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইত; বৃদ্ধবয়সে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিকগণ Tolstoi ও Dostoievsky একচেটিয়া সম্মান লাভ করিতেছেন;—ইহা সহিতে না পারিয়া, তিনি শেষজীবন Parisএ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অদৃষ্টক্রমে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি Despair নামে একখানি পুস্তক রচনা করিতেছিলেন;—তাহাতেই তাঁহার রুশ-চরিত্র সম্বন্ধে শেষকথা লিখিত হইল।

রুশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, জাতীয়তার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারিলেন না বলিয়া, রুশজাতি তাঁহাকে শেষ বয়সে সম্মান করিল না।

স্লাভোফাইলগণের জাতীয় সাহিত্য

আমরা রুশিয়ার এই নবজাগ্রত জাতীয়সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যখন নেপোলিয়ানের সমগ্র ইউরোপব্যাপী সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইল, তখনই ইউরোপে জাতীয়তার অভ্যুত্থান। প্রত্যেক দেশই তখন তাহার নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিল,—তাহার অতীত ইতিহাসকে বিভিন্ন চক্ষে অত্যুজ্জ্বল রঙ্গীণ করিয়া দেখিতে লাগিল,—তাহার রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার পূজা করিতে লাগিল। লোকসাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্কলন আরম্ভ হইল। সমাজের সমস্ত অঙ্গের ভিতরই জাতীয়তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় শিল্প-

ব্যবসায়, জাতীয় আচারপদ্ধতি তখন হইতে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল; স্বদেশপ্রেমে প্রত্যেক সমাজ মাতোয়ারা হইয়া উঠিল।

ইউরোপে যে জাতীয়তার স্রোত বহিতেছিল, তাহা Slavophileগণ রুশসমাজে আনয়ন করিলেন। Slavophileগণের মধ্যে সকলেই জার্ম্মানীর জাতীয়তার আন্দোলনপ্রসূত Hegelএর বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাস দর্শন পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। Hegel বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রত্যেক জাতি এক এক যুগে নিজ নিজ সাধনার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। এইরূপেই বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানব ভগবানের বিভিন্নরূপ উপলব্ধি করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে। এক যুগে যখন কোন জাতি Weltgeistকে আপনার বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়, তখন বিশ্বজগতে সেইই ত ভাগ্যবান, তখন জগতের সেই যুগে অন্য সমস্ত জাতির পক্ষে তাহাকে অনুকরণ করা ভিন্ন অপর কোন কর্ত্তব্য নাই। জগতের ইতিহাস সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া Hegel তাঁহার এই তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচ্যজগতে Babylonia, Persia প্রভৃতি সাম্রাজ্য সর্ব্বপ্রথম Weltgeist উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। তাহার পর Greece; তাহার পর Rome; সব শেষ টিউটন্‌-জার্ম্মান জাতি। Hegel ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন নাই;—Weltgeistএর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্ব্বশেষ অভিব্যক্তি হইয়াছে, টিউটন-জার্ম্মান জাতির সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে। রুশিয়ার Slavophileগণ Hegelএর সমস্তই গ্রহণ করিল; কিন্তু তাঁহারা এক বিষয়ে Hegelকে অত্যন্ত অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিল। Hegelএর ইতিহাস-বিজ্ঞানে Slavজাতির নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই। Slavজাতির কি পৃথিবীকে কিছু দিবার নাই? Slavজাতি কি বিশ্বমানবের নিকট চিরকালই ঋণী হইয়া থাকিবে? বিশ্ব-

মানবের জন্ম Slavজাতি কখনো কি কোন মহা সত্য আবিষ্কার ও উপলব্ধি করিতে পারিবে না?—এই সকল প্রশ্ন তাহাদের মনে স্বতঃই উপস্থিত হইল। উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে হইল,—কি?—যে Slavজাতি তুরস্ককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইউরোপকে রক্ষা করিয়াছে এবং Byzantine সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছে, তাহার জীবন কি বৃথায় যাইবে? যে Slavজাতি নেপোলিয়নের পদদলিত ইউরোপকে স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিয়াছে,—এক সময়ে সমগ্র ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে,—তাহার জন্ম কখনও ব্যর্থ হইবে না। Karamsin ত ঠিকই বলিয়াছিলেন, "Henceforth Clio must be silent, or accord to Russia a prominent place in the history of nations."—ভবিষ্যতে রুশিয়াই ইতিহাস গঠন করিবে;—সে কিনা টিউটন্-জার্ম্মান জাতিকে অনুকরণ করিয়া, আপনার ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিবে? Slavophileগণ বলিল,—তাহা নহে,—সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহারা গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল তাহা নহে,—অমনি রুশ-সমাজের অন্তঃস্থল হইতে প্রতিধ্বনি শুনা গেল, তাহা নহে। Slavophileগণ সমাজকে আশার কথা শুনাইল, বিশ্ব-জগতে আশার বাণী প্রচার করিল। রুশিয়া বিশ্বজগতে একটি শ্রেষ্ঠদান উপহার দিবে।

Slavophileগণ বলিল—ইউরোপীয় সমাজ, ব্যক্তির প্রভাবকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছে, ব্যক্তির বিচারকে অত্যধিক সম্মান করিয়াছে। তাহার ফলে, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের গোড়াপত্তন পর্য্যন্ত ব্যক্তির তাড়নায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ইউরোপ ও প্রতীচ্য ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু প্রতীচ্য ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত সাধনা, চার্চ্চের বিধি-বিধান অপেক্ষা উচ্চ অধিকার পাইয়াছে। তাহার ফলে Roman

Catholicism, ও Protestantism ; এবং the protest of Protestantism and the dissent of Dissent. কূট বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভরের ফলে পাশ্চাত্য ইউরোপে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িক বিবাদ-আন্দোলন, ধর্ম্মে অনাস্থা ও ভগবানে অবিশ্বাস। প্রাচ্য ইউরোপ—Romeএর নিকট হইতে নহে—Byzantium হইতে, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিল ; তাই সে খৃষ্টধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তাহার ধর্ম্মজীবনে, একদিকে পোপের অত্যাচার ও অপর দিকে Protestantদিগের চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতার দোষ প্রবেশ করে নাই। প্রাচ্য ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম যে ভাবে পালন করিতে পারিয়াছে, প্রতীচ্য ইউরোপ তাহা করিতে পারে নাই। প্রতীচ্য ইউরোপ সুখ-সম্পদকেই তাহার ঈশ্বররূপে বরণ করিয়াছে ; ভোগলালসা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়াছে, সমাজের দীনদরিদ্রদুঃখীকে নির্যাতিত করিয়াছে,—প্রাচ্য ইউরোপ তাহা করে নাই। প্রাচ্য ইউরোপ যিশুখ্রীষ্টের সেবাব্রতের মহিমা এখনও ভুলে নাই, প্রেম, মৈত্রী ও করুণা, ভগবানে অটল বিশ্বাস, ভগবানের উপর অটল নির্ভরতা, আত্মসংযম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এই সকল শ্রেষ্ঠগুণ প্রাচ্য ইউরোপেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। খৃষ্ট যাহা তাঁহার জীবনে দেখাইয়া ছিলেন,—তাহা প্রাচ্য ইউরোপ আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে।

Dostoievesky প্রচার করিয়াছেন, রুশিয়ার খৃষ্ট ধর্ম্ম আসল Byzantineএ প্রচারিত খৃষ্ট ধর্ম্ম, তাই তাহা এত বিশুদ্ধ। Moscowর St. Basil গির্জ্জা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। Napoleon ঐ গির্জ্জাকে মুসলমানের মসজিদ বলিয়াছেন ; তাহা নহে, এ গির্জ্জা ইউরোপের গির্জ্জার মতন না হইলেও, এই গির্জ্জাতেই আসল খৃষ্টের, দীনহীনের খৃষ্ট, পাপীতাপীর খৃষ্ট, পতিতপাবন খৃষ্টের অধিষ্ঠান।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া রুশ এখন আপনাকে হীন নগণ্য মনে করিতেছে। তাই ধনিগণ—শিক্ষিতগণ বিদেশকে অনুকরণ করিতে ব্যস্ত, তাই তাঁহারা স্বদেশী ভাষা ত্যাগ করিয়া ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন। তাই Pushkin নির্লজ্জভাবে বলিয়াছেন, আমার মাতৃভাষা অপেক্ষা আমি ইউরোপের ভাষা, ফরাসী ভাল শিখিয়াছি। তাই বিদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহারের শিক্ষিত রুশিয়ার এত আদর। Slavophileগণ পরানুবাদ ও পরানুকরণকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। পরানুকরণকে তাহারা "Monkeyism," "Parrotism" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যাঁহারা বিদেশী শিক্ষা পাইয়া দেশের সভ্যতাকে আদর করিতে ভুলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগকে "Clever apes who feed on foreign intelligence, Sauntered Europe round, and gathered every voice in every ground" বলিয়া তিরস্কার করিল।

Slavophileগণ রুশের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইল। ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশের দর্শনবিজ্ঞান পাঠ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশকে অন্ধ ও মূঢ় ভাবে অনুকরণ করিবার জন্য তাহারা পাগল হইয়াছে; তাহারা তোতাপাখীর মত বিদেশের বুলি আওড়াইতেছে, বাঁদরের মত পরের পোষাকপরিচ্ছদে আমোদ বোধ করিতেছে; ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে; কিন্তু এখনও জনসাধারণ—রুশিয়ার কৃষকগণের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাওয়া যাইবে।

অসংখ্য রুশ-কৃষক—বহুশতাব্দী ধরিয়া আত্ম-অবমান সহ্য করিয়াছে, দাসত্ব-শৃঙ্খলের গুরুভারে তাহাদের আত্মা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তবুও তাহাদেরই মধ্যে প্রকৃত রুশ মনুষ্যত্ব এখনও জাগ্রত

রহিয়াছে, ধনীগণের প্রাসাদে বিলাসমণ্ডপে নহে, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের পাঠাগার আলোচনার বৈঠকে নহে, কৃষকের জীর্ণ কুটিরেই অতীতের প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যাইবে,—"the living legacy of antiquity"র কৃষকই উত্তরাধিকারী—Slavophileগণ এই কথা প্রচার করিল। Slavophile কবি ও দার্শনিক Khomiakof একটা সুন্দর তুলনা দিয়াছেন। বহুশতাব্দী ধরিয়া রুশ-সমাজের অন্তরস্থলের ভিতর দিয়া ফল্গুনদীর মত একটা সাধনার ধারা বহিয়া যাইতেছে, তাহা এখনও সতেজ সজীব রহিয়াছে, নানা দিক হইতে এখন যে পঙ্কিল স্রোত সমাজের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, তাহা কখনই সেই জাতীয় সাধনার ধারার স্বচ্ছতা নষ্ট করিতে পারিবে না। কৃষক-জীবনের ভিতর দিয়া সেই "clear spring welling up living waters hidden and unknown but powerful" স্রোতোধারা অবশেষে বিদেশী-সভ্যতার পঙ্কিল স্রোত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবে, এবং আপনার স্বচ্ছ শীতল ধারায় সমগ্র সমাজকে প্লাবিত করিয়া দিবে।

রুশিয়ার কৃষক-সমাজ এখনও পরানুবাদ—পরানুকরণ শেখে নাই; রুশ কৃষক-সমাজে এখনও মনুষ্যত্ব জাগ্রত রহিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় যে বেদেশী সভ্যতার মোহে পড়িয়া আপনার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। শিক্ষিতসম্প্রদায় ও কৃষক-সমাজের মধ্যে এক্ষণে একটা খুব বেশী ব্যবধান দেখা গিয়াছে, সে ব্যবধান দূর করিতে হইবে।

Slavophileগণ কৃষক-সমাজের চরিত্র, তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতির প্রতি সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল; কৃষকগণের প্রকৃত মহত্ত্বের প্রতি সমগ্র সমাজের শ্রদ্ধা জাগাইতে লাগিল; শিক্ষিত বংশের নিকট জাতীয় চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

করিয়া বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার মোহ হইতে উহাকে রক্ষা করিতে লাগিল; শিক্ষিত-রুশ অশিক্ষিত-রুশের নিকট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিয়া জাতীয় শক্তি, জাতীয় চরিত্র ও মনুষ্যত্বের পুষ্টি সাধন করিবে, ইহাই Salvophileগণের আশা।

আর এই আশা পূর্ণ না হইলে, বিশ্বসংসারে রুশের জাতীয় জীবন ব্যর্থ হইবে। Hegel যে বলিয়াছেন জগতে টিউটন্-জার্মান জাতির জীবনে Weltgeistএর পূর্ণ-অভিব্যক্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্য ইউরোপে এক্ষণে ব্যক্তির প্রভাবের কুফলে সমাজে ঘোর অশান্তি ও বিপ্লব আসিয়াছে; পাশ্চাত্য-সমাজ এখন ধ্বংসোন্মুখ। "Western Furope is on the high road to ruin"—তাই রুশ জাতি এখন একটা মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য ব্রতী হউক,—"We have a great mission to fulfil." একজন Slavophile রুশকে এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য এইরূপে আশার বাণী প্রচার করিলেন—"Our name is already inserted on the tablets of victory, and now we have to inscribe our spirit in the history of the human mind. A higher kind of victory—the victory of Science, Art, and Faith—awaits us on the ruins of tottering Europe."

'আমরা জয়ী হইবই হইব; বিশ্বমানবের ইতিহাসে আমাদের এই জয়ের বিধান পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; ইউরোপ ধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু রুশিয়ার নবজীবনের সূচনা হইয়াছে। Slav জাতি বিশ্বমানবকে নূতন বিজ্ঞান, নূতন বিশ্বাসের কথা শুনাইবে।'

আমার একটু বিস্তৃত ভাবে Slavophileগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কারণ এই যে—আমাদের দেশেও এক্ষণে

একদল ভাবুক ও লেখক, ঠিক Slavophileগণেরই আদর্শ লইয়া, সমাজকে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আহ্বান করিতেছেন। বিশ্ব-সভ্যতায় হিন্দুসমাজ একটা নূতন আদর্শ দান করিবে এবং যতদিন সেই দান সে না দিতে পারে, তত দিনই হিন্দুজীবন যে ব্যর্থ যাইবে, এ কথা অনেকে প্রচার করিতেছেন। ভারতবর্ষ বিশ্বমানবকে একটা মহাপ্রাণ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া আপনার জাতীয় জীবন সার্থক করিবে,—ইহা হিন্দুর আশা বা আকাঙ্ক্ষামাত্র নহে, ইহা তাহার এ টা বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে। সে ধারণা হইতে তাহাকে কেহই টলাইতে পারিবে না,—সে ধারণা যাইলে সে মনে করে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। পাশ্চাত্য জগতে ধনী ও অসংখ্য শ্রমজীবীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের ফলে সমাজে ঘোর অশান্তি ও বিপ্লব দেখা গিয়াছে,—পাশ্চাত্য জগতে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনৈক্য এবং অনৈক্যের নির্য্যাতনে সমাজ বিধ্বস্ত হইতেছে। ব্যক্তিপূজার পরিণাম—সমাজদ্রোহিতা—সকলেই যেন একটা অনন্ত বেদনা ও মহাপ্রলয়ে সমাপ্ত হইতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাএই অশান্তি এই সংঘর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের গ্রাম্য-সমাজের শান্তিময় সমূহতন্ত্র—পাশ্চাত্য সমাজে একটা নূতন বাণী প্রচার করিবে, ইহাই ত বর্ত্তমান ভারতের ধারণা। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিবে,—অহিংসা-মৈত্রার বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বাঁধিয়া দিবে। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য-সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনী নির্ধন, বেকার শ্রমজীবী—সকল ব্যক্তিকেই প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষান্ত করিবে; প্রত্যেকে আপনার Rights—সমাজের নিকট হইতে আপনার দাবী—পূরামাত্রায় আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, যাহাতে সমাজের নিকট আপনার কর্ত্তব্য-সম্পাদন করে, তাহার জন্য একটা নূতন কর্ত্তব্য বোধ

জাগাইয়া দিবে। হিন্দুর-সমূহতন্ত্রে ব্যক্তির যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত তাহাই পাশ্চাত্য-সমাজের অশান্তি দূর করিবে। আধুনিক Socialism তাহা কখনই করিতে পারিবে না।

বিশ্বজগৎকে শান্তিদান বর্ত্তমান ভারতবর্ষের প্রধান কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমন্বয়-সাধন করিয়া, বর্ত্তমান ভারত পাশ্চাত্য-সমাজের ভোগ-প্রসূত উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধর্ম্ম-প্রসূত অকল্যাণ দূর করিবে।

এই সমস্ত ধারণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কতিপয় ভাবুক, হিন্দু-সমাজকে বিশ্বমানবের নিকট আপনার মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। Slavophileগণের সংখ্যার মত ইঁহাদের সংখ্যা খুব কম; কিন্তু তাহা হইলেও, ইঁহারা সমাজের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সমগ্র সমাজ ইঁহাদিগের চিন্তার ও চরিত্রের প্রভাবে বিশ্ব-সভ্যতায় আপনার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে হিন্দুর প্রকৃত মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইতেছে; জনসাধারণ কৃষক-সমাজের মধ্যেই হিন্দুর মহাপ্রাণ সুপ্ত রহিয়াছে;—এবং উহাকে জাগ্রত করিতে হইবে, ইহাও তাঁহারা বলিতেছেন। তাহার ফলে আধুনিক ভারতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, পল্লীসেবা, পল্লীসংস্কার, বন্যা দুর্ভিক্ষ সময়ে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল উদ্যোগ ও পরিশ্রম।

কিন্তু সাহিত্য-জগতে Slavophileগণ যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ কিছুই এ দেশের ভাবুকগণ করিতে পারেন নাই। আমাদের ভাবুকগণের চিন্তা ও কর্ম্ম জনসমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আমরা পূর্ব্বেই রুশিয়ার ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক Blieuskiর মতামত সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছি। রুশিয়ার Byron,

Goethe ও Schilerএর প্রভাবে তখন যে সাহিত্যে একটা কৃত্রিম ভাবরাজ্যের পুষ্টি-সাধন হইতেছিল, সমাজের দৈনন্দিন সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগ হইতে দূরে সরিয়া সাহিত্য যে আপনার সৃষ্ট কৃত্রিমতায় আপনিই পঙ্গু হইতেছিল, তাহা হইতে Blienskiর প্রভাবে রুশ-সাহিত্য কৃষক-সমাজের সুখদুঃখের কাহিনীতে নূতন প্রাণ পাইল। Blienskiর সমালোচনার ফলে, Gogol-Turgenieffএর সাহিত্যে,—রুশ-সমাজ রুশ-সাহিত্যের বিয়োগ-নিবারণ,—সমাজ ও সাহিত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ-স্থাপন।

Slavophileগণের পক্ষে Blienskiর সমালোচনা অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছিল। Blienski প্রচার করিতেছিলেন সাহিত্য চন্দ্রকিরণ, পরীর রাজ্য, স্বর্গের পারিজাত, নন্দনকানন ছাড়িয়া এখন বাস্তবতায় নামিয়া আসুক, কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনীতে সাহিত্য নবজীবন লাভ করিবে। Slavophileগণ প্রচার করিতেছিলেন, কৃষকের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাওয়া যাইবে; ধনী বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নহে। Slavophileগণ সমাজে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিলেন, সাহিত্য তাহার সহায় হউক—জনসমাজকে সাহিত্যের কেন্দ্র করিবার Blienskiর আশা, এবং Gogol ও Turgenieffএর আয়োজন। ফলে Slavophile-গণের Blienskiর উপদেশ সার্থক হইল। মহনীয় ভাবগুলি সাহিত্যের ভিতর দিয়া অচিরেই প্রচারিত হইয়া যুগান্তর আনিল,—সাহিত্যও তখন নূতন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সাহিত্যে হীনতার মহিমা

ডস্‌টোইভেস্কির বাণী

আমরা এক্ষণে দুইজন সাহিত্যিকের জীবনী ও ভাবুকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি; দুইজনেই যৌবনে Slavophileগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—সাহিত্যের ইতিহাসে, সভ্যতার ইতিহাসে, দুই জনেরই নাম চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিবে, বরং কালাতিবাহের সঙ্গে আরও দীপ্তিমান হইতে থাকিবে—Dostoievsky ও Tolstoy। Dostoievskyকে আধুনিক ইউরোপ মহাপুরুষ, মহাত্মা, Saint, Prophet বলিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ তাঁহার সাহিত্যে রুশিয়ার নবযুগের সাধনার পরিচয় পাইয়াছে। Shakespeare বা Goetheর মত তিনি শুধু একজন প্রতিভাবান লেখক নহেন; তাঁহার জীবনই একটা মহাকাব্য। তাঁহার সাহিত্য এইজন্য তাঁহার নিজের ও তাঁহার জাতির সাধনার ফল-স্বরূপ। তিনি ইউরোপকে একটা নূতন আলোক দিয়াছেন; সে আলোকে ইউরোপের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে। বহুকাল অন্ধকারে বাস করিবার পর, একটা শুভ্র আলোকরশ্মি হঠাৎ দেখা যাইলে, যেমন তাহা অত্যন্ত তীব্র ও কষ্টকর মনে হয়, ইউরোপের চিন্তা-জগতের পক্ষে Dostoiveskyর সাধনাও তাহাই হইয়াছে। এখনও তাহা স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ-পূর্ণ ধ্রুবতারার মত প্রতীয়মান হয় নাই।

Dostoievskyর বাণী এই,—রুশের নবযুগের সাধনা বর্ত্তমান

ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করিবে; পাশ্চাত্য জগৎ এখন ভয়ানক পূতি-গন্ধময় কুটব্যাধিগ্রস্ত, রুশিয়ার ধনী ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও ঐ ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে; কিন্তু রুশিয়ার জন-সমাজ এখনও শুচি, পবিত্র, সুস্থ রহিয়াছে; রুশিয়ার নবজাগ্রত জন-সমাজ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, লক্ষ লক্ষ একত্র মিলিয়া, এক বিরাট খৃষ্টের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশ্ব-জগতের কুট-ব্যাধি আপনার করুণ-কোমল পবিত্র হস্তের স্পর্শে আরোগ্য করিয়া দিবে।

ইউরোপের চিন্তা-জীবনের নিকট Dostoievskyর সাহিত্য ও সাধনা একবারে নূতন ঠেকিয়াছে।

Shakespeareএর মত বিচিত্র ও সুন্দর চরিত্র-অঙ্কন Dostoievskyর উপন্যাসে আছে,—Dostoievskyকে the Shakespeare of Russia and of Fiction বলা হইতেছে; আবার Goetheর মত কল্পনার মৌলিকতা ও ভাবুকতাও Dostoievskyতে আছে। কিন্তু আরও একটা নূতনত্ব, মৌলিকতা ও নূতন প্রকার ভাবুকতা আছে, যাহা শুধু Shakespeare বা Goethe কেন,—গ্রীক সাহিত্য ও সভ্যতা হইতে যে সাহিত্য তাহার জীবনী-শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাতে পাওয়া যাইবে না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ যেমন একবারে একটা সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনাইয়া, একটা সরস নূতন জীবনের গান গাহিয়া, ইউরোপের সাহিত্য-আত্মাকে মুগ্ধ করিয়াছেন, Dostoievskyর সাহিত্য-সাধনাও ঠিক সেরূপভাবেই ইউরোপকে মুগ্ধ করিয়াছে। একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, After Dostoievsky's writings, the literature of the West seems like a draught of distilled and boiled water after the freshness of a bubbling spring.

সাহিত্যের পতিতপাবন ধর্ম্ম

Dostoievskyর নূতন প্রকার ভাবুকতার মূল-প্রস্রবণ কি, তাহা জানিতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহার ও সমগ্র রুশ-জাতির সাধনা সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিতে হইবে। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই রুশের নবযুগের সাধনার কথা ইঙ্গিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য ইউরোপের ভাবুকতার পরিণতি হইয়াছে,—Nietzcheতে, তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের অবজ্ঞায়, মৈত্রী সেবা ও আত্মত্যাগ-ধর্ম্মের তিরস্কারে, তাঁহার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার আয়োজনে, আত্মশক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নীতি ও ধর্ম্ম অবলম্বনে। Nietzche পতিতপাবন খৃষ্টকে সমাজ হইতে নির্ব্বাসন করিয়াছেন। Dostoievsky খৃষ্টকে রুশ কৃষকের অন্তঃস্থল হইতে বাহির করিয়া পাশ্চাত্য জগতের হৃদয়সিংহাসনে বসাইতেছেন। ইউরোপকে খৃষ্টের সেবাব্রতের মহিমা শুনাইতেছেন। পাপী তাপী, রোগী ঘৃণিতের জন্য যে খৃষ্ট তাঁহার জীবন দিয়াছেন, তাঁহার পূজা তিনি সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। আধুনিক ইউরোপ সে খৃষ্টকে ভুলিয়া গিয়াছে, সে খৃষ্টকে এখন ইউরোপ চিনে না; তাই Dostoievskyর খৃষ্টকে সে আসল খৃষ্টের বিকৃত মূর্ত্তি মনে করিতেছে। তাই Dostoievskyর খৃষ্টকে পাইতে হইলে আমাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করিতে হইবে, অথবা মধ্যযুগে সেই Assisiর মহাপুরুষ Francisএর জীবনী উপলব্ধি করিতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু নিন্দ্য, ঘৃণিত, হেয়—তাহাই নিন্দা, ঘৃণা ও হীনতার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যে ও পবিত্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে;— Dostoievskyর প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পাইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যে এক পতিতা রমণী—Sonia আশ্চর্য্য প্রেম, ধৈর্য্য ও

ভগবানের উপর অটল নির্ভরতার সহিত তাহার ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতেছে; মুগ্ধ নায়ক হৃদয়ে অসীম সহানুভূতি লইয়া, চক্ষে অপর বেদনার কজ্জল পরিয়া ঐ পতিতা রমণীর পায়ে পড়িয়া পূজা করিতেছে; যখন Sonia তাহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া বারণ করিতে গেল, সে বলিয়া উঠিল,—"I am not bowing before you, I am prostrating myself before all the suffering humanity"—"আমি তোমাকে পূজা করিতেছি না, আমি মনুষ্যের নিখিল শোকদুঃখ, পাপ ও লজ্জার নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছি।" ইহার সঙ্গে বুদ্ধ-অবতারের বারাণসীক্ষেত্রে পতিতা রমণীর গৃহে নিমন্ত্রণ-গ্রহণ মিলাইলে সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে; আধুনিক ইউরোপের পক্ষে ইহার মর্ম্ম অনুভব করা অসম্ভব! Hardyর Tess ও Hauptmann এর Song of Songs বাহিরের লজ্জা ও বেদনার মধ্যে এমন অটল ধৈর্য্য, হীনতার এমন মহিমা ফুটাইতে পারে নাই।

হীনতার মহিমা

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অপরিসীম দুঃখবেদনার ভিতর দিয়াই বিকাশ লাভ করে; অনুতাপ-যন্ত্রণা-প্রায়শ্চিত্তের হোমানলে দগ্ধ হইয়াই চরিত্র পূত শুদ্ধ পবিত্র হয়; মনুষ্যের পাপই আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র সহায়; Dostoievsky তাঁহার উপন্যাস সমূহে ইহাই দেখাইয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে ইহার অনুরূপ ভাব পাই, আমাদের বিল্বমঙ্গলে একটি নিখুঁত সুন্দর উদাহরণ পাই; কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত একটি মিলে না। পাশ্চাত্য ইউরোপে ব্যক্তি-চরিত্র আর এক ভাবে বিকাশ লাভ করে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন, দুঃখযন্ত্রণা, অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিতে করিতে ইউরোপে

ব্যক্তির চরিত্র-মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অসম্পূর্ণতাই শেষে ব্যক্তির আপনার উদ্দেশ্য-সাধন, চরিতার্থতা-লাভের সহায় হয়। প্রতিকূলতার উপর বিজয়লাভ, ইউরোপীয় ব্যক্তি-চরিত্র-বিকাশের পন্থা। Nietzcheর শক্তিপূজাতে ইহার সমাপ্তি দেখা গিয়াছে। Dostoievskyতে চরিত্রবিকাশ বিভিন্ন পন্থায় হইয়াছে। প্রতিকূলতার মধ্যে ব্যক্তি বাহিরে—সমাজে হেয়, ঘৃণিত, পদদলিত হইতেছে; কিন্তু অন্তরে তাহার অপরিসীম ধৈর্য্য, প্রেম ও বিশ্বাস বিকাশ লাভ করিতেছে; বাহিরে লজ্জা ও ঘৃণা, ক্রুশের যন্ত্রণা, ভিতরে ভগবানের অসীম প্রসাদ-লাভ—"Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." শক্তিপূজা নহে, খৃষ্টের প্রেম-ধর্ম্মের চরম বিকাশ—Dostoievskyর সাহিত্যে।

ইহজগতের দুঃখবেদনা যে অন্তর্জগতের সম্পদ, তাহা Dostoievsky তাঁহার নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সামান্য অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হত্যাকারীর সম্মুখে তিনি দশ মিনিট কাল অটল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় হুকুম আসিল,—তিনি সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন। সাইবেরিয়ার কারাবাসে কঠোর পরিশ্রমে যখন তিনি ক্লান্ত অধীর—তখন একজন কৃষক সৈনিক তাঁহার কাণে কাণে বলিল,—"You are sorely tired. Suffer with patience. Christ also suffered."—'তুমি কষ্ট পাইতেছ? ধৈর্য্য অবলম্বন কর। খৃষ্টও দুঃখ পাইয়াছিলেন।' (রুশ কৃষক—শুধু Dostoievskyর কেন,—সমগ্র রুশ সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক) তিনি কারাবাসের কষ্ট ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। সশ্রম কারাবাসের দুঃখযন্ত্রণা তাঁহার আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে। সে দুঃখ, সে যন্ত্রণা, তাঁহার The poor people

এবং Memories of the Deadএ বর্ণিত আছে; আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখবেদনার ভিতর চরিত্রের বিকাশ সাধন,—চরিত্র্য-মাহাত্ম্যেরও পরিচয় আছে। সাইবেরিয়ার জীবনের সহিত তাঁহার পরিচয় যদি না হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, শুধু বুদ্ধির দ্বারা তিনি পতিতপাবন খৃষ্টের ধর্ম্ম উপলব্ধি ও পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না। রুশ-সমাজ তাঁহার The poor people, The Idiot, Crime and Punishment, Humility and Offence প্রভৃতি গ্রন্থে, তাহার অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত দেখিতে পাইল। তিনি যে শুধু রুশ-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নহে; রুশ-চরিত্রের মৈত্রী, করুণা, ভ্রাতৃত্ব; রুশের বৈরাগ্য ও সেবাধর্ম্ম, "the religion of human suffering which is indulgent to everything that is unlovely." রুশ-চরিত্রের মহিমা যে তাঁহার উপন্যাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে, শুধু তাহা নহে; তিনি রুশ-জাতীয়-জীবনের ভবিষ্যৎও সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন; জাতীয় জীবনের ভবিষ্য বিরাট বিকাশের জন্য তিনি রুশজাতিকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন; তিনি রুশসমাজকে বিশ্বমানবের নিকট আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন; রুশকৃষকের ধর্ম্মপ্রাণ মহাজীবনই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে, এই আশার কথা তিনি বিশ্বজগতে প্রচার করিয়াছেন।

তাই রুশ-সমাজ তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছিল, আর কখনও সেরূপ সে কাহাকেও করে নাই। মৃত্যুর পর যখন তাঁহার মৃতদেহ কফিনে সকল লোকের সম্মুখে রাখা হইয়াছে, তখন সমগ্র রুশজাতি এই স্বদেশাত্মার প্রেমমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া, মনে মনে Crime and Punishmentএর কথা উচ্চারণ করিয়াছে,

"আমি তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিশ্বমানবের নিখিল দুঃখবেদনা-পাপ-অনুতাপের সম্মুখে প্রণত হইতেছি।"

দুর্ব্বল হৃদয়, Dostoievskyর কথায় চমকাইয়া উঠিবে, পাগল হইবে, অথবা তাঁহাকে পাগল মনে করিবে; কিন্তু সবল হৃদয় তাঁহার কথায় নূতন বল, নূতন আশা নূতন জীবন পাইবে।

টলষ্টয়ের সাহিত্য-সাধনা

আর একজন সাহিত্যিক ও ভাবুকের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। Leo Tolstoy এখন সাহিত্যজগতের নেপোলিয়ন। Dostoievskyর মত Tolstoy অসংখ্য দরিদ্র কৃষকগণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। Dostoievskyর মত তিনিও রুশিয়ার জনসমাজকে নূতন কর্ত্তব্যপথে আহ্বান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, Tolstoy একজন প্রচারক—যাহা তিনি প্রচার করিলেন, তাহাই তিনি জীবনে দেখাইলেন। যৌবনে যে Tolstoy আমোদপ্রিয়, ব্যসনাসক্ত, বিলাসী ছিলেন, সেই Tolstoy পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বহুবিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, যুদ্ধে গিয়াছেন, বিবাহ করিয়া জমিদারী দেখিতেছেন, কৃষকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতেছেন। War and peaceএ তিনি রুশিয়ার ধর্ম্ম ও রাজনীতিবিষয়ক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়াছেন, রুশ জাতীয়-জীবনের আদর্শ কি তাহা দেখাইয়াছেন, এবং ঐ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য রুশকৃষকের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিরও পরিমান দেখাইয়াছেন। Anna Kareninaতে তিনি ধনিগণের তথাকথিত "Society"র বিবাহবন্ধনের শৈথিল্য ও তাহার পরিণাম দেখাইয়াছেন; অবৈধ প্রেমের ভীষণ পরিণামের চিত্র আঁকিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনের পবিত্রপ্রেমেরও

মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। পারিবারিক জীবনের গৃহবন্ধন রুশ-জাতির আপনার সম্পদ; তাহাকে বিসর্জ্জন দিলে কুফল অবশ্যম্ভাবী; এবং রুশকৃষক এই গৃহজীবনের আদর্শকে কিরূপ ভক্তি করে, তাহাও দেখাইয়াছেন। Kreutzer Sonataতে গৃহজীবনে পারিবারিক বন্ধনের শৈথিল্য দেখাইয়াছেন; প্রকৃত প্রেম না থাকিলে পারিবারিক বন্ধনের ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার জমিদারীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন, কৃষক ও শ্রমজীবীগণের নৈতিক উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছেন; লোকে যাহাকে "Philanthropy." দরিদ্রসেবা বলে, তাহা তিনি খুব করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর এরূপে কাটিয়া গেল; কিন্তু এক্ষণে তিনি ভয়ানক অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এমন অশান্তি হইল যে, তিনি আত্মহত্যাও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

টলষ্টয় ও দরিদ্র-সমাজ

ইংলণ্ডের দুইজন শ্রেষ্ঠ ভাবুক সেই অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের দুঃখ দেখিয়া, তাহাদের ক্রন্দন শুনিয়া, তিনজনই কাঁদিয়াছিলেন। Carlyle বলিয়াছিলেন, 'তুমি যদি দরিদ্রের দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাক, তুমি পাগল না হইয়া পারিবে না।'—"If you stop to brood upon *la miseri*, that way Madness lies." Ruskin বলিয়াছেন "তুমি যদি তোমার ভোজনের সময়ে দরিদ্রের অনাহার সম্বন্ধে একবার ভাব, তাহা হইলে আর তোমার খাওয়া হইবে না।"—If the curtrain were drawn from it before you at your dinner, you eat no more."

জগতের যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা এমনই করিয়া পরের দুঃখ দেখিয়া পাগল হন।

Tolstoy পাগল হইলেন। মস্কৌতে যাইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের জন্য Relief Society খুলিলেন, তাহাদিগের দারিদ্র্যের পরিমাণ নিরূপণ করিতে লাগিলেন, ভিক্ষাসংগ্রহ করিয়া ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। যুবক সম্প্রদায়কে দেশের দারিদ্র্যসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অশান্তি যাইল না।

তাঁহার অশান্তি তিনি অতি সুন্দরভাবে What then must we do? নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মত দারিদ্র্যের চিত্র সাহিত্যে আর নাই। দারিদ্র্যের ভীষণ পরিণাম,—পাপ ও নরকবাস, মস্কৌ নগরীর দরিদ্রজীবন হইতে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অন্তঃকরণের করুণা, মৈত্রী ও সহানুভূতি এই নরকের অন্ধকারে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর মত দেখাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"Terrible was the sight of these peoples' destitution, dirt, raggedness and terror. And terrible above all was the immense number in this condition. * * Every where the same stench, the same stifling atmosphere, the same overcrowding. the same commingling of the sexes, the same spectacle of men and women drunk to stupefaction, and the same fear, submissiveness and culpabillity on all faces. * * I suffered profoundly." *—

তিনি বুঝিলেন যে ইহাদিগকে ভিক্ষা দিলে ইহাদের প্রকৃত দারিদ্র্য ঘুচিবে না, ইহাদের জীবনই পাপের জীবন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহারা তাহা বুঝে না—They do not see the immorality of

their lives. They know they are despised and abused but cannot understand what there is for them to repent of and wherein they ought to amend." অর্থ দিয়া তাহাদের জীবন পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব যখন তিনি বুঝিলেন, তখন তিনি নিরাশ হইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

সাহিত্যে প্রেমধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্র

তিনি কি করিবেন? ইহাদিগকে শিক্ষা দিবেন? শিক্ষাদানও নিষ্ফল হইবে। জগতে দুঃখদারিদ্র্যের একমাত্র কারণ, ধনিগণের বিলাসিতা ও শ্রমজীবিগণের হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রম;—"If there is one man idle, there is another man dying of hunger"—তিনি ইহা বুঝিলেন। যদি একজন লোক অন্য লোকের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে আর একজন লোক অনাহারে মরিবে। এখন তাহাই হইতেছে। তাহার খুব টাকা থাকিতে পারে সত্য; কিন্তু টাকা জিনিষটা কি?

Tolstoy বলিলেন, "Money does not represent usually work done by its owner. It represents power to make other people work. It is the modern form of slavery."—টাকা যে পরিশ্রমের মূল্য তাহা খুব কম স্থলেই হয়। সবক্ষেত্রেই অন্য লোককে পরিশ্রম করাইয়া লইবার ইহা একটি উপায় মাত্র। টাকার জন্যই একজন লোক আর একজন লোকের উপর যাবজ্জীবন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে, আধুনিক সভ্যতায় টাকাই দাসত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। টাকাই তাহা হইলে দুঃখদারিদ্র্যের—দরিদ্রের নির্যাতনের প্রধান কারণ। সকল লোক যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিত,

যদি খৃষ্টের উপদেশ 'In the sweat of thy face shalt thou eat bread, সকলে মানিত, তাহা হইলে দারিদ্র্য থাকিত না। নিজের ভরণপোষণের জন্য নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিলে, বিলাসিতা থাকিবে না, অর্থগৌরব লোপ পাইবে; সহর—যেখানে দেশের সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে—"Where the riches of the country are devoured" সেখানে অসংখ্য শ্রমজীবিগণ আসিয়া তখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিবে না, অথবা lodgingsএ কলুষিত জীবন অতিবাহিত করিবে না। সহরসমুদায় লোপ পাইলে, আর্থিক ও নৈতিক দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ লোপ পাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। Tolstoy ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের তথাকথিত শ্রমবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন, বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন লোক করিলে কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সত্য; কিন্তু কর্ম্ম অপেক্ষা মনুষ্যের জীবন কখনও হেয় নহে। আধুনিক সভ্যতার শ্রমবিভাগ মনুষ্যকে ঘৃণিত করিতেছে, তাহার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছে। প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ পরিশ্রমদ্বারা আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিলে ও অভাব সমুদয়ের সংখ্যা হ্রাস করিলে, সমাজে দারিদ্র্য লোপ পাইবে।

Tolstoy বুঝিলেন, কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন। কৃষক ধন সম্পত্তির মর্ম্ম এখনও জানে না, রাষ্ট্রের প্রভাবের সে বাহিরে রহিয়াছে; কৃষক আপনার পরিশ্রমের ফলে তাহার অল্প অভাব মোচন করে। তিনি নিজে কৃষকের জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, নিজে জমিতে লাঙ্গল দিতেন, নিজে জুতা তৈয়ারী করিয়া পরিতেন। Tolstoy কৃষক হইলেন।

তাঁহার সাহিত্যেও পরিবর্ত্তন আসিল। এখন ধনী সম্প্রদায়ের গুণাবলী তাঁহার উপন্যাসে গল্পে নাটকে আর বিবৃত হয় না; সমাজে যে যত হীন সে তাহার চরিত্রে তত উজ্জ্বল, ইহা দেখান হয়। তাঁহার

The power of Darkness নাটকে মেথর Akeinএর চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মহৎ। কৃষকদিগের দুঃখ তিনি বিবৃত করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দারিদ্র্যমাহাত্ম্যেরও কীর্ত্তন করিলেন।

তিনি নিজের কৃষকের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের ভাষারও পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহার পুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়া তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তাঁহাকে কৃষক অথবা শ্রমজীবিগণের নিকট একত্র শিক্ষা লাভ করিতে উপদেশ দিলেন।

"When his eldest son had taken his degree at the University, and asked his father's advice about a future career, the latter advised him to go as workman to a peasant." তাঁহার কৃষকের ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ভগ্নীপতি আরও বলিয়াছেন, "Leo is now at times fond of employing peasant manner of speech, as an indication of the simplicity he recommends."

Tolstoy তাঁহার গল্পরচনাপ্রণালী সম্বন্ধে নিজে লিখিয়াছেন, তিনি কৃষকগণের নিকট গল্প শুনিতেন, তাহারা কিরূপ ভাব ও ভাষায় গল্প বলিতে থাকে, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিতেন, এই উপায়ে তিনি কৃষকগণের উপযোগী করিয়া গল্প লিখিতে শিখিতেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ Ivan the fool গল্প এরূপভাবে একজন কৃষক তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। "I always do that," তিনি বলিয়াছেন "I learn how to write from them, and I test my work on them. That's the only way to produce stories for the people. My story, 'God sees the Truth' was also made that way." * * ইহা ছাড়া তিনি কৃষকরমণীগণের নিকটও গল্প বলিতে শিক্ষালাভ করিতেন।

"Besides the help he got from peasants, Tolstoy also received literary assistance from peasant women." এরূপে তিনি কৃষকগণের মধ্যে প্রচলিত গল্প ও উপন্যাসের নূতন আকার দিতেন, সমাজে পুনর্জ্জীবিত করিয়া প্রচার করিতেন। লোকসাহিত্যের প্রতিভাবান্, ও অকৃত্রিম সেবক তাঁহার মত কেহই নাই,—কেহই ছিল না।

Tolstoy কৃষিকার্য্য উৎসাহের সহিত আরম্ভ করিলেন; কৃষকগণকে তাহাদের কার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; কৃষকগণের—দারিদ্র্য—তাহাদের দৈনন্দিন অভাব-মোচনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। প্রত্যহ অনেক কৃষক তাঁহার নিকট আসিত, তাঁহার সহিত তাহাদের নানা বিষয়—বৈষয়িক, নৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধে—কথাবার্ত্তা হইত; তিনি তাহাদিগকে তাঁহার বুদ্ধি, জ্ঞান ও সাধনার উপযোগী উপদেশ দিতেন।

কৃষক-জীবনের-আদর্শ-প্রচার

রুশকে Tolstoy উপদেশ দিলেন—"Back to the people" "Go, and live as Peasants with the Peasants.,,—কৃষক হইয়া কৃষকের সঙ্গে বাস কর। নিজে দরিদ্র হইয়া পরের দারিদ্র্য মোচন কর। ব্যক্তিগত কর্ম্ম—ব্যক্তির চারিত্র্যমাহাত্ম্যের দ্বারা দারিদ্র্য-নিবারণ, দশের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে; ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি ভিন্ন সমাজের উন্নতি অসম্ভব, ব্যক্তির উন্নতি-সাধন রাষ্ট্রের হাতে নহে, ব্যক্তির নিজেরই হাতে। রাষ্ট্রের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া ব্যক্তি আপনার ও দশের কল্যাণ সাধন করিবে—ইহাই তাঁহার 'non-resistance' তত্ত্ব। ব্যক্তি যে এরূপে প্রেমের ধর্ম্মে আপনাকে একবারে বিসর্জ্জন দিবে, 'Love thy enemies, উপদেশ আপনার জীবনে উপলব্ধি করিবে,

তাহার একমাত্র সহায় খৃষ্টের নিঃস্বার্থ জীবন ও তাঁহার সেবা-ব্রতে মহিমা। "Back to Christ, Back to the simple, frugal li of the simple country peasant."—খৃষ্টের মত নিঃস্বার্থ হইতে হইবে; প্রেমিক হইতে হইবে; কৃষকের ন্যায় সরল, স্বল্পসন্তুষ্ট হইতে হইবে;—ইহাই Tolstoyএর উপদেশ, নিজের জীবনে তিনি ইহা দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার জমিদারী পূর্ব্ব হইতেই তাহা স্বত্বাধিকারীদিগকে দান করিয়াছিলেন; তাঁহার গ্রন্থাবলীর স্বত্ব তিনি জনসাধারণকে দান করিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তকে সকলেরই স্বত্ব ছিল, শুধু তাঁহার নিজের স্বত্ব ছিল না। ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি দরিদ্র কৃষকের ন্যায় দরিদ্র কৃষকের মধ্যে জীবনযাপন করিয়াছিলেন,—কৃষকদিগকে তাঁহার অযাচিত প্রেম ও ভালবাসা দিয়াছিলেন এবং কৃষকদিগের অভাব অভিযোগ লইয়া তিনি ধনী, শিক্ষিত, রাজপুরুষ—এমন কি রুশিয়ার Tsarকেও লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

প্রকৃত আর্ট সার্ব্বজনীন

আমরা Tolstoyএর 'What is art?' গ্রন্থের আলোচনা করিয়া Tolstoy সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস—ইহা সমুজ্জ্বল থাকিবে। Art কাহাকে বলে? আমাদের মনের ভাব ও চিন্তা, যাহা আমরা নিজে অনুভব বা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাকে অন্যলোকের জন্য প্রকাশ করা, অন্যের জন্য সেই ভাব ও চিন্তার পুনরাবৃত্তি করার নাম Art.—সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে উহা সার্ব্বজনীন কি না, সকলের হৃদয়কে উহা স্পর্শ করিয়াছে কি না।

Artএর দ্বারা একজনের মনের ভাব বা হৃদয়ের অনুভূতি অপরের মন বা হৃদয় অধিকার করে। "Let me make a nation's songs, and who will make its laws", 'আমাকে জাতির গানগুলি রচনা করিতে দাও; দেখিব কাহারা দেশের আইন কানুন রচনা করে।' তাই Art জাতীয় জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় জিনিষ। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিলে, Art ভিন্ন অন্য কিছু মনুষ্যের উপর সেরূপ প্রভুত্ব করিতে পারে না। জাতীয় উন্নতি Artই নিয়ন্ত্রিত করে। Art, সাহিত্য হউক, সঙ্গীত বা চিত্রকলা হউক, যদি সহজ ও সবল হয়, তাহা হইলে তাহা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারে। Artই ব্যক্তি বা জাতির উন্নতির পক্ষে প্রধান সহায়।

Tolstoy বলিয়াছেন, সাহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত ভাব প্রকাশ করে সেগুলি সার্ব্বজনীন। ব্যক্তির সহিত ভগবানের ও ব্যক্তির আধুনিক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যনির্ণয় Artএই প্রকাশিত হয়, Art সকল ব্যক্তিরই সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলিয়া ইহা সার্ব্বজনীন। 'True art must be comprehensible.' Art যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করে; তাই যে Art সমাজকে আধুনিক কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করে না, সে Artএর কোন মূল্য নাই। Artএর কর্ত্তব্য, মনুষ্যসমাজে যুগধর্ম্মের উপযোগী বিকাশের পথ নির্দ্দেশ করা। Tolstoy লিখিয়াছেন, "the art which conveys sensations which result from the consciousness of a former time, which is obsolete and outlived, has always been condemned & despised." যুগ-ধর্ম্মের যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হয়, Artও সেইরূপ যুগোপযোগী নূতন নূতন বাণী প্রচার করে। কিন্তু সকল ব্যক্তির পক্ষে সেই যুগের নূতন নূতন বাণী সমানভাবে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রকাশ করে,—

প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ও আদর্শ কি তাহা সমানভাবে নির্ণয় করিয়া দেয়; সকলেরই ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবোধ,—যাহাকে Tolstoy বলিয়াছেন 'religious perception'—তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া Art কোন বিশিষ্ট দলের জন্য নহে, Art সকলেরই। "If art is a conveyance of sentiments which result from the religious consciousness of men, how can a sentiment be incomprehensible if it is based on religion, that is, on the relation of man to God. Such art must have been, and in reality has been, at all times comprehensible, because the relation of every man to God is one and the same."

তাই যে সকল সাহিত্যিক একটা দল গড়িয়াছেন, যাঁহারা সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন করিয়া কিছু লিখিতেছেন না, অস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া আপনাদের পাণ্ডিত্য সমাজকে দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে Tolstoy খুব তিরস্কার করিয়াছেন। সাহিত্য জাতীয় হওয়া চাই, সার্ব্বজনীন হওয়া চাই। Tolstoy দুঃখ করিয়াছেন, সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইতেছে না, উহা একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেছে—সাহিত্যিক সমাজ, জাতি ও জগতের জন্য কিছু লিখিতেছেন না, একটা দলের জন্য লিখিতেছেন,—'The artist composed for a small circle of men, who were under exclusive conditions,' সুতরাং সাহিত্যের যে প্রধান কর্ত্তব্য—যুগধর্ম্মকে ব্যক্ত করিয়া সমাজ ও মনুষ্য জাতির উন্নতি-বিধান করা, তাহা হইতে সাহিত্য খলিত হইতেছে।

রুশচিন্তা ও সাহিত্যের ধারা

আমরা রুশ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখিলাম, রুশ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে তিনটি স্তর বিশেষ লক্ষিত হয়।

(ক) ফরাসী-বিপ্লব সাহিত্য-জগতে যে নূতন ভাবুকতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে এক তীব্র অশান্তি ও ব্যাকুলতা, আত্মকেন্দ্রতা ও আত্মসর্ব্বস্বতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কবিগণ পুরাতন রচনাপ্রণালী ত্যাগ করিয়া, একটা সহজ ও সরল রচনা প্রণালী তৈয়ারি করিলেন; বাস্তব-জীবনের অসম্পূর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা এক অপরূপ ভাবরাজ্য গঠন করিলেন;—সে রাজ্য সংসার হইতে অনেক দূরে, সে রাজ্যে অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অনন্ত ভোগ; আর তাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতিকে মনুষ্যের বর্ত্তমানের বন্ধন ও শৃঙ্খলের মধ্যে, Prometheousএর মত অনন্ত বেদনা ও Wertherএর মত অনন্ত নিরাশা, মনুষ্যের অনন্ত দুঃখের ভাগী করিলেন। Inkovesky, Pushkin, Lermentofএর সাহিত্য এই যুগের। বাস্তব জীবনের সহিত এ সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।

(খ) স্রোত অন্যদিকে ফিরিল। একটা অলীক ভাব-রাজ্য কল্পনা করিয়া অন্য জগতের মানুষের সৃষ্টি করিয়া, সাহিত্য তাহার আপনার কৃত্রিমতা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিল; ভাবুকতা পাগলামিতে ও স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতাতে পরিণত হইল। এই সময়ে হেগেলের দর্শনবাদ রুশিয়ায় যুবকগণের মধ্যে প্রচারিত হইল। যুবকগণ Schellingএর কল্পনা রাজ্য ছাড়িয়া হেগেলের বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতায় মাতিয়া উঠিল। সমালোচক Blienski প্রচার করিলেন, সাহিত্য একটা মিথ্যা ও কৃত্রিম ভাবুকতার ভাবে পঙ্গু হইয়াছে;

সাহিত্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হউক; সাহিত্যে জনসাধারণের সুখদুঃখ ব্যক্ত হইলে, নূতন বল ও নূতন প্রাণ পাইবে। Herzen বলিলেন, সাহিত্যে, সমাজে নূতন আদর্শ প্রচার করুক—সমাজসংস্কার না হইলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। Bliensk'i যে আদর্শ প্রচার করিলেন, সেই আদর্শ Gogol অবলম্বন করিলেন।

(গ) আমরা তৃতীয় স্তরে পৌঁছিলাম। স্তরে Gogol সাহিত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার সাহিত্যে প্রথম শুনা গিয়াছিল। সেই সময়ে আর একটি আন্দোলন সাহিত্যের এই পরিবর্ত্তনের সহায় হইয়াছিল। Slavophileগণ হেগেলের ইতিহাস-দর্শনে অনুপ্রাণিত হইয়া রুশিয়ায় জাতীয়তা প্রচার করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, প্রকৃত রুশ-মনুষ্যত্ব বিলাসী ও অনুকরণপ্রিয় ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যাইবে না, রুশ-জাতির প্রাণ কৃষকসমাজেই পাওয়া যাইবে। Slavophileগণ রুশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কৃষকগণের চারিত্র্য-মাহাত্মের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শিক্ষিত রুশকে আশার কথা শুনাইলেন, দরিদ্র রুশ কৃষকের ধর্ম্ম প্রাণ জীবনই ইউরোপীয় সভ্যতায় যুগান্তর আনিবে—বিশ্বসভ্যতায় রুশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইবে। Blienskyকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সাহিত্যক্ষেত্রে আন্দোলন ও Slavophileগণের জাতীয়তা মিলিয়া রুশসমাজে যুগান্তর আনিয়াছিল। Gogol অনুবর্ত্তী Turgenieff সৃষ্ট সাহিত্যে আমরা Realismএর উৎকট বিধান দেখিতে পাই, ভাবুকতার চরম বিকাশ দেখিতে পাই। Uncle Tom's Cabin যেমন নিগ্রো দাসবর্গের স্বাধীনতাদানের সহায় হইয়াছিল, সেরূপ Turgenieff এর Sportsmans, Sketches রুশিয়ার Serfগণের দাসত্বমোচনের সহায় হইয়াছিল, সেইরূপ রুশ Realism এর প্রভাবের আমরা পরিচয় পাইলাম।

তাহার পর রুশ কৃষকের বাণী-প্রচারক Dostoivesky, ও Tolstoy দুইজনেই খাঁটী রুশ, দুইজনেরই সাহিত্যে রুশ-সমাজের যুগযুগান্তের সাধনা ব্যক্ত হইয়াছে। Dostoivesky বা Tolstoyতে যাহা নাই, রুশ তাহা জানে না। রুশ যাহা চাহে, তাহা Dostoivesky ও Tolstoyতে পাইবে। রুশজাতির হৃদয়মধ্যে Dostoivesky ও Tolstoy নবযুগের আকাঙ্খা জানাইয়াছেন,—সমাজতত্ত্ববিদগণের কবি Nekrasso তাঁহার ব্যঙ্গ ও তীব্র কবিতায় তাঁহাদের সেই আকাঙ্খাই প্রচার করিয়াছেন, আধুনিক লেখকগণ তাঁহাদের বাণীর মর্ম্ম রুশিয়াকে বুঝাইতেছেন। রুশ জাতির নবযুগের সাধনা, সবই প্রকাশিত হইয়াছে Dostoivesky ও Tolstoyতে! তাই রুশ সাহিত্য আর উন্নতি লাভ করে নাই। Tolstoy তাঁহার আর্ট-বিষয়ক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, আর্ট যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করে, সমাজের যুগোপযোগী নূতন কর্ত্তব্য ও সাধনা ইঙ্গিত করে। Dostoivesky ও Tolstoy দুইজনেই সেই যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন, রুশজাতিকে নূতন শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছেন। আর্ট যুগোপযোগী আপনার বাণী প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে; তাই আর্টের এখন উন্নতি হইতেছে না; আর্ট যে সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে, এখন সমগ্র সমাজে তাহারই ধীর ও অক্লান্ত আয়োজন চলিতেছে। নবযুগ আসিলে আবার নূতন আর্ট আসিবে। নবযুগ এখনও আসে নাই।

আমাদের শিক্ষা

আমরা বলিয়াছি, আমাদের দেশে রুশিয়ার Slavophileগণের মত একজন চিন্তাবীর দেখা দিয়াছেন, যিনি সাহিত্যে এক নূতন ভাবুকতা আনিতে চাহিতেছেন,—যাঁহারা সাহিত্যে দেশ, জাতি ও সমাজের বাণী প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন,—যাঁহারা বলিয়াছেন, আমাদের দেশ

ও সমাজ বিশ্বসভ্যতাকে তাহার আপনার দান দিবার জন্য প্রস্তুত হউক,—যাঁহারা বুঝাইয়াছেন, আমাদের দেশ ও সমাজের অন্তঃস্থল—যেখানে জাতির প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইবে, অন্য কোন স্থলে নহে—কৃত্রিম শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারা পরিপুষ্ট ধনী বা মধ্যবিত্ত সমাজ নহে,—দেশের জনসাধারণ, আমাদের কৃষকসমাজ; যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, আমাদের জনসাধারণের সুপ্ত মনুষ্যত্ব আবার না জাগিয়া উঠিলে, আমাদের দেশ তাহার অভিনব বাণী জগতে প্রচার করিতে সক্ষম হইবে না; রুশিয়ার Slavophile গণের যে ভাবুকতা ছিল, আমাদের চিন্তাবীরগণের মধ্যে ঠিক সেরূপ ভাবুকতা লক্ষিত হয়।

কিন্তু Slavophileগণের আন্দোলন রুশসমাজকে যেরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, আমাদের লেখকগণের চিন্তা সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই,—Slavophileগণের আন্দোলনের পর রুশ-সাহিত্যের গতি একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল; আমাদের সাহিত্যে সে বিপ্লব আসে নাই। আমরা এখন একটা নূতন ভাব ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত; কিন্তু আমরা সে ভাব ও আদর্শকে কাজে লাগাইতে পারিতেছি না; আমাদের হৃদয়ের সেরূপ বল, মনের সেরূপ তেজ, চিন্তার সেরূপ গভীরতা নাই; আমরা সাহিত্যে একটা কল্পনার জগতের সৃষ্টি করিয়া, সেই সমস্ত ভাব ও আদর্শ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি; সে সব ভাব ও আদর্শ আমরা সমাজে এখনও আনিতে পারি নাই। রুশিয়ার Blienskyর সমালোচনার পর Gogol, Turgenieff, Dostoivesky ও Tolstoyএর সাহিত্য-সাধনার ভিতর দিয়া রুশিয়ার নবযুগের ভাব ও আদর্শ যেরূপ সমাজের অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল, আমাদের আধুনিক সাহিত্যিক তাহা ধারণাই করিতে পারিবেন না। আধুনিক রুশসাহিত্যে যুগধর্ম্মের যেরূপ ইঙ্গিত

আছে, এবং সে যুগধর্ম্ম সাহিত্যের ভিতর দিয়া যেরূপভাবে সমাজকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। Tolstoy ও Dostoiveskyর সাহিত্যে যে, ভাবুকতা নাই, তাহা নহে; তাঁহাদের উপন্যাসে চরম ভাবুকতা আছে; কিন্তু সে ভাবুকতা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবুকতার মত কৃত্রিম নহে; তাহা দৌর্ব্বল্য নহে শক্তির পরিচায়ক; তাহা বস্তু তন্ত্রহীন নহে, তাহা বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বর্ত্তমানসাহিত্যে যখন ভাবুকতার পরিচয় পাই, তখন তাহাকে একবারে বস্তুতন্ত্রহীন দেখি, তাহার সহিত বাস্তব-জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; যখন বস্তুতন্ত্র দেখি, তখন তাহার সহিত ভাবুকতার কোন সম্বন্ধে পরিচয় পাই না, তাহা একবারে প্রাণহীন—শক্তিহীন, এমন কি নিম্নগামী।

এখন বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে চরম-ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সম্মিলন প্রয়োজন হইয়াছে; এ সম্মিলন না হইলে, আমাদের সাহিত্য কখনই সমাজকে গঠন করিতে পারিবে না; আমাদের ভাবুকগণের চিন্তা কখনই জনসমাজকে স্পর্শ করিবে না। বর্ত্তমান রুশসাহিত্যে আমরা এ সম্মিলনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাইয়াছি; আমরা আধুনিক রুশ-চিন্তা ও সাহিত্যের আলোচনার কারণ, সাহিত্যে ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের সম্মিলন হইলে তাহা কি অসীম শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করে, তাহার পরিচয় দেওয়া।

আমার বিশ্বাস, অচিরেই আমাদের সাহিত্য, ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের এক সুন্দর সম্মিলনের পরিচয় দিবে; ইহারই মধ্যে কয়েক জন নবীন লেখকের চেষ্টায় এই সম্মিলনের সূচনাও দেখা দিয়াছে। বঙ্কিম, ভূদেব, দীনবন্ধু, গিরীশ, ক্ষীরোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও হেম, নবীন, অক্ষয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এক সঙ্গে মিশিলে, শুধু আমাদের সমাজে কেন, বিশ্বসভ্যতায় এক যুগান্তর আসিবে। রবীন্দ্রনাথে আমাদের সাহিত্যের

ভাবুকতার দিক্ বিকাশ লাভ করিয়াছে ; একা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে এক যুগান্তর আনিতেছেন ; ভাবুকতা ও বস্তু-তন্ত্র আমাদের সাহিত্যে মিশিলে যে যুগান্তর আসিবে, তাহার পরিমান বুঝা অল্পদৃষ্টি আমাদের পক্ষে এক্ষণে অসম্ভব।

যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিক

সাহিত্যে যুক্তি

একটা যুক্তি উঠিয়াছে, যে সাহিত্যের আদর্শ শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, লোকসাধারণের অভাব সম্বন্ধে সাহিত্য কোন চিন্তাই করে না। সাহিত্যের অপর কোন কর্ত্তব্য নাই, সাহিত্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আসিলে সাহিত্য-সৃষ্টি সুন্দর হইবে না। যুক্তি বা তর্ক, ভিতরকার একটা তত্ত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অন্তরায়, সত্য উপলব্ধির বিঘ্ন,—সাহিত্যিকের প্রধান বন্ধন।

এই মতটা আজকাল আমাদের দেশেও প্রচারিত হইতেছে। সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি এই প্রকার একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন। পরলোকগত সুলেখক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় নানা প্রবন্ধে এই মতই প্রচার করিয়াছেন।

সাহিত্যে যুক্তি বা তর্ক অবলম্বন করিলে, একটা তত্ত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে, লোককে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলে,—সত্য-প্রকাশ ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইবে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

থিওরির চাপ

কবির সৃষ্টি কি শুধুই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি,—বিচার বা যুক্তি কবি-হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, কাব্যের কি সৌন্দর্য্যহানি হইবেই?

প্রকৃতির বিচিত্র আলোক-ছায়া-বিরচিত অপরূপ ছবি, মনুষ্য-সমাজের অস্ফুট পরিস্ফুট চিত্রবৈচিত্র্য চিরকাল কবিকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। কবির হৃদয়ে প্রকৃতির লীলাখেলা, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, মেঘ ও রৌদ্র, বসন্ত ও বরষার ছায়াপাত হয়; বাস্তবজগতের প্রেম, বিরহ, মিলন, করুণা, মৈত্রীরও রেখাপাত হয়। বড় কবির হৃদয় অতি স্বচ্ছ ও সুন্দর —সেখানে প্রকৃতি ও মানবের,—বিশ্বের সকল ছবিই সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কবি-হৃদয়ে এরূপে যে বিচিত্র ছবি প্রতিফলিত হয়, কবিকে তাহাই পূরাপূরি প্রকাশ করিতে হইবে। তিনি যদি ছবিগুলি লইয়া বাছেন, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি সুন্দর, কোন্‌টি অসুন্দর—ইহা বিচার করিবার জন্য যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তর্ক অথবা থিওরির চাপে পূরা সত্য প্রকাশিত হইবে না, এবং কাব্য সুন্দর হইবে না।

যুক্তির ছাপ

কবি-হৃদয় স্বচ্ছ দর্পণ নহে, একটা স্বচ্ছ দর্পণের মত। প্রত্যেক কবিরই হৃদয়-দর্পণ বিভিন্ন রংয়ের। যুক্তিই হৃদয়কে নানা রংয়ে ভূষিত করিয়াছে। দর্পণে একটা রং বা নানাবর্ণের সমাবেশ আছেই। আর সেই রংই কাব্যকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেয়। কবির যুক্তি আপনাপনি তাহার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবিকে একটা রং দেবেই। ভাল বা মন্দ, সুন্দর বা অসুন্দর, একটা যুক্তির ছাপ কাব্যে পড়িবেই। এটা ঠিক, এজন্য কবি পূর্ণ বা অখণ্ড সত্যকে প্রকাশ করিতে অক্ষম,—কিন্তু মনুষ্য মাত্রেই অক্ষম,—সত্যকে আংশিকভাবে পাওয়া ও প্রকাশ করিতে পারার বেশী, মানুষ আর কিছুও আশা করিতে পারে না।

মেঘদূতের তত্ত্ব

বর্ষাকাল। অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ধরণীর উপর একটা স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। পশু পক্ষী গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সকলেই ত্রস্ত, আশঙ্কিত। সকলেই উন্মনা। নীরব নির্জ্জন গৃহকোণে বসিয়া বিরহী কবির অন্তর হইতে একটা বিচ্ছেদ বেদনার গান বাহির হইল। সে গান বাহিরের বর্ষার রোলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জগৎকে একটা অখণ্ড বিরহবেদনায় অভিভূত করিল।

নির্জ্জন গিরিতটের বিরহী যক্ষ যে বিরহ বেদনা অনুভব করিয়াছিল, মেঘের মুখ দিয়া অলকার বিরহিণীর নিকট যে মর্ম্মকথা পাঠাইয়াছিল, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যখন নীল নবমেঘের ঘনছায়া ধরণীকে উন্মনা করিয়া দেয়, বিশ্ববাসী তখনই সে বিরহ অনুভব করে, যাহাকে সে সশরীরে কিছুতেই পাইতে পারে না; সেই অনন্ত বসন্তরাণী অসীমবিরহবিধুরা মানসলোকবিহারীর নিকট আপনার কল্পনাকে দূত করিয়া কত নদী, কত রেবা সিপ্রা বেত্রবতী কত অবন্তী উজ্জয়িনী নগর অতিক্রম করাইয়া পাঠাইয়া দেয়।

মেঘদূতের বিরহী কবির হৃদয়ে বিশ্বপ্রকৃতি শুধু বিচ্ছেদবেদনার ছাপ দিয়াছে। এখানে তত্ত্ব কোথায়—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিব—তত্ত্ব সেইখানেই যেখানে বিরহী সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, শুধু আপনার অন্তরের মধ্যে নহে, একটা বিরহ বেদনা অনুভব করিয়াছে। আপনার ক্লিষ্টহৃদয়ের সহিত অশ্রুসিক্ত আষাঢ়ের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছে,—বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের মধ্যে বিরহ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে অতি সুন্দর রমণীয় করিয়া প্রকাশ

করিয়াছে। বিশ্বগ্রাসী বিরহের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিলে, অন্তর-বাহির শান্তি ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে ইহাই মেঘদূতের ভিতরকার যুক্তি।

শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের যুক্তি

মেঘদূতে বিরহে মিলন, শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবে মিলনে বিরহ। সমাজ-বিরোধী প্রেমে বিরহ, বিচ্ছেদ,—অশান্তি ও অকল্যাণ হইবেই। দুর্ব্বাসার অভিশাপ ও মদনভস্ম ভগবানের অমোঘ বিধান। প্রকৃত প্রেমের সহিত সমাজের বিরোধ নাই,—সে প্রেমে বিরহ নাই। তপস্বিনী গৌরী ও শকুন্তলা সেই প্রেম-শিক্ষা লাভ করিয়া স্বামী-হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

নাটকে যুক্তি

এই সকল কাব্যে বা নাট্যে ভিতরকার তত্ত্বটা গোড়া হইতে কবির মনকে অধিকার করিয়াছে। কাব্যে কবির নিজের যুক্তি সহজে প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে, তাই কাব্যে কবির ভিতরকার তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা প্রায়ই সৌন্দর্য্যের হানি করে না। কিন্তু নাটক অথবা উপন্যাসে যখন কবি বা লেখক অন্যের মুখে আপনার কথা বলেন, তখন ভিতরকার তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গেলে মানুষগুলা তত্ত্বের চাপে ছোট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, থিওরির আওতায় তাহাদের বিকাশের প্রতিরোধ হইতে পারে।

সাহিত্যের শিক্ষকতা

কিন্তু এ কথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না যে একটা উদ্দেশ্য কবির অন্তরে থাকিলে তাহার লেখার সৌন্দর্য্যহানি ঘটিবেই। বড়

জাতীয় সাহিত্যের অন্তরে একটা গভীর তত্ত্ব থাকিবেই,—সেটা সরু সূতার মত নানা ভাব নানা রসকে গাঁথিয়া তুলিয়া নানা রংয়ের সুন্দর পুষ্পলতাপাতার মত তাহাদিগকে সংবদ্ধ রাখে। সে সূতা না থাকিলে মালা রচনা হয় না; পুষ্পগুলি ঝরিয়া পড়ে।

প্লেটো, দান্তে ও মিল্টন

প্লেটো বলিয়াছিলেন, সমস্ত সাহিত্যের একটা ভিতরকার উদ্দেশ্য না থাকিলেও আর্ট শিক্ষা দেবেই। যে আর্ট ভাল শিক্ষা দেয় না সে আর্ট মন্দ শিখাইবে। দান্তের ডিভাইন কমিডির ভিতরে খুব একটা বড় নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। মিল্টন গোপন না করিয়া সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ভগবানের বিধান মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া—justify the ways of God to men. পাঠক বলিতে পারেন, প্যারাডাইস লষ্ট ও ডিভাইন কমিডি এই দুইটি মহাকাব্যের যাহা কিছু দোষ আছে তাহা কবি একটা উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের নিকট ধরা দিয়াছে; কিন্তু ইহাও ঠিক যে উহাদিগের গুণগুলিও সেই কারণেই আমাদের আদরলাভ করিয়াছে।

যুগপ্রবর্ত্তক গেয়েটে

গেয়েটের ফাউষ্টের ভিতরকার তত্ত্বটা অত্যন্ত গভীর, অথচ স্পষ্টই সম্মুখে রহিয়াছে। ফাউষ্ট অতীন্দ্রিয় তুরীয়কে পাইতে চাহে; কিন্তু সে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছে। বিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচনায় তাহার কঠোর ও জীবনব্যাপী পরিশ্রম বিফল হইয়াছে। তাই ওয়াগনরের মত একজন জ্ঞান-গর্ব্বিত ছাত্রের পক্ষে সে আলোচনা শোভা পায়, তাহার গুরু ফাউ-

ষ্টের হৃদয়ে চির অশান্তি ও ব্যাকুলতা। মেফিষ্টফেলিস পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সভ্যতার সব আশা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের বিপুল প্রয়াসের বিফলতা প্রচার করিয়াছে। অতীন্দ্রিয়তাকে আশ্রয় না করিলে শান্তি নাই, ইহা ফাউষ্টের শিক্ষা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সভ্যতার আশা ও নিরাশা দুইই ফাউষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উহা সেখানে মহা-কাব্যের স্থান অধিকার লাভ করিয়াছে।

নাটকে মানুষের প্রাধান্য

কাব্যের ভিতরকার তত্ত্ব অথবা যুক্তির কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। উপন্যাসে যুক্তির ছাপ কি ভাবে পড়ে তাহাই এখন আলোচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাটক অথবা উপন্যাসে লেখক যদি গোড়া হইতেই আপনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মানুষগুলা খর্ব্ব হয়, মতগুলা প্রাধান্য লাভ করে, নাটক উপন্যাসে যুক্তি মানুষের উপর আধিপত্য করিলেই মানুষ খাট হইবেই। ভাব নহে, মানুষই নাটক উপন্যাসের বক্তা—মানুষকে খাট করিলে ভাব নির্ব্বাক্ হইবে।

সেক্সপীয়রের নাটক

সেক্সপীয়র তাঁহার নাটকে, যুক্তিকে প্রাধান্য লাভ করিতে দেন নাই বলিয়া অনেকেই তাঁহার কথা মনে করিয়াই বলেন, নাটকে আর্টের যুক্তিকে গ্রাহ্য করা উচিত নহে। সেক্সপীয়র একবারে পক্ষপাত দোষ-শূন্য; তাঁহার নাটকের মানুষগুলা সহজ স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবেই কথা বলে ও কাজ করে, সেক্সপীয়র নিজে তাহাদের সম্বন্ধে ভাল মন্দ স্পষ্টভাবে কিছুই বিচার করিয়া বলেন না। কিন্তু ইহা একটা খুব বড় ভুল হইবে—যদি কেহ মনে করেন, যে ভাল বা মন্দ সুন্দর বা অসুন্দর

একটা বিচার তাঁহার নাটকে হয় নাই এবং পাঠককে একলাই সে বিচার করিতে হইবে আর সেক্সপীয়র তাহা করেন নাই। The gods are just and of our pleasant vices make whips to scourge us." ভগবান ন্যায় বিচারক, তিনি আমাদের পাপ দিয়া সজোরে বেত্রাঘাত করেন ইহা সেক্সপীয়রের নহে, এডগারের মুখের কথা। কিন্তু নাটকের ইহাই যে শিক্ষা তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন। 'ম্যাকবেথ' লোভের ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছে; অন্ধ নিয়তির নিকট পুরুষকারের ব্যর্থতা দেখাইয়াছে। সমস্ত নাটকটা ইহাই কি দেখাইতেছে না যে, ম্যাকবেথ যতই কেন চেষ্টা করুন না কেন, ডাইনীদিগের কথা মিথ্যা হইবে না; ম্যাকবেথের অভিসন্ধি মিথ্যা হইবে? আবার আমাদের কি মনে হয় না, ডাইনীগুলি বুঝি ম্যাকবেথের হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি তাহার সব সদিচ্ছা সদুদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে? হ্যামলেটে আমরা দেখিতে পাই—একজন মানুষের, অতিরিক্ত ভাবুকতা ও কার্য্যকরী বুদ্ধির অভাব হইলে কি শোচনীয় পরিণাম হয়; মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি বিরোধী পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়িলে তাহার কি দুর্দ্দশা হয়। লিয়ার, ওথেলো, অ্যাণ্টনী ও ক্লিয়োপেট্রা সব নাটকেই একটা না একটা নৈতিক শিক্ষা আছে—সেটা যে পাঠক অনুমান করে তাহা নহে, মহাকবি নিজেই তাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়র খুব বিচক্ষণ শিল্পী বলিয়া তাঁহার ভিতরকার উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই,—কিন্তু এটা বলিলে ভুল হইবে যে তাঁহার ভিতরকার কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

আর ভিতরকার তত্ত্ব অতি মহৎ বলিয়াই নাটকগুলি যুগে যুগে সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। শুধু নানা রসের সমাবেশ থাকিলেই যে উহাদিগের সমাদর হইত; তাহা নহে, রসের সহিত খুব একটা শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা মিশিয়াছে বলিয়া নাটকগুলি চিরকালের সামগ্রী হইয়াছে।

নব যুগের নূতন নাটক

সেক্সপীয়রের যুগ চলিয়া গিয়াছে; নাটকে যে অদৃষ্টের অসীম অলঙ্ঘনীয় প্রভাব ছিল তাহা ত পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল; রেনেসাঁর পর ইংরাজী জার্ম্মাণ ও ফরাসী সাহিত্যের নবযুগ ও বিপ্লববাদের যুগে ইতালীয় স্কাণ্ডেনেভিয়া ও পুরাতন ইতিকথা রূপকথার যে প্রভাব ছিল তাহাও এখন লোপ পাইয়াছে। সেক্সপীয়রের স্থান কাল ও পাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পাইয়াছে। রোমিও আছে, তাহার জুলিয়েটও আছে, নাই সেই সেকাল, সেকালের সুন্দর আলোছায়া বিরচিত আধ স্বপ্নের আধ বাস্তব জগতের রাত্রি—নাই সেই পুরুষপরম্পরাগত শত্রুতা, হত্যা, বিষপ্রয়োগ, মারামারি, রক্তপাত, সেকালের জীবনের আবেগ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভীষণ সৌন্দর্য্য। যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে ত আর ফিরিয়া আনা যায় না। তাই ইউরোপের আধুনিক নাটকে মধ্য যুগের চিত্রসৌন্দর্য্য ও ভাববৈচিত্র্য মধ্যযুগের ভাব, আদর্শ ও রীতিনীতি ত্যাগ করিয়া মানবহৃদয় ও বাস্তবজগতের অন্তরের মধ্যে একটা স্বপ্নালোক আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। মধ্যযুগের সেই স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সুন্দর জগৎ আর নাই, কিন্তু অন্তর্জ্জগতে ও আধুনিক সমাজের অন্তস্থল হইতে আরও সুন্দর একটা জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আধুনিক নাটকের নৈতিক সমস্যার আলোচনা

প্রসিদ্ধ নাটককার মরিস মেটারলিঙ্ক আধুনিক নাটক সম্বন্ধে এক স্থলে লিখিয়াছেন,

Incapable of exterior development, deprived of exterior ornament, no longer venturing to make serious appeal to a special fatality of divinity, it has fallen back on itself, and

endeavoured to discover in the regions of *moral life* and in those of *psychology* the equivalent of all that it once possessed in the decorative expansive life of former days. The modern drama has flung itself with delight into all the *problems of contemporary morality* and it is fair to assert that at this moment it confines itself almost *exclusively* to the discussion of these different problems.

বাহিরের অলঙ্কার হারাইয়া আধুনিক নাটক ভিতরের রত্ন খুঁজিতেছে, মনস্তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে,—নৈতিক সমস্যার আলোচনা করিতেছে। ইহা বলা যাইতে পারে যে সম্প্রতি আধুনিক সমাজের নীতির আলোচনা ব্যতীত ইহা আর কিছুই করে না।

যুক্তির মালা হাতে করিয়াই নাটক এখন ভাবের দরজায় দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের সমাজের রূপের সঙ্গে ভিতরকার মানসলোক-বিহারী ভাবরূপীর মিলন করিয়া দিতে পারাই শিল্পী ও ভাবুকের আদর্শ হইয়াছে।

আধুনিক নাটকের সমাজ-গঠন-শক্তি

আর আধুনিক সমাজের বড় বড় সমস্যার আলোচনা ও একটা সত্য নির্ণয় করিবার প্রবল চেষ্টা জাগিয়াছে বলিয়াই আধুনিক নাটক-সমাজের অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে শান্তি কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। ইবসেন, হপ্টম্যান, ব্যজর্নসন, মেটারলিঙ্ক আধুনিক নাটকের গুরু। সকলেরই নাটকে সমাজের এক একটা বড় সমস্যা পূরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সাহিত্যে ও সমাজে সকলেরই প্রভাব প্রতীয়মান হইয়াছে।

বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে সমাজের উপর নাটককারগণের প্রভাব সাহিত্যের ইতিহাসে একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা। আমি এ সম্বন্ধে ‘সাহিত্যের গঠন-শক্তি,’ নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’

আমাদের রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ ‘রাজা’ ও ‘অচলায়তনে’ বর্ত্তমান সমাজের কতকগুলি প্রধান সমস্যার আলোচনা হইয়াছে। ‘ডাকঘরে’ আমরা দেখি, আমাদের সমাজ একজন কবিরাজের মত অসংখ্য বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা দিয়া মানুষের অন্তঃকরণকে ‘অচলায়তন’ হইতে দিতেছে না; “অমল” অন্তঃকরণ জানে না সে বিধিনিষেধের প্রয়োজন কি; সে ঘরে বসিয়া স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে, অন্যের স্বাধীনতা দেখিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিতেছে। কিন্তু যখন সে শুনিল ছোট হই-লেও ভগবানের প্রেম হইতে সে বঞ্চিত হইবে না, “রাজার চিঠি” তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছিবেই তখন সে আশায় বুক বাঁধিল। সমাজরক্ষক “মোড়ল” তাহাকে শ্লেষ করিয়া যাহা দান করিল তাহাই তাহার ভগবানের প্রেমানুভূতির সহায় হইল, “রাজার চিঠিতে” পরিণত হইল। মানুষের সনাতন মনুষ্যত্ব (“ঠাকুর্দ্দা”) যাহা ভগবৎপ্রেমের ‘ফকির’ হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগাইয়া রাখিয়াছিল, সমাজের বিধিনিষেধ (“কবি-রাজ”) ও দণ্ড (“মোড়ল”) হইতে হৃদয়কে রক্ষা করিতেছিল। শেষে রাজ-দূত আসিল, অন্তঃকরণ রাজাকে পাইবার জন্য এক অনন্ত ঘুমকে বরণ করিল—আনন্দ ‘সুধা’ তাহার দান দিতে ভুলিল না। শুধু পড়িয়া রহিল সমাজ ও সমাজরক্ষক, ভগবৎ প্রেম সে অচলায়তন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

'অচলায়তনের' উদ্দেশ্য

"অচলায়তনে" সেই একইরূপে মানুষের সহিত লৌকিকধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিধিনিষেধের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে। একটা লৌকিক অনুষ্ঠান মানুষ অনেক সময়েই না বুঝিয়াই আচরণ করে,—হিন্দুসমাজে ইহা খুবই দেখা গিয়াছে—তাহার সবই পণ্ডশ্রম ; শ্রদ্ধা ভক্তি অনেক সময়ে ভগবানের প্রতি না হইয়া বিধিনিষেধের অনুষ্ঠানেরই প্রতি হয়, তাহা দেখান হইয়াছে। ভগবান বিধিনিষেধের মধ্যে আপনাকে মানুষের নিকট ধরা দেন না ; তিনি সকল মানুষ—দীনহীনদেরও অন্তরের মধ্যে হাসিয়া গাহিয়া খেলিয়া বেড়ান ; যতদিন না তিনি মানুষের বাঁধাবাঁধি কৃত্রিম শাস্ত-নিয়মের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া ফেলেন, ততদিন তাহার মুক্তি নাই।

রবীন্দ্রনাথের Optimism.

'ডাকঘরে' আমরা মনুষ্য হৃদয়ের সহজ সরল স্বাধীনতার সংবাদ পাই,অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে তাহার স্বাধীনতার গৌরব দেখি—'ডাকঘরে' আমরা মানুষের চিরন্তন আশার কথা শুনিতে পাই,—আশা এই অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও বন্ধন বিহীন আত্মা তাহার সেই স্বাধীন দেশের রাজাকে পাইবেই। 'ডাকঘরে' দেখান হইয়াছে মানুষের ভক্তি, 'অচলায়তনে' দেখান হইয়াছে ভগবানের প্রেম। 'অচলায়তনের' বিধিনিগড়ের মধ্যে থাকিয়া যখন মানুষ আপনার সহিত বাহিরের সকলের ও ভগবানের সহিত প্রেমের যোগ ছিন্ন ভিন্ন করিল, তখন ভগবানের দয়া এক ফুৎকারে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই দয়াই মানুষের একমাত্র আশা। সামাজিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দুই নাটকেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের চিরন্তন আশার কথা প্রচার করিয়াছেন।

মরিস মেটারলিঙ্ক ও রবীন্দ্রনাথ

'ডাকঘর' ও 'অচলায়তন' দুইতেই এক সামাজিক সমস্যার আলোচনা হইয়াছে। সমস্যাটা কি, এক কথায় বলিতে গেলে,—মানুষ ভগবানকে পাইতে গেলে শাস্ত্রকে মুখ্য না আপনার হৃদয়কে মুখ্য করিবে? মরিস মেটারলিঙ্ক তাঁহার 'The sightless' অন্ধ নাটকে অনেকটা একই রূপ সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। চার্চ্চ মানুষের সহিত ভগবানের যোগস্থাপন করিবার ভার নিজের হাতে লইয়া মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে,—মানুষ একলা ভগবানকে দেখিবার অধিকার হারাইয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সামাজিক আলোচনায় মতদ্বৈধ থাকিবেই, তাই 'ডাকঘর ও অচলায়তনে'র ভিতর যে সামাজিক তত্ত্ব আছে, তাহা অনেকে অস্বীকার করিবেন—সে সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলা অপ্রয়োজনীয়।

'রাজায়' অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আলোচনা

কিন্তু 'রাজায়' সামাজিক তত্ত্বের আলোচনা হয় নাই, 'রাজায়' আরও মহৎ ভাব ও গভীর তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে। মরিস মেটারলিঙ্ক ভাবিয়াছিলেন, আধুনিক নাটক মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিবে—নীতি শিখাইবে,—যে নীতি সমাজে প্রেম ও মৈত্রী আনিবে। আধুনিক নাটকের সৌন্দর্য্যের উৎস হইবে শান্তি ও আনন্দ। দুঃখ, বিফলতা, নৈরাশ্য নাটক হইতে ধীরে ধীরে লোপ পাইবে; নাটকে প্রেমের জয়ঘোষণা হইবে। তিনি ভাবিতে পারেন নাই, নাটক নীতিশিক্ষা অপেক্ষা আরও উচ্চে উঠিয়া কখনও অধ্যাত্ম-শিক্ষা দিতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজায়' সামাজিক তত্ত্বের নহে, নীতির নহে, অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে। ইহা কম শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নহে যে

একজন বাঙালী কবি নাটককে মনুষ্য চিন্তার অম্বরচুম্বিত অমল ধবল হিমাচলশৃঙ্গে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন, বিশ্বসাহিত্যকে আলো দেখাইয়া হৃদয়কে ঘন নিবিড় গভীর অন্ধকারে ঘরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

ভগবদুপলব্ধির ক্রমনির্দ্দেশ

"রাজার" ভিতরে আমার মনে হয় অধ্যাত্মবিকাশের ধারা, ভগবদুপলব্ধির ক্রম ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আত্মার যতক্ষণ মোহ আছে, ততক্ষণ সে ভগবানের দেখা পাইবে না। চাকচিক্য রূপজ মোহ, "সুবর্ণের" মত আত্মাকে মোহান্ধ করে; তবুও আত্মার ভিতরকার স্বাভাবিক ভক্তি তাহাকে ছাড়ে না, পতনের সময়েও তাহার সঙ্গী থাকে। লোভ (রোহিনী) ও অবিশ্বাস (কাঞ্চী) পতনের প্রধান কারণ,—সরল অবিশ্বাসে মুক্তি আছে, কিন্তু ভীরুতা, কাপুরুষতা, ভণ্ডামি সকলেই শাস্তি পায়। মানুষের সেই সনাতন মনুষ্যত্ব (ঠাকুর্দ্দা) যাহা তাহাকে চিরকাল সমস্ত বন্ধনের মধ্যে সহজ ও সরলভাবে ভগবানের সহিত আনন্দ যোগ স্থাপিত করে তাহাই পতন হইতে আত্মাকে রক্ষা করে। ভগবদ্ভক্তি মনুষ্য হৃদয়ের নিভৃত অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়া দেয়—অন্ধকার ঘরের দ্বার খুলিয়া দেয়। আত্মার সহিত ভগবানের নিবিড় গোপন মিলনের সময় তাহাকে পাওয়া যায় না। নিবিড় অনুভূতিতে ভক্তি দ্বৈত ভাব থাকে না। ভক্তি রাজার দাসীর মত আত্মা রাণীর সেবা করে,—রাজার সহিত আত্মার রাণীর গোপন মিলনঘরে যাইবার তাহার অধিকার নাই।

'রাজায়' ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাবের কারণ

আমি আমাদের দেশের অন্য নাটককারগণের অথবা রবীন্দ্রনাথের

অন্য নাটক সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া 'ডাকঘর' 'অচলায়তন' ও 'রাজা' সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, তাহার কারণ আমার মনে হয় এই নাটক-গুলার যুক্তি অথবা উদ্দেশ্য বিশ্বসাহিত্যে নাটকের পক্ষে একটা নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নাটককে অধ্যাত্মক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন, অধ্যাত্মসাধনার কথাগুলি নানা কথা ও ঘটনার সমাবেশে প্রকাশ করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট সম্বন্ধে যদি কেহ বলেন যে, তাহাতে তত্ত্বের একটা শুষ্ক ডোর অজ্ঞাতসারে তলায় থাকিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সে কথাটা নেহাৎ উড়াইয়া দিবার নহে, তাহা বিচার যোগ্য ; কিন্তু কেহ যদি বলেন রবীন্দ্রনাথের 'রাজার' ভিতরকার তত্ত্বটা জ্ঞাতসারে তলায় থাকে নাই তাহাহইলে উহার আলোচনা করিতে যাওয়া "রাজাকে" অবিচার করা হইবে। "রাজা" নাটকের সৌন্দর্য্য আমরা আস্বাদন করিতে পারি সেইখানে, যেখানে কবির অধ্যাত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, নানা ঘটনার ভিতর দিয়া নানা ভাব ও নানা রসের যেখানে আস্বাদন পাওয়া যায় সেখানে নহে। 'রাজা' নাটক ঘটনা-বহুল নহে। নাটকে বৈচিত্র্য থাকিলে ভাব ও রসের বৈচিত্র্য থাকা সহজ হয়। ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাবে "রাজা" সকলেরই অন্তঃস্পর্শী হইতে পারে নাই। নাটকে যিনি রাজা তিনি রঙ্গ মঞ্চে অদৃশ্য থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহেন। তিনি নিজে কোন কাজই করেন না। নাটক যে ঘটনা বহুল নহে, ইহা তাহার একটা প্রধান কারণ। ভগবানকে 'রূপ-বিবর্জ্জিত' না করিলে নাটক কর্ম্মবহুল হইতে পারিত, রাজা যদি নানারূপে পিতামাতা বন্ধু সখা পুত্রকন্যারূপে রঙ্গমঞ্চে খেলিয়া বেড়াইতেন, অথচ তিনি অরূপ ইহা ইঙ্গিত করা হইত—যেমন তিনি 'অনুপম' ইঙ্গিত করা হইয়াছে—তাহা হইলে অধিকতর ভাব ও ঘটনার সমাবেশ নাটক-টিকে আরও সহজ ও মধুর করিয়া তুলিত ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বগুলিকে

আরও সত্য ও জীবন্ত করিতে পারিত। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও মথুরা-লীলা এইরূপই ত একটা রহস্যগভীর অধ্যাত্ম নাটক। শ্রীকৃষ্ণ জীবন্ত নানারূপী বলিয়া ঘটনার অভাব নাই এবং হৃদয়ের সমস্ত ভাবগুলিই ধরা পড়িয়াছে—তাই নাটকটা পরম সুন্দর ও অন্তঃস্পর্শী হইয়াছে।

উপন্যাসে যুক্তি

উপন্যাসে যুক্তি বা উদ্দেশ্যের কথা বলিলে আমাদের সকল প্রকার সাহিত্যের কথা বলা হইবে। ফ্রান্স দেশে রাবেলে চার্চ্চকে এরূপ বিদ্রুপ করিয়াছিলেন যে তাঁহার লেখা সেখানকার ধর্ম্মসংস্কারের প্রধান কারণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে ভল-টেয়ার ফরাসী ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহার বিদ্রুপের দ্বারা চার্চ্চের বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমি অন্য এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

রুশ নভেল

তুর্গেনফ, ডষ্টইভেস্কি ও টলষ্টয়ের উপন্যাসসমূহ রুশসমাজে যে যুগান্তর আনিয়াছে তাহা সকলেরই অনুধাবন করা উচিত। সমগ্র রুশজাতির বহুশতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখ বেদনা প্রকাশ করিয়া উপন্যাস রুশিয়ায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আমি 'সাহিত্যে জনসাধারণ' প্রবন্ধে ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

চার্লস রীড ও ষ্টো

ইংরাজী সাহিত্য উপন্যাসে যুক্তি বা উদ্দেশ্যের সহিত অপরিচিত নহে। আধুনিক যুগে চার্লস রীডের অন্ততঃ দুইখানা উপন্যাস চিরস্মর-ণীয় হইয়া গিয়াছে। তিনি অনাথ, অসহায় ও পাপীদের জন্য কাঁদিতে

পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপন্যাসে তাঁহার গভীর সহানুভূতি ও বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি পাপী গরীবের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে বলিয়াছেন; জেলখানায় বা পাগলাগারদে যে বসিয়া আছে, তাহার সুন্দর চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন; সে যখন সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল তিনিও তাহার পিছনে পিছনে আসিলেন। জেলখানার ময়লা মুছিয়া গেল না, তবুও আমরা তাহাকে কাছে লইয়া বসিতে পারি। 'টমকাকার কুটির' আমেরিকায় যে যুগান্তর আনিয়াছিল তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। লিনকন মিসেস ষ্টোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, Are you the little woman that made this war? তুমি কি সেই ছোট স্ত্রীলোকটী যে এই যুদ্ধ আহ্বান করেছিলে? দাসত্বপ্রথা কি নিষ্ঠূর কি ভয়ানক তাহা আমেরিকান জাতি তাঁহার পুস্তক পড়িয়া দেখিল, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, সকলেরই মন নিমিষে পরিবর্ত্তিত হইল। স্ত্রীলোকের হাতের লেখা একখানা বই সেনাবল অপেক্ষা অধিক শক্তি দেখাইল।

নবযুগের প্রতীক্ষা

একটা ব্যাকুলতা জনসমাজের হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে, কিসের জন্য ব্যাকুলতা সে তাহা অনুভব করিতেছে না। কতকগুলি ভাব তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিতেছে। ভাবগুলি অস্পষ্ট রহিয়াছে। ভাবের প্রেরণা রহিয়াছে, তাহার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে না। একটা সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দূর হইতে কাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, এখনও সে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কাহার ডাক সুদূর হইতে অস্পষ্ট শুনা যাইতেছে, এখানকার গোলমাল সে ডাক স্পষ্ট শুনিতে দিতেছে না। একটা রক্ত নিশান হঠাৎ হাওয়ায় আকাশে উড়িয়া উঠিল। পৃথিবীর ধূলারাশি সে

নিশান দেখিতে দিতেছে না। ঘন গভীর অন্ধকারে ঐ বুঝি কাহার আলো দেখা গেল, আলো নিবিয়া যাইতেছে—অন্ধকার চারিদিকে আবার ঘিরিয়া আসিতেছে। কাহার বাঁশীর গানে চারিদিক আমোদিত উল্লসিত হইতেছে, বংশীধারীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। মানুষ ত এরূপে চিরকাল আপনার হৃদয়ের ব্যাকুলতা লইয়া অধীর। সব সময়েই ত সে বলিতেছে, ইহাতে আমার হইবে না, হইবে না, আরও ভাল, নূতন আমার চাই—সেটা নূতন আমার চাই,—সেটা নূতন, সেটা ভাল সেটা সুন্দর, সেটা অপরূপ, অনুপম—সেটা সবই; কিন্তু সেটার মূর্ত্তি কাহারও নিকট স্পষ্ট ভাবে ধরা দেয় নাই, কাহারও হৃদয়ে তাহার স্পষ্টস্ফুট মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয় নাই। মূর্ত্তি চাই, প্রকাশ চাই, প্রকাশ না হইলে স্বপ্নের মত, বুদ্বুদের মত, মরীচিকার মত সবই শূন্যে মিলিয়া যাইবে;—রূপ চাই, রূপ না পাইলে ভাবগুলি হৃদয়ে রাখা যাইবে না। সূর্য্যের প্রকাশ না হইলে সন্দেহ, অবিশ্বাস, নিরাশার কুয়াসা প্রাতঃকালকে অন্ধকারে ঘিরিয়া রাখিবে। মায়া নিদ্রা ভাঙ্গিবে না। মানুষ অজ্ঞানে অচেতন থাকিবে।

যুগ নির্দ্দেষ্টা

নিদ্রা ভাঙ্গিবে, অজ্ঞান অচৈতন্য দূর হইবে। সন্দেহ অবিশ্বাস রহিবে না। যুগ-নির্দ্দেষ্টা লোকশিক্ষক আসিতেছেন। তিনি ঠিক সময়েই আসেন, সেই শুভমুহূর্ত্তে যখন সবই তাহার জন্য প্রস্তুত, যখন সকলে কাণে কাণে চুপি চুপি একটা কি কথা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না,—তাহাদের মূক মুখে ভাষা না ফুটিলে জগতে কাজ হয় না। জগৎ কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু আগে কথা না হইলে কাজ হয় না।

যুগনির্দ্দেষ্টা না থাকিলে কি হয় তাহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস জগৎকে দেখাইয়াছে। যুগনির্দ্দেষ্টা অভাবে একটা সমগ্র জাতি উন্মত্তের মত হইল, সমাজে গোড়াপত্তন পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া দিল। শিক্ষিত ফরাসী সে প্রলয়কাণ্ড নিবারণ করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মজগতে যুগনির্দ্দেষ্টা লোকশিক্ষক দেখা গিয়াছে। বুদ্ধদেব এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যখন সকলেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

ভারতের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশেই অধিক যুগনির্দ্দেষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে। এক সময়ে আচারের অত্যাচারে ধর্ম্মের জীবনরস শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। একজন মহাপুরুষ তখন আসিয়া পথের লোককে ডাকিয়া কাণে কাণে কি কহিলেন। কেহ তাহা বুঝিল, কেহ বুঝিল না, কিন্তু সকলেই মহানন্দে মাতোয়ারা হইল, দেশ বিদেশে তাহারা ছুটিল, দেশবিদেশের লোককে মাতোয়ারা করিল। সে মহাপুরুষ—শ্রীচৈতন্যদেব। আর একদিন, সে বেশী দিন নহে, যখন সমাজের উপর পরানুকরণের কি একটা গুরুভার চাপিয়া রহিয়াছিল, সকলেরই হৃদয় সে গুরুভারে বেদনা পাইতেছিল, তখন একজন তরুণ সন্ন্যাসী সদর্পে কহিলেন—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, বল ভাই, সদর্পে বল,—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।"

সাহিত্যে যুগনির্দ্দেশ

সাহিত্যক্ষেত্রেও যুগনির্দ্দেষ্টা লোক শিক্ষক দেখা গিয়াছে। সাহিত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, নিদ্রামগ্ন ছিল, তখন অন্ধকার রাত্রে আলোক দেখাইয়াছেন—মহাত্মা রামমোহন রায়। তাঁহার পর এক যুগ কাটিয়া

গেল। পদ্যানুবাদ পদ্যানুকরণের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঔপন্যাসিক যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তিনিই আমাদের দেশের প্রথম। পাশ্চাত্য-সমাজে যুগনির্দ্দেষ্টা ঔপন্যাসিকের অভাব নাই,—আমি পূর্ব্বেই কয়েকজন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাদের অভাব, ধর্ম্মসংস্কারক যুগপ্রবর্ত্তকের। জন ওয়েসলির পর সেরূপ ধর্ম্মপ্রচারক যুগনির্দ্দেষ্টা ইউ-রোপে দেখা যায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর এক যুগ চলিয়া গেল। নবযুগ আসিল। এবার সংবাদপত্রের স্তম্ভে,বক্তৃতা- মঞ্চে,রাস্তার লোকের মুখের গানে যুগধর্ম্ম প্রকাশিত হইল। "এবার মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী",—কবি গাহিয়া উঠিলেন,পথ দেখাইলেন। সে যুগ চলিয়া গিয়াছে, তরী ভাসিয়া চলিয়াছে ; পথে ঝড় দুর্য্যোগ আসিয়াছে, এখন কর্ণধার কে হইবেন কে বলিতে পারে ? কর্ণধার না আসিলে ঝড় তুফানে তরী ডুবিবে, সুমন্দ বাতাসে জলমগ্ন হইবে, পাহাড়ের আঘাতে তরী ডুবিবে।

যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য

যুগচিন্তা প্রকাশ করা সাহিত্যের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা সাহিত্যের পরম ভাগ্য। আবার নূতন চিন্তার দ্বারা নবযুগ প্রবর্ত্তন করা সাহিত্যের পরম স্বার্থকতা, সাহিত্যসাধনার সিদ্ধি। যাহা সকলের নিকট স্বপ্নের মত প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাকে জীবন্ত সত্য করিয়া প্রকাশ করা, ইহাই সাহিত্যের সাধনা। সাহিত্যের সিদ্ধি তখনই যখন সেই প্রকাশ করা কার্য্যটা সফল হইয়াছে, যখন সমাজ সেই নূতন সত্যানুভূতির গৌরবে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

নব্য সাহিত্যের নূতন সৌন্দর্য্য

অনেকে বলিতে পারেন এ প্রকার সাহিত্যে সৌন্দর্য্যবোধকে কোথায় কোথায় আস্বাদন করিব ?

একটা মানুষ একটা কি জানিতে চাহিতেছে। একটা জাতিও কি একটা জানিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছে। সাহিত্য শুধু তোমার জন্ম নহে, সকলেরই জন্ম সেই কি একটা কথা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতা দূর করে। ঐ কথাটা যখন সকলেরই হৃদয়ের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে জাগিয়া উঠে তখন উহাকে আমরা একটা সত্য বলিয়া থাকি। আর সমগ্রভাবে, বিক্ষিপ্তভাবে নহে একটা ভাবকে উপলব্ধি করিলেই সৌন্দর্য্যবোধ হয়। যে সাহিত্য একটা ভাবকে এরূপে সকলেরই নিকট স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া নহে, সমগ্রতার ভিতর দিয়া মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়, অর্থাৎ যে সাহিত্য অখণ্ড সত্যের উপলব্ধির সহায় হয়, সেই সাহিত্যই ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। সত্যের উপলব্ধি ও সৌন্দর্য্যে আস্বাদন একই—Truth is beauty, beauty truth-এর সৌন্দর্য্যোপাসক কবি keats বলিয়াছেন—

"বাস্তবিক যে সাহিত্য পরম সত্যকে প্রকাশ করে, সে সাহিত্য পরম সুন্দরকেও প্রকাশ করে। একটা গাছে ফুল ফুটিয়াছে,—ফুলটা গাছের নিকট একই সঙ্গে পরম সত্য ও পরম সুন্দর। সাহিত্যের সৃষ্টিকে যদি শুধু সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে ভুল হইবে; গাছের ফুলের মত সাহিত্যের সৃষ্টির মধ্যে আমাদের সত্যের উপলব্ধি ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি দুইই হয়। আবার ফুলের মতই সাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ বিভিন্ন বাস্তবের মধ্যে বিভিন্ন হয়, অথচ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের সাহিত্যের মধ্যে একটা ঐক্য আছে, যেমন বিভিন্ন ফুলের নানা রং নানা গন্ধ হইলেও ফুল সুন্দর ও সুগন্ধি।

সাহিত্যে বাস্তবতা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রের' শ্রাবণসংখ্যায় (কাব্যের বাস্তবতা) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি গোড়াতেই লিখিয়াছেন, "এমন কথা কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না।" "প্রবাসীর" (আষাঢ়সংখ্যায়) 'লোক-শিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধে আমি ঐ কথাই বলিয়াছি। অন্য কেহ ঐ কথা বলিয়াছেন কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আমার প্রবন্ধকেই লক্ষ্য করিয়াছে, তাই মনে করিয়া আমি একটা প্রত্যুত্তর দিতে সাহসী হইয়াছি।

তাহা ছাড়া রবীন্দ্রবাবু সাহিত্যের ভাব ও উদ্দেশ্যসম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি বিশেষ আলোচনা ও অনুধাবন যোগ্য। আমাদের বর্ত্তমান-সাহিত্য রবীন্দ্রবাবুর মত ও আদেশানুযায়ী গড়িয়া উঠিলে তাহার উন্নতি কিরূপ সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিবার একটা প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "সাহিত্যের সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি—সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার ভার লয় নাই।" সাহিত্যের সাধনা,—আনন্দ-রস সৃষ্টি, আর সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা—সমাজকে আনন্দের দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিলে চলিবে না। প্রায়ই দেখা যায়, যখন সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে তৃপ্তিলাভ করে, সমাজ প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ হইতে আনন্দলাভ করে না, তখন সে সাহিত্য ধীরে ধীরে সমাজের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ হারাইয়া আত্মম্ভরিত্ব দোষে দুষ্ট হয়। সাহিত্যে আত্মম্ভরিত্ব দোষ প্রবেশ করিলে সাহিত্য কৃত্রিম হইবেই, তাহার উন্নতি অসম্ভব।

নানা ভাব চিন্তা অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়া সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতির পথপ্রদর্শক যুগনির্দ্দেষ্টা ভাবুকগণ। যুগনির্দ্দেষ্টাগণের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সমাজ যুগে যুগে কণ্টকময় পথ দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিককালে শিল্পী নহে, ধর্ম্মপ্রচারক নহে, সাহিত্যিকগণই যুগনির্দ্দেষ্টার কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যের চরমসাধনা হইয়াছে. যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।

যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিতে যাইলে সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত আত্মীয়তা করিতে হইবে, সাহিত্যকে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বড়লোক, দীন, মধ্যবিত্ত, লোকসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকিলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসিবে না। নানা লোকের নানা অভাব, নানা সুখদুঃখের মধ্যে না পড়িলে সাহিত্য অবাস্তব থাকিবে।

সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিষটার একটা আধার থাকা চাই,—সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্ত্তন হইতেছে ;—যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসও বিভিন্ন হইতেছে। তবুও বাস্তবের মধ্যে, একটা নিত্যতা আছে ; আর ঐ নিত্যতা আছে বলিয়া আমরা দেশ-কালপাত্র অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য-রসের আস্বাদন করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে।

কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে। সরস্বতী বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখেন নাই, রাখিয়াছেন পদ্মের উপরে। কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্য-রসের গুণে।” রস ও বস্তু, দুইয়েরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। বাস্তবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, রসেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। অথচ ঐ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। কাব্য যে গুণে স্থায়ী হয় তাহা নিত্য-রসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয়, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর গুণে। প্রত্যেক কাব্যেই যুগে যুগে দেশকালপাত্র-ভেদে আমরা অনিত্য-রসের আস্বাদন করি, ইতিহাস-বস্তুরও সাক্ষাৎ পাই। সেই কাব্য নিত্য, যে কাব্য ইতিহাসের উপাদান না জোগাইয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। নিত্য-রসস্বরূপ পদ্মের উপর সরস্বতী চরণ রাখিয়াছেন। পদ্ম কত প্রকার,—নীল, শ্বেত, রক্ত ;—বিভিন্ন বাস্তবের ভিতর দিয়া পদ্ম বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সরস্বতীচরণতলাশ্রিত সাহিত্য যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়াছে। নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম, সবই নিত্যরসের অভিব্যক্তি ; আবার প্রত্যেক মৃণাল, প্রত্যেক লতিকা,—নিত্য-বস্তুর বিকাশ।

মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে? রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, “বাস্তবের হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে।” বাস্তবকে হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দিলে সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ বিকাশ লাভ করিবে না।

লতাকে উপেক্ষা করিয়া ত ফুল ফুটে না। সাহিত্য যদি বাস্তবকে

উপেক্ষা করিয়া রস স্বষ্টি করিতে চাহে, তবে সে রস কাগজের ফুলের মত অলীক ও কৃত্রিম হইবে—সে রস হইতে কেহ তৃপ্তি পাইবে না, জীবন পাইবে না।

আসল ফুল কাগজের গাছে ফুটে না—সরস জীবন্ত গাছে বিকশিত হয়। জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব, সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে—সমগ্র জাতির হৃদয় হইতে তাহার রস সঞ্চার না হইলে সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে ফুটিয়া উঠিবে না-শুধু তাহা নহে, সাহিত্য তাহার জীবনীশক্তি হারাইয়া নীরস গাছের মত—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।

বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ফুল ফুটে। বিভিন্ন বাস্তবে এক গাছের ভিন্ন ফুল দেখা যায়। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-বিকাশসম্বন্ধে একই নিয়ম খাটে। গোলাপ গাছে জবাফুল ফুটে না, জবাগাছে শিউলিফুল পাওয়া যায় না। আবার স্থান কাল ও অবস্থাভেদে একই গাছের ফুলের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়,—ইহা শুধু বৈজ্ঞানিক কেন, লোকসাধারণও বলিবেন। সাহিত্যের পক্ষেও তাহাই। সাহিত্য স্থান কাল ও অবস্থাভেদে, ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবে বিভিন্ন সত্যের উপলব্ধি করে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যের স্বষ্টি করে।

ফুলের মধ্যে যেরূপ প্রকারভেদ লক্ষিত হয় সেরূপ সত্য ও সৌন্দর্য্যেরও প্রকারভেদ হয়। কিন্তু সবগুলিই যেমন ফুল, সেরূপ সাহিত্যের সব স্বষ্টিই সত্য ও সুন্দর। একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটী হইতে রসসঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া এককথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলিফুল ফুটাইবে তাহা হইলে তাহার

যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম্ম—বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চেষ্টাও সেরূপ ব্যর্থ হয়। সাহিত্যের সাধনা,—সত্যের ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়া সে সাধনা বিভিন্ন হইয়াছে। অথচ দেশে দেশে যুগে যুগে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরম সত্য-সুন্দরের মূর্ত্তি সাহিত্যের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিবর্ত্তনশীল বাস্তবের মধ্যে পড়িয়া সাহিত্যকে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করা সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ। অনিত্য বাস্তবের মধ্যে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে লাভ করা সাহিত্যের চরম সাধনা। শুধু লাভ করা নহে, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করাও সাহিত্যের সাধনা। হীন ও নিকৃষ্ট বাস্তব নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া মহনীয় ও সুন্দর হইয়া উঠিলে সাহিত্য-সাধনা সফল হয়। হেয় বাস্তব নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সংঘাতে পরিবর্ত্তিত হইবেই—এই পরিবর্ত্তন সংঘটনেই সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "রসের একটা নিত্যতা আছে।" আর নিত্য-রসের গুণেই সাহিত্য স্থায়ী হয়। সাহিত্যে যদি কিছু নিত্য ও সর্ব্বজনভোগ্য রস থাকে তাহার উৎস পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা রসের নিত্যতা কিছুই দেখিতে পাই না। ইউরোপে হেটায়রা-বহুল গ্রীক সমাজের সহিত মধ্যযুগের রমণীপূজার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আবার মধ্যযুগের চিভাল্‌রী আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধের বিভিন্ন আদর্শ প্রকাশ

করিয়াছে, যুগধর্ম্মের অনুযায়ী বিভিন্ন আদর্শের পূর্ত্তবিধান করিয়াছে,—অথচ এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা প্রত্যেক সাহিত্যের ভিতর যুগধর্ম্মের প্রভাব ও দেশকালপাত্রভেদকে অতিক্রম করিয়া স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ হইতে একটা নিত্য রসের পরিচয় লাভ করিতে পারি। সাহিত্যের চঞ্চল রস-স্রোতের মধ্যে সেই সনাতন পুরুষ ও নারী নিত্য ভাসমান।

সাহিত্য এরূপে অনিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে; আর নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আসে, বাস্তবের যাহা কিছু হেয়, ঘৃণ্য, নগণ্য তাহা ধসিয়া পড়ে একটা সুন্দর, মহনীয় বাস্তব গড়িয়া উঠে। এইখানেই সাহিত্যের গুরু ও শিক্ষকের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই।" রবীন্দ্রবাবু আধুনিক ভারতের একজন যুগনির্দ্দেষ্টা, আধুনিক ভারতীয় সমাজের তিনি একজন প্রধান শিক্ষক,—তাঁহার সাহিত্য আমাদিগকে এক নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতেছে—কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে আজ এ কি কথা! রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন, আর্টের কোন বন্ধন নাই;—সাহিত্য ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতির কোন ধার ধারে না,—তিনি সাহিত্যকে সর্ব্ববন্ধনবিহীন মুক্ত স্বাধীন করিতে চাহেন।

কিন্তু এ প্রকার সাহিত্য কি মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে? যে সাহিত্যের সহিত মনুষ্য-জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কোন সম্বন্ধ নাই, সে সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে সত্য, বিচিত্র মধুর

রস উৎপাদন করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মানুষের আত্মার নিকট সে সাহিত্য মূঢ়—নির্ব্বাক্।

এইখানেই প্রভেদ। তাহা ছাড়া তানসেনের সুর যে শুধু আনন্দেরই সৃষ্টি তাহাই বা কি করিয়া বলি? তানসেন কি আকবরের সভাকে একবারেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তিনি কি সভার নিয়ম ছাড়িয়া শুধু কি নিজের প্রকৃতি দিয়া বিশ্বের সহিত আপনার যোগ অনুভব করিতেন? আকবরের সভা তানসেনের জন্য নিয়মকানুন বাঁধিয়া দিয়াছিল, তানসেনকে একা অব্যবহিতভাবে বিশ্বের সহিত যোগ উপলব্ধি করিতে দেয় নাই। বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একান্ত বাস্তব ছিল না। তাই লোকসাধারণের প্রকৃতি তাঁহার সুরের সহিত আত্মীয়তা প্রবেশ করে কিনা তাহার জন্য কোন চিন্তাই করেন নাই। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "তানসেন তৈরি বলিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মৎলবে সে আর কিছু হইতে পারেই না।" তানসেন মেঠো সুর তৈয়ারী করেন নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সুর যে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট তাহা কি করিয়া বলিব? তানসেন গাহিতেছেন, অন্য লোক তাঁহার সুর গ্রহণ করিতেছে কি না; তাহাতে অনুভব করিতে পারে না;—লোকসাধারণের সাধনার অভাবকে ইহার দায়ী করিলে চলিবে না; তানসেনের গান কেন অবাস্তব তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বিশ্বের সহিত তাহার আত্মীয়তা যে সুরের দ্বারা সদাসর্ব্বদাই অনুভব করিতেছে, সে সুরকে তানসেন স্পর্শ করিতে পারেন নাই; গোবিন্দদাসের গান, রামপ্রসাদের গান মেঠো সুর—সেই সুরকেই জাগাইয়া দেয়—সেই সুরই একান্ত বাস্তব এবং সেই জন্যই তাহা সার্ব্বজনীন।

আজকাল আমাদের দেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে এই মেঠো সুরের পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা বাস্তব বলিয়া সাধারণের অন্তরতম প্রাণকে আন্দোলিত করিতে পারে নাই। সাহিত্যে আজকাল ভাঁজা সুরের প্রাচুর্য্য—কবিগণ বলিতেছেন, লোকসাধারণ! শিক্ষালাভ করুক, সাধনা করুক তবেই তাহারা সুর বুঝিতে পারিবে। সাহিত্য ক্রমশঃ অবাস্তব হইতে চলিয়াছে, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানে না থাকিয়া সাহিত্য এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন করিতেছে। সাহিত্যের এখন ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু জীবন নাই, সাহিত্য জীবন দিতে পারিতেছে না।

এখনকার এই হেয় ঘৃণ্য 'বাস্তবের মধ্যে পড়িয়া দেশের সাহিত্য নিত্যরস ও নিত্য-বস্তুকে পাইবার জন্য সাধনা করুক। নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করিয়া বাস্তবের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আনুক, বাস্তবের মধ্যে তখন যাহা কিছু হেয়, অনিত্য ঝরিয়া পড়িবে, যাহা কিছু সুন্দর, মহনীয়, নিত্য তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু প্রকাশের দ্বারা সাহিত্য বাস্তবের পরিবর্ত্তন সাধনের ভাব লউক, সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টারের ভাব মাথায় পাতিয়া বরণ করুক।

সাহিত্য যে ইস্কুল মাষ্টারির ভাব লইবে, সমাজেরও দীক্ষাগুরু হইবে ইহা ঠাট্টা বা বিদ্রূপের বিষয় নহে। . সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য, সাহিত্যের চরম সার্থকতা যদি সে সমাজের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে। খৃষ্ট, সেণ্ট পল, বুদ্ধ, চৈতন্য সমাজের গুরু হইয়াছিলেন, এখন সাহিত্যিকগণ গুরু হইতেছেন,—কার্লাইল, রাস্কিন, টলষ্টয় সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষার ভার লইয়াছেন। মরিস মেটারলিঙ্ক ত স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, আধুনিক নাটক ত আর কিছুই করিবে না, সমাজের আধুনিক নীতির সমস্যাগুলির আলোচনা ও মীমাংসা করিবে, সমাজের গুরুগিরি

করা ভিন্ন তাহার অন্য কোন ভাব নাই। বার্ণাডশ টলষ্টয়কে একটা চিঠি লিখিয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—"I am not an Art, for Art sake man, and could not little finger to produce to work of art if I thought there was nothing more than that in it."

শুধু বার্ণার্ডশের নাটক কেন, আধুনিক নাটকমাত্রেই গুরুগিরি করিতেছেন। জার্ম্মাণ-নাটকের সমাজের গুরুস্থান অধিকারের কথা আমি অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। শুধু নাটক কেন, নভেল উপন্যাসও ইস্কুল মাষ্টারির ভার হাতে লইয়াছেন। রুশ-সমাজকে রুশ-নভেল কি ভাবে নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিয়াছেন তাহা আধুনিক সাহিত্য-জগতে একটা স্মরণীয় বিষয়! আমি এ সম্বন্ধেও অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাহিত্য, সমাজের গুরুস্থান অধিকার করিয়া আপনার শক্তি আবার নূতন করিয়া চিনিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবু নিজে যাহাই বলুন না কেন, রবীন্দ্র সাহিত্যে আধুনিক সমাজের যে ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। রবীন্দ্র বাবুর 'রাজা,' 'ডাকঘর,' 'গোরা' আর্ট হিসাবে পরম সুন্দর নহে; কিন্তু তাহাদের ভিতরকার তত্ত্ব বা যুক্তি অতি গভীর ও সুন্দর; রবীন্দ্র বাবু ঐ বইগুলিতে সমাজের কয়েকটি জটিল সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রবীন্দ্রবাবু শিক্ষকের ভার লইয়াছেন এবং অতি নিপুণভাবে সে গুরুভার বহন করিয়াছেন, তাই বই-গুলিতে আর্ট হিসাবে যাহা কিছু দোষ আছে তাহাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, আমাদের দৃষ্টি পড়ে রবীন্দ্রবাবুর উপদেশের দিকে। ডাক-ঘর বা গোরা যখন পড়ি তখন আমরা একজন শিল্পীর প্রস্তুত দ্রব্য ভাল লাগিল কিনা তাহা বিচার করিতে বসি না। আবার রবীন্দ্রবাবু সময়ে

সময়ে কড়া ইস্কুল মাষ্টারি করিতে ছাড়েন না। 'অচলায়তনে' রবীন্দ্র বাবু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড লইয়া সমাজকে কষাঘাত করিতে সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। ইস্কুলে বেত্রাঘাত উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু সময়ে সময়ে সে বেত্রাঘাত যে ছাত্রের পক্ষে কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন প্রভৃতিতে যে গভীর তত্ত্বসম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি অন্য এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাস্তবিক রবীন্দ্রবাবুর আধুনিক নাটক ও নভেল যে লোককে শিক্ষা দিবার কোন চিন্তাই করে নাই ইহা বলিলে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভাকেই খর্ব্ব করা হইবে।

জগতে সেই সব কাব্য ও সাহিত্যের আদর, যে কাব্য সাহিত্যে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে,—শুধু সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে নাই। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী কেহ পাঠ করে তাঁহার শকুন্তলার ইস্কুল মাষ্টারির কথা রবীন্দ্রবাবু নিজে যে ভাবে বলিয়াছেন অন্য কেহ তাহা বলিতে পারে না। গেটের সরোস্ অফ্ ওয়ার্থর কয়জন পড়েন? তাঁহার ফাউষ্টের শিক্ষায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছেন—ফাউষ্টের আদরের সীমা নাই। আমাদের সাহিত্যে এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন হইতেছে, রচনা ও কাব্যবিন্যাসের পারিপাট্য খুব দেখা গিয়াছে,—কিন্তু গভীর চিন্তা ও উচ্চপ্রকার ভাবুকতার অভাব হইয়াছে, ইহাতে আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। শুধু তাহা নহে ভাষার পারিপাট্য ও শিল্পচাতুরীর দিকে অধিক ঝোঁক পড়াতে আমাদের সাহিত্যে কৃত্রিমতা আসিয়াছে, সাহিত্য আভিজাত্য-গৌরবে গঠিত হইয়াছে, সাহিত্য লোকসাধারণের অন্তঃস্থল হইতে দূরে আসিয়াছে। এই সময়ে যদি এমন একটা যুক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া যে সাহিত্যে শুধু আনন্দের সৃষ্টি করিবে, আপনার রূপ মাধুরীতে আপনি মুগ্ধ থাকিবে, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি ভোগ করিবে

পরকে ঐশ্বর্য্য বিলাইবার চিন্তা করিবে না, লোকসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই, সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই, লোকসাধারণের বা আর কোন উদ্দেশ্যে সে আর কিছু হইতে পারে না, —তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য, সমাজ হইতে আরও দূরে আসিবে আরও "অবাস্তব" হইবে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের সমাজ ও আমাদের সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা নিশ্চিত।

যতদিন না আমাদের সাহিত্য এই হেয় জঘন্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু,—পরম সত্যকে পাইবার জন্য সাধনা না করিবে, রচনা ও ভাবব্যঞ্জনার পারিপাট্য, শিল্পনৈপুণ্য, আপনার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার দূর না করিবে, ততদিন আমাদের সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি নাই সমাজের মঙ্গল নাই ; আমরা সত্যের উপলব্ধি করিব না, সৌন্দর্য্যের বিকাশও দেখিব না। বাস্তবকে ছাড়িয়া দিলে আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। নানা লোকের নানা ভাব, নানা লোকের নানা সুখ দুঃখ, নানা কালের নানা অভাব অভিযোগ লইয়া বাস্তব—অনন্তরূপী মহাবিষ্ণুর মত বাস্তব। মহাবিষ্ণুর নাভিপ্রদেশ হইতে মৃণাল উঠিয়াছে, —নিখিল সৌন্দর্য্যের আধার মহাপদ্ম অনন্ত বাস্তবের অন্তঃস্থল হইতে উদ্গত। মহাপদ্মের উপর বসিয়া রহিয়াছেন স্রষ্টা—কবিং পুরাণমনুশাসিতারং ; আর তাঁহারই অঙ্কশায়িনী মহাসরস্বতী,—জ্ঞান-সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী, নিখিল-সাহিত্য-জননী।

সাহিত্য ও স্বদেশ।

"সবুজ পত্রে"র মাঘ-সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমার সাহিত্যে বাস্তবতা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতিবাদে বস্তু-তন্ত্রতা বস্তু কি? বলিয়া নিজেই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

এইরূপে বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ হয়; "প্রবাসীর" আষাঢ়-সংখ্যায় লোক-শিক্ষক বা জননায়ক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম,—বর্ত্তমান সাহিত্য, বিশেষতঃ রবীন্দ্র- সাহিত্য লোক শিক্ষার ভার লয় নাই ; সাহিত্যে শুধু শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন হইতেছে; এই কারণে সাহিত্য ক্রমশঃ কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্র বাবু শ্রাবণ মাসেই সবুজ পত্রে বাস্তব নামক প্রবন্ধ লিখিলেন; তাহাতে তিনি বলিলেন, সাহিত্য লোকশিক্ষার ভার লয় নাই; ইস্কুল মাষ্টারী সাহিত্যে লোকশিক্ষার ভার লয় নাই; ইস্কুল মাষ্টারী সাহিত্যের কাজ নহে, ইস্কুল মাষ্টারী করিতে হইলে সাহিত্যকে বাস্তবকেই আশ্রয় করিতে হইবে, আর বাস্তবের হট্টগোলের মধ্যে পড়িয়া কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। এই মতের প্রতিবাদ করিয়া আমি সাহিত্যে বাস্তবতা প্রবন্ধ লিখিলাম।

প্রমথ বাবু তাঁহার বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি? প্রবন্ধে আমার আসল কথা-টাই মানিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, সাহিত্যের সৃষ্টি সে যাহা তাহাই, লোকসাধারণের শিক্ষা বা সমাজের আর কোনও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রমথ বাবু তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কবি, আর্টিষ্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক—কেন না তাঁরাই মানবসমাজে যথার্থ প্রাণের সঞ্চার করেন।" উহাই আমার আসল কথা। বাদীর পক্ষের উকীল প্রতিবাদীর সহায়।

কিন্তু মতদ্বৈধ হইল আর এক বিষয় লইয়া। সাহিত্য মানব-সমাজের শিক্ষকের কাজ করে, তাহা মানিয়া হইয়া প্রমথ বাবু বিশদভাবে কবির মন ও মানব সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আমার একটা মত কল্পনা করিয়া লইয়া, সেই কল্পিত মতের খুব আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—রাধাকমল বাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত শতাব্দীর materialismএর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বই আর কিছু নয়।" প্রথমতঃ বলিয়া রাখা উচিত, 'বস্তুতন্ত্রতা' কথাটা আমি এই আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্যবহার করি নাই ; সে যাউক ; কারণ, প্রমথ বাবু বিষ্ণুপুরাণ , রামানুজ-ভাষ্য শঙ্কর-ভাষ্য হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বস্তুতন্ত্রতার আলোচনা করিয়া, শেষে Realism এরই পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে ভাবে বাস্তবকে দেখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমার মিল তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্র বাবু যে বাস্তবকে হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন তাহার সঙ্গে প্রমথ বাবুর সম্পূর্ণ মতবিভিন্নতা! এ ক্ষেত্রেও প্রতিবাদীর সহায়।

কিন্তু প্রমথ বাবু এই প্রসঙ্গে ভাবিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, কবির মন বাস্তবের সম্পূর্ণ অধীন ; এবং কবি সামাজিক মন ও যুগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াই আপনার সাহিত্য রচনা করেন। আমি তাহা কোথাও বলি নাই ; বরং আমি ইহাই বলিয়াছি যে, কবির সাহিত্যের সাধনা— আপনার জীবনের দ্বারা বাস্তবকে নবজীবন দেওয়া, বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া বাস্তবের অতীত হওয়া। কবি যে শুধু সমাজের ফরমায়েস খাটিবেন ইহা বলি নাই। আমি বলিয়াছি যে, কবি সমাজের মনিব হইয়া শুধু হুকুম করিতে পারিবেন না। কবির সঙ্গে সমাজের জীবনের সম্বন্ধ। কবির সহিত সমাজের প্রেমের আনন্দযোগ। এক দিকে কবি যেমন পারি-

পার্শ্বিক সমাজের বাহ্ শক্তি হইতে আপনার জীবনীশক্তির সংগ্রহ করেন, আর এক দিকে সমাজও তেমনই কবি প্রতিভা হইতে আপনার প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে। কবির সঙ্গে সমাজের দেনা-পাওনার সম্বন্ধ নহে। কবি ও সমাজের প্রাণের সম্বন্ধ; দেনা-পাওনার হিসাব, হুকুম ফরমায়েসের দিক্ হইতে এ সম্বন্ধের বিচার হয় না।

আমি যখন বলিয়াছি, "সাহিত্যের চরম সাধনা হইতেছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা", তখন আমি যে সাহিত্যকে সমাজের হুকুম তামিল করিতে বলিতেছি, তাহা নহে। অথচ প্রমথ বাবু, আমি তাহাই বলিয়াছি, এ কথা কেন ভাবিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। প্রমথ বাবু লিখিয়াছেন, আমি সাহিত্য-তত্ত্বকে সমাজতত্ত্বের একবারে অন্তর্ভূত করিতে চাহিয়াছি, "কবিপ্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়, স্বকালের অধীন করিতে চাহিয়াছি।" যুগধর্ম্ম প্রকাশ করার অর্থ,—যুগস্রোতে গড্ডালিকা-প্রবাহের মত ভাসিয়া যাওয়া; প্রমথ বাবু ইহা কোথা হইতে পাইলেন? তাহা ছাড়া নবযুগ আনয়ন করিতে হইলে নূতন-পুরাতন স্বদেশ-বিদেশের অনুকূল ও প্রতিকূল আদর্শের যে সমন্বয়-বিধান আবশ্যক, তাহা "স্বদেশ ও স্বকালের সম্পূর্ণ অধীন" থাকিলে কিরূপে সম্ভব? প্রমথ বাবু কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "সাহিত্যের কর্ত্তব্য তখনই সম্পাদিত হইবে, যখন সাহিত্য যুগের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনিচয়ের মধ্যে আপনার নিজের শক্তি ও ভাবুকতার দ্বারা একটা সমন্বয়বিধান করিতে পারে; অনুকূল শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও প্রতিকূল শক্তিকে ত্যাগ করিয়া যুগধর্ম্ম ইঙ্গিত করিতে পারে, এবং সামাজিক নবযুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতে পারে।" নবযুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে গেলেই বর্ত্তমান বাস্তব ও বর্ত্তমান যুগকে বাধ্য

হইয়া খানিকটা অতিক্রম করিতেই হইবে। সুতরাং আমার এই মতের সঙ্গে ইউরোপীয় গত শতাব্দীর materialism-প্রসূত সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত সাহিত্য-তত্ত্বের মিল তিনি কি করিয়া বাহির করিলেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। এ যে Ireland এ সাপ নাই, ইত্যাদি সমালোচনার পরাকাষ্ঠার মত!

প্রমথবাবু এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথার অবতারণা করিয়াছেন। সেগুলির আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তিনি যুগধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, একই যুগে নানা পরস্পর-বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম্ম নাই। ইহার উত্তর দিতে গেলে বলিব, মানুষের যেমন একই কালে নানা পরস্পরবিরোধী ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সকলেরই আধার ও আশ্রয়স্বরূপ যেমন তাহার চরিত্র, সেইরূপ সমাজের বিভিন্ন মতামত ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনিচয়ের মধ্যে এরূপ একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে, যাহা সকলেরই আধার ও আশ্রয়, অথচ সকলেরই অতীত। ব্যক্তির চরিত্রগঠনের মত দেশের পক্ষে যুগধর্ম্ম-বিকাশ তাহার সাধনার লক্ষ্য। চরিত্রগঠন না হইলে ব্যক্তি-জীবন যেমন চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা পায় না, ঠিক সেইরূপ যে সমাজ তাহার যুগধর্ম্ম এখনও ধরিতে পারে নাই, সে সমাজও বিভিন্ন ভাব ও চিন্তার আলোড়নের মধ্যে আপনার ধ্রুব আদর্শ লাভ করিতে না পাইয়া অশান্তি ও চাঞ্চল্যের মধ্যেই জীবন কাটায়। যুগধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে সমাজ সহজ ও সরল ভাবে সংশয় ও চাঞ্চল্যের অতীত হইয়া তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হয়, নানা ভাবের বিপরীত শক্তির মধ্যে সে অত্যন্ত সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সে পথে ধাবিত হয়। প্রতিভাই যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত করিতে পারে। যাহা সমাজের অন্তরে ও বাহিরে চলিতেছে, অথচ যাহা

অস্পষ্ট, তাহাদের একটা পূর্ব্বস্ফুট মূর্ত্তি প্রকাশ করা, বাহিরের আবরণ দূর করিয়া তাহাদের আসল প্রাণকে প্রকাশ করা, প্রতিভা ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রতিভা আত্মশক্তির দ্বারা যুগের বিপরীত ভাবকে অতিক্রম করিয়া, প্রতিকূল ভাবসমূহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, সমাজকে সন্দেহ, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের অতীত করিয়া দিতে পারে। যুগধর্ম্মের ভিতর যুগের সমস্ত অস্ফুট শক্তি প্রকাশ পায়; আসল সত্যসমূহ তাহাদের আবরণ খুলিয়া আপনাদের সহজ ও সরল মূর্ত্তি খুঁজিয়া পায়। এইরূপে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া সমাজকে তাহার সোজা ও সহজ আদর্শের পথ দেখাইয়া দিয়া তাহার জীবন-গঠনের সহায় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রমথবাবু সামাজিক মন বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার করেন না। সামাজিক মন একটা abstraction—অলীক কল্পনা নহে; ইহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ইহা ব্যক্তির মনের সমষ্টি নহে। ইহাও ব্যক্তির মনের মত সত্য। যিনি অয়কেন হইতে এতবার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি আর একটু অধিক খুঁজিলেই সামাজিক মনকেও সেখানে পাইতেন।

আসল কথা হইতেছে, যাঁহারা সাহিত্যের বন্ধনবিহীনতার ধুয়া ধরিয়াছেন, তাঁহারা যুগধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, সামাজিক মনের প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ যে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন না!

রবীন্দ্রবাবুর—(ক) সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনও চিন্তাই করে না; কোনও দেশেই সাহিত্য স্কুলমাষ্টারীর ভার লয় নাই; এবং (খ) সাহিত্যের সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি; শিক্ষা, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজের মৎলবে সে আর কিছু হইতে পারে না; এবং প্রথম বাবুর—(ক) যুগধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই, এবং সামাজিক মন—সে ত একটা

mere abstraction,. এবং (খ) সাহিত্য-জগতে দেশভেদ নাই, কেন না, মনোজগতের ভূগোল পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়; "দেশ-মাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে কবিপ্রতিভা বিদেশ হইতেই স্তন্য পাইবে" এই কয়টা কথা মিলাইলেই আমাদের সন্দেহ থাকিবে না যে, সমাজের সহিত যুগযুগান্তকালের বন্ধন ছিঁড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধে এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে। কাব্য বল, দর্শন বল, নীতি বল, ধর্ম্ম বল, সকলেরই আধার ও আশ্রয় সামাজিক মন। সামাজিক মনকেই আশ্রয় করিয়া তাহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ; অথচ সামাজিক মন তাহাদিগকে চাপিয়া রাখে না, তাহাদের আত্মশক্তির বিকাশসাধন করিয়া বরং তাহাদিগকে আপনাকে অতিক্রম করিতে শিখাইয়া সার্থক হয়। এই সত্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সৃষ্টি-ছাড়া মত গড়িয়া তুলিতেছেন,—"সাহিত্য হইতেছে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম্ম, সেখানে দেশভেদের ব্যবধান অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং সমাজ, সে ত অচল নিগড়বদ্ধ কারাগার। সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হইতেছে মানুষের হাতে-গড়া সমাজের প্রাচীর কারাগার অচলায়তন প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া একবারে ধূলিসাৎ করা, এবং ভগবানের ও ইতিহাসের হাতে গড়া ভৌগোলিক ব্যবধান সব দূর করিয়া ফেলা। শুধু মত গড়িয়া তোলা নহে, সাহিত্যও এরূপ গড়িয়া উঠিতেছে, কারণ, সাহিত্য হইতেছে জীবনের প্রকাশ।"

এরূপ সাহিত্যে কি সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে? এরূপ সাহিত্য কি আসল সাহিত্য? এরূপ সাহিত্যের জীবন কি আসল জীবন —সত্য, সরল, অকৃত্রিম? তর্কের দ্বারা এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া কঠিন। এ সকল প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা করিবেন দেশমাতা। বর্ত্তমান যুগের দেশমাতা নহেন, যাহা তিনি হইবেন, যাঁহার স্তন্য-পীযূষ. বর্ত্তমান কবিপ্রতিভা পরিত্যাগ করিল।

নব-নাগরিক সাহিত্য

সাহিত্যের অধিকার

সাহিত্যক্ষেত্রে এখন একটা মত বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে সাহিত্যে সকলের অধিকার নাই। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না, আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সহিত আমাদের লোকসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দূরে থাক ক্রমশঃ বরং অপরিচয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নূতন মত অনুসারে দোষটা হইতেছে, অশিক্ষিত লোক সাধারণের, শিক্ষিত লোকের সাহিত্যের নহে। লোকসাধারণের স্বল্প বুদ্ধি ও অল্প জ্ঞানের যোগাযোগে যে আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই, ইহা এই নূতন মতাবলম্বীদিগের নিকট বরং গৌরবের বিষয়। লোকসাধারণের সহিত যোগাযোগে এ সাহিত্য গড়িয়া উঠিলে তাহা কখনও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হইত না। এবং বিশ্বমানবের নিকট তাহা মর্য্যাদা লাভও করিত না।

ইঁহারা লোকসাধারণকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেছেন, তোমাদের স্পর্দ্ধা ত কম নহে, তোমরা আমাদের সাহিত্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের না আছে বুদ্ধি, না আছে জ্ঞান। ' তোমাদের জন্য রূপকথা, উপকথা, যাত্রা আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস রহিয়াছে; কাব্য-সাহিত্যে তোমাদের অনধিকার। কাব্য সাহিত্য ত কল্পনা জল্পনা নহে, যে তোমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। সাহিত্য আরও উচ্চ অঙ্গের, সাহিত্যকে বুঝিতে যাইবার পূর্ব্বে তোমাদের অনেক শিক্ষা ও সাধনা চাই।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সাহিত্য

আমরা কৃতবিদ্য তোমরা মূর্খ। আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, তোমরা শূদ্র। শাস্ত্রের মত সাহিত্যে আমাদেরই কেবল অধিকার, তোমাদের অধিকার নাই।

আমরা অধিকার ভেদ মানি। আমরা ইহাও মানি সাধনার দ্বারা সকলেই উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারে। হিন্দু-সমাজ যখন সজীব ছিল তখন শূদ্রও সাধনার বলে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিতে পারিত। বর্ত্তমান আলোচনায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে অধিকারভেদের কথা উঠিয়াছে তাহা অন্য রকমের।

লোকসাধারণ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেই যে নব্য কাব্য-সাহিত্য আয়ত্ব করিতে পারিবে তাহা নহে। শিক্ষা ও সাধনার বৈষম্যের উপর সাহিত্য চর্চ্চার বর্ত্তমান অধিকারভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

অধিকারভেদের কারণ

বাংলা সাহিত্যে অধিকারভেদ কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে না। দেশের লোক বহুকাল হইতে এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৈয়ারী সাহিত্য। আমাদের সাহিত্যিকগণ,—ইংরাজী শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত, যাঁহাদেরকে আমরা সচরাচর কৃতবিদ্য বলিয়া থাকি। দেশের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের কৃতবিদ্যগণ এক দিকে যেমন ইংরাজী অথবা ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে সাহিত্যের রস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, আর একদিকে লোকসাধারণের সহিত ভাববিনিময় ত্যাগ করিয়া সাহিত্যে দেশীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা Ivanhoe পাঠ করিয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে বসিলাম, Milton পড়িয়া মেঘনাদ বধ লিখিলাম। Shakespeare ও Moiere পড়িয়া আমরা নাটক লিখিতে লাগিলাম, Shelley পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র কবিতায় গা ঢালিয়া দিলাম। ইউরোপীয়নবিশ লেখকদিগের হাতে পড়িয়া বাংলাসাহিত্য স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর আদর্শ বাঙ্গালী লেখকদিগের রচিত সাহিত্যে বিদ্রূপের বিষয় হইল। সেই তখন হইতে ইংরাজীর অনুবাদ যেমন সাহিত্যে সাধুভাষা বলিয়া গৃহীত হইল, সেরূপ ইংরাজী আদর্শের নকল সত্য বলিয়া সাহিত্যিক সমাজ গণ্য করিতে লাগিল।

সমাজ-তত্ত্বে নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য

বাঙ্গালী জাতির প্রাণ আছে। তাই ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী সাড়া দিয়াছে, একবারে জড় অচেতনের মত থাকে নাই। সাড়া পাওয়া গিয়াছে ঠিক, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সাড়া পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালীর দর্শন, সমাজ-তত্ত্ব, রাষ্ট্র-নীতি, ধর্ম্ম-তত্ত্বের ভিতর ইউরোপীয় ভাবসমূহ ও দেশের ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ ভাবসমূহের একটা সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইতেছে। আমাদের দার্শনিকগণ, আমাদের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতিকূল ভাবপ্রবাহের মধ্যে আমাদের জাতির জন্য একটা গন্তব্য পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছেন। প্রতিকূল আদর্শের মধ্যে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের আদর্শ কিছু জানিতে পাইয়াছি।

সাহিত্যে ইউরোপীয়-নবিশি

কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে আমরা এখনও যথোচিত সাড়া দিই নাই।

নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য আমরা খণ্ড কবিতায় কিছু করিয়াছি সত্য। কিন্তু গল্পে, উপন্যাসে, নাটক নভেলে আমরা শুধু নূতন লইয়া খেলা করিতেছি মাত্র। আমরা এখনও ইউরোপীয়-নবিশির আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমরা এখনও অ্যানা ক্যারেনিনার (Anna Kareninaর) মোহে—'চোখের বালিতে' দেশের মনের সম্পূর্ণ বিরোধী নায়ক নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র আঁকিতেছি, "স্ত্রীর পত্রে" ও "নারীর মূল্যে" ইবসেন (Ibsen) এর মত প্রচার করিতেছি, এবং মত প্রচার করিতেছি, এবং রেসারেক্‌সন্‌কে (Resurrection) বাঙ্গালী সমাজে আনয়ন করিতেছি। আলফণসো ডডে (Alphonse Daudet) ও গিদো মোঁপাসা (Guyde Maupassant) বর্ত্তমান নব্য-সাহিত্যিক দলের গুরু হইয়াছেন।

অবান্তর সাহিত্য

ইহাঁরা ভাবিতেছেন, ইহাঁরা যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন তাহা আসল সত্য ও সুন্দর, তাহাতে সমাজের মিথ্যা আচার ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, সমাজের কদর্য্য অনুশাসন সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধ করে না।

সেখানকার জীবন একেবারে স্বাধীন, বাধা বন্ধনহীন, নিত্য সরস, নবীন, সবুজ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহারা যাহা আঁকিতেছেন, তাহা ছবি মাত্র, জীবন নহে। তাহা শুধু স্বাধীনতা, শুধু বন্ধন-বিহীনতা, তাহা শুধু একটা mere abstraction, অলীক কল্পনা,—সমগ্র জীবনের সহিত তাহার যোগাযোগ নাই। একটা টবে পোতা গাছের মত যাহা বিদেশী রস সিঞ্চনে সঞ্জীবিত, তাহা সরস, সবুজ, নয়নমুগ্ধকর হইতে পারে সত্য

কিন্তু দেশের মাটি জীবন্ত গাছের মত দেশের সমগ্র জীবনের সহিত তাহার যোগাযোগ না থাকাতে সে যেমন চিরজীবন বিফল থাকিয়া যায়, সেরূপ বর্ত্তমান নব্য-সাহিত্য আভিজাত্য দোষদুষ্ট হইয়া জাতীয় জীবনের নিকট নিষ্ফল হইতেছে।

আসল কথা হইতেছে কয়েকটা স্বাধীনতা ও আত্মকেন্দ্রতার অলীক কল্পনা abstractions লইয়া ছবি আঁকা যায়, কল্পনা জল্পনা করা যায়, কিন্তু তাহাদের লইয়া জীবন চলে না। জীবন মানেই যোগাযোগ। ফুল হঠাৎ আকাশে ফুটিয়া উঠে না, ফুলের সহিত গাছের পাতা, শাখা, প্রশাখা, মূল ও শিকড়ের সম্বন্ধ আছে। জীবনের সঙ্গে সেইরূপ সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের যোগাযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবন কখনই নির্লিপ্ত হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করে না। জীবনের প্রকাশ যোগাযোগের ভিতর দিয়া। মনুষ্য জীবনে এই যোগাযোগের অবলম্বন হইতেছে, জাতি বা সমাজ, ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ ও ক্রমবিকাশমান জাতি বা সমাজ।

বিদেশীয় সভ্যতার কয়েকটা abstractions মাত্র অবলম্বন করিয়া যেমন জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না, জীবনকে যেমন দেশেরই ইতিহাস ও দেশেরই সমাজকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিতে হয়, সেইরূপ সাহিত্য ও দেশের জীবনের সহিত যোগাযোগ ত্যাগ করিয়া বিদেশী জীবনকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিতে পারে না। আসল সাহিত্য জাগিয়া উঠে একটা সত্য, স্পষ্ট, concrete জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া। যেখানে শুধু কয়েকটা abstractions-এর লীলাখেলা, একটা পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গ সমন্বিত জীবনের প্রকাশ নাই, সেখানে সাহিত্য ও লীলাময়, সদা-চঞ্চল, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল। সেখানে সাহিত্য আমোদ দেয়, আনন্দ দেয় না, চমক লাগায়, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে না।

সাহিত্যে abstractions বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনা লইয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের 'গোরা'। প্রত্যেক চরিত্র সেখানে মানুষ নহে, একটা ভাবের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তাহাদের ভাব ও বক্তৃতার বিশ্লেষণের ধূমে মানুষগুলা ছায়াময় হইয়া গিয়াছে। এই "গোরা"ই হইতেছে নব-নাগরিক সাহিত্যের কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

আভিজাত্য-দোষ

বর্ত্তমান নব-নাগরিক সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ অনেকটা বলা যায় যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কয়েকটা কল্পনা, সুতরাং তাহার পক্ষে অবাস্তব ভাব লইয়া উহা বিকাশ লাভ করিতেছে। এতকাল, আমরা শুনিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যে কতকগুলি বিদেশীভাব আসিতেছে। বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষের মধ্যে একপ্রকার ভাবের প্রতিপত্তি লাভ করা বিচিত্র নহে। এখন আমরা শুনিতেছি, আসল সত্য ভাব হইতেছে এইগুলাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্যতত্ত্বও জাগিয়া উঠিতেছে, যে সাহিত্যে এই সকল ভাবের প্রকাশ তাহা লোকসাধারণ আয়ত্ত করিতে পারিবে না। তাহাই উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, এবং তাহাতে লোকসাধারণের অধিকার নাই। লোকসাধারণ এই ভাবসমূহের সাধনা না করিলে এ সাহিত্য বুঝিবে না। চা'র আস্বাদ যাহারা জানে না তাহাদের নিকট চার গুণগান করার মত taste create করিবার এই প্রয়োজন।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের বিরোধ

বর্ত্তমান নাগরিক সাহিত্য দেশের concrete বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে নাই। বিদেশী সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া সে আপনার কল্পনার দ্বারা একটা অবাস্তব জীবন তৈয়ারী করিয়াছে।

কল্পনার দ্বারা একটা খাপছাড়া অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন তৈয়ারী করিয়া সে তাঁহাকেই চরম সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছে। আমাদের নাগরিক সাহিত্যে নাটক নভেলের কথাবার্ত্তা তাই ঠিক যেন Drawing room, parlour এর table-talk বিলাতীধরণের বাক্যালাপ, ঘটনাসমাবেশ বিলাতী ধরণের মত অপ্রত্যাশিত, full of surprises, চরিত্রগুলি একগুঁয়ে, স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, পরিবার বা সমাজ-ধর্ম্মকে আপনার স্বার্থের মূল্য দ্বারা একেবারে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের নাগরিক সাহিত্য নাগরিক জীবনের মত দেশের প্রকৃত ও সহজ জীবন হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া দেশের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। দেশের জীবনের সহিত সাহিত্যের এই বিয়োগ আমাদিগের নিকট আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে, কারণ আমরা এতকালের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের দ্বন্দ্বের পর একটা সমন্বয় সাধনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। নব্য-সাহিত্য এক্ষণে সে সমন্বয় সাধনের পথ ত্যাগ করিয়া বরং পশ্চিমমুখোপথ অবলম্বন করিয়াছে।

ইহার ফল একদিক হইতে দেখিতে গেলে মন্দ নহে। আমরা বিলাতী, ফরাসী,—জাপানী জীবনের আস্বাদ সাহিত্যের ভিতর দিয়া পাইয়া আরও ব্যাকুলভাবে জাতীয় জীবনকে বরণ করিতে শিক্ষা করিতেছি। অপরাপর সভ্যতাকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে না অনুভব করিলে আমরা জাতীয় সভ্যতা ও সাধনার গৌরব বোধ হয় আয়ত্ত করিতে পারিতাম না।

সমাজ-সংস্কার নহে, ধর্ম্মের আন্দোলন নহে, নাগরিক সাহিত্যের বিদেশীয়তাই গৌণভাবে আমাদের দেশীয়তার পুষ্টিবিধান করিয়াছে।

বাস্তবিক ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে নব-নাগরিক সাহিত্য যে ভাবসম্পদ লইয়া আপনাকে ঐশ্বর্য্যশালী মনে করিতেছে তাহার সহিত

আমাদের মানসিক ও অধ্যাত্ম-জীবন কিছুতেই খাপ খায় না, তাহা-দের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ অধ্যাত্মজীবনের বরং চরম বিরোধ রহিয়াছে। এই যে বিরোধ ইহার কারণ কেবল শিক্ষার তারতম্য নহে এই বিরোধের কারণ সভ্যতা ও সাধনার বিভিন্নতা। যে ভাব-সাধনা যে অধ্যাত্ম-শিক্ষা আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও সমাজের ভিতর দিয়া ইতিহাসে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, যাহা বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনায়ত্ত লোকসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এখনও সজীব রহিয়াছে, তাহাই এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এক্ষণে নিজে পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বর্ত্তমান জনসমাজকে আশ্রয় করিয়া আপনার স্বতন্ত্র অপূর্ব্ব বিকাশের সুযোগ খুঁজিতেছে।

অশিক্ষিত জনসমাজ ও জাতীয় সভ্যতা

লোক সাধারণের, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজের হৃদয়ে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সাধনা আপনাদের গৌরব অটুট রাখিয়াছে। সহরের আফিস, আদালতে, ইস্কুল কলেজে সে অনাদৃত, উপেক্ষিত, অপমানিত, নাগরিক জীবনের এক কোণে নির্ভয়ে নির্ব্বিবাদে থাকিবার স্থান সে পায় নাই, সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া সে পথে পথে ঘুরিয়া কত কাঁদিয়াছে, বৃথা আশাভরে আপন সন্তানের মুখোপরি চাহিয়া তীব্র উপহাসের মর্ম্মন্তুদ ব্যথা পাইয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু দেশের তথাকথিত অশিক্ষিত সমাজের বিরাট হৃদয়সিংহাসনে তাহার স্থান ছিল। সেখানে কৃত্রিমতা নাই, পরমুখাপেক্ষিতা নাই, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা নাই, সেখানে আছে শুধু স্বাধীন জীবনের সরলতা ও সৌন্দর্য্য, সেখানে বাক্চাতুরী নাই, কূটনীতি নাই, আছে শুধু সহজভাব, সরল

প্রকাশ, সেখানে শুধু শুষ্ক জ্ঞান নাই, জ্ঞানের সহিত হৃদয়ের যোগ আছে, সেখানে দয়ামায়া কোমলতা আছে, প্রেম ও ভাবুকতা আছে। জাতীয় সভ্যতা সেইখানে আপনার স্থান পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেইখানে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ইতিহাসসঞ্চিত সমস্ত ভাব-সম্পদ লইয়া এখনও নীরবে নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতেছে, শান্তির মধ্যে, সংযমের মধ্যে, সরলতার মধ্যে, সহজ ও স্বাধীন প্রেমময় জীবনের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির মধ্যে।

বাহিরের চিন্তা স্রোত হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের যে দোষ হইয়াছে তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। একটা গোঁড়ামির ভাব, একটা সঙ্কীর্ণতা, আচারের একটা অন্ধ অনুকরণ আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। আমাদের নাগরিক সাহিত্য পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে দীক্ষা লইয়া—এই সঙ্কীর্ণতা এই গোঁড়ামিকে যে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা আশার বিষয়। বাস্তবিক এতকাল পরে পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিতে যাওয়া ঘোর স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব-দোষ হইবে সন্দেহ নাই।

নকল ও আসল জীবন

কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট শিক্ষালাভ আমাদের নিজেদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশ-সাধনের যেন এক উপায় মাত্র হয়। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন। জাতির প্রকৃত বিশেষত্ব, দেশের আসল মনুষ্যত্ব তথাকথিত শিক্ষিতদিগের মধ্যে বিকাশলাভ করিতেছে না।

দেশের আসল জীবন,—সহজ, সরল, অকৃত্রিম জীবনের স্কুল

কলেজের বাকবিতণ্ডা, আফিস আদালতের হাকিমী, জারিজুরী, drawing room, parlour, club-roomএর ইয়ারকি, নাগরিক জীবনের হৃদয়হীনতার মধ্যে লোপ পাইয়াছে।

সেই আসল জীবনকে পাই আর এক জগতে,—সেখানে সে এখনও আমাদের গরুচরা মাঠে, ছায়া ঢাকা খেয়া ঘাটে, বনে ঘেরা কুটীরে নিত্য নূতন রসের রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে, সেই সুন্দর রস-ভরপুর মধুর জীবন প্রাতঃকালের অবকাশের মধ্যে কত অশ্রু-সজল ভৈরবী গানে পথহারা পথিক পরাণ—তরুণ হৃদয়কে কাঁদাইতেছে, মধ্যাহ্নের কর্ম্ম ক্লান্তির আবেশে কত ভাটিয়াল কত গম্ভীরা কত বাউল কত প্রসাদী-গানে ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্নজল দিতেছে এবং ঝিল্লী-মুখরিত রাত্রের নিস্তব্ধ-তার মধ্যে কত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কত কাহিনী শুনাইয়া কত সুখ দুঃখের, আশা নিরাশার বিপদ সম্পদের বিহ্বলতা দূর করিতেছে।

আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, এই আসল জীবনকে অবলম্বন করিয়া। নাগরিক জীবন নকল জীবন; তাই নাগরিক জীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শুধু নকল সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিয়াছে।

অচলায়তন-সাহিত্য

ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। টেবিলে কেরাসিন আলো জ্বলিতেছে। সন্ধ্যা হইতে সকলে মিলিয়া গল্পগুজব করিতেছে। সিগারেটের ধূম, কেরাসিন আলোর তাপ, লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাস সকলে মিলিয়া ঘরটাকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সাহিত্য চর্চ্চা এইরূপেই নাগরিক জীবনের বদ্ধ অচলায়তনের তাপ ও গ্লানি সঞ্চয় করিয়া দূষিত হইয়া পড়িতেছে। সমাজকে যেমন অচলায়তন

করিয়া ফেলা অসহ্য হয় সেরূপ সাহিত্যকেও অচলায়তন করিয়া ফেলিলে তাহাও অসহ্য,—জীবন ও স্বাস্থ্য বিকাশের প্রধান অন্তরায়; কিন্তু বদ্ধ অচলায়তনের নব্য সাহিত্য এখন বলিতেছে, দরজা জানালা খুলিয়া কাজ নাই, দুরন্ত বাতাস আলো নিবাইয়া দিবে, বদ্‌রসিক অসমজদার পাড়ার লোক ঢুকিয়া ঘরের মজলিস একেবারে মাটী করিয়া দিবে। তাহার অহঙ্কার হইয়াছে, আসল সত্য ও সৌন্দর্য্য খোলা আকাশ, বাতাস, মাঠ, ঘাট ত্যাগ করিয়া তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে; এবং যতই এই অহঙ্কার বাড়িতেছে ততই সে আপনার বাহিরের জাঁক জমক, ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের,—শিল্প চাতুরীর দিকে মন দিয়া আসল সত্য ও সৌন্দর্য্যের গৌরব খর্ব্ব করিতেছে। শুধু তাই নহে, অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া সে বদ্ধ ঘরের তাপ ও গ্লানি সত্য ও সৌন্দর্য্য বলিয়া সকলকে দান করিতে বদ্ধপরিকর।

ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দাও। বাহিরের মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে সমস্ত গ্লানি দূর হইবে। বদ্ধ চিত্তকে মুক্তি দিয়া সাহিত্য এখন বাহিরের বিশ্বজোড়া প্রাণ অনুভব করুক। সে যে তাহারি প্রাণ, তাহার যুগ যুগান্তকালের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত প্রাণ, জাতির ক্রমবিকাশের সহিত যে তাহার শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় যোগ রহিয়াছে। সাহিত্য এই যোগ অনুভব করুক। সাহিত্য আপনার বদ্ধ চিত্তকে জাতির সত্য ও সৌন্দর্য্যালোকে জাগ্রৎ চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুক, তখন তাহার সমস্ত পাপ গ্লানি খোলা আলো বাতাসের পুণ্যস্পর্শে এক মুহূর্ত্তে বিলীন হইবে।

সাহিত্য—দেশী বিদেশী

বদ্ধঘরের পাপ ও গ্লানির মধ্যে সাহিত্য যে মাঝে মাঝে বাহিরের

জাতীয় চৈতন্যের সহিত পরিচয় লাভ করে নাই তাহা নহে। প্রায়ই বিদেশীয় চৈতন্যপ্রভাবে দেশীয় চৈতন্য একেবারেই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বিলাতী ও দেশীয় চৈতন্য বেশ মিশিয়া একটা সুন্দর ও নূতন সৃষ্টিও হইয়াছে, আবার সময় সময় মেলামেশাটা সম্পূর্ণ হয় নাই তখন সমন্বয় না হইয়া একটা খিঁচুড়ী হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলের মত অমন জোরালো বই আমাদের সাহিত্যে নাই বলিলেও চলে। অথচ ইহা একদম Romolaর বাঙ্গালী সংস্করণ। "গোরায়" আমরা বিদেশীয় nationalismএর স্বদেশী সংস্করণ দেখিতে পাই বটে কিন্তু ইহা যে স্পষ্ট বিদেশী তাহার প্রমাণ হিন্দুত্ব-প্রচারক গোরার আইরিশ জন্ম। Felix Holt, The mill on the floss এবং Niethzeর তত্ত্ব আমাদের গোরা, নৌকাডুবি ও ঘরে বাহিরের ছাঁদ দিয়াছে। মেঘনাদ বধে আমরা মিল্টনের সয়তানকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া ধৌত করিয়া লইয়াছি; কুরুক্ষেত্রে, রৈবতকে আমরা কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে জর্ডন নদীতে চুবাইয়া আনিয়াছি। এমন কি বেদব্যাস দ্বৈপায়নকে শ্বেতদ্বীপ-তীর্থে পার্কার ও নিউমানের বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া আসিতে হইয়াছে। 'বৃত্রসংহারে' দেবগণের জটলা—Paradise lostএর infernal crewর বঙ্গে আগমন।

আবার বিদেশী ও দেশী ভাবের একত্র সমাবেশে খুব জোরালো লেখার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যথা—দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চোখের বালি, নৌকাডুবি ইত্যাদি। "দুর্গেশনন্দিনীর" আয়েষার পার্শ্বে আমাদের সূর্য্যমুখী, কমলমণি আছে। চোখের বালির বিনোদিনীর পার্শ্বে আমাদের আশা আছে। নৌকাডুবির হেমনলিনীর পার্শ্বে আমাদের কমলা আছে।

আবার আমাদের নিখুঁত দেশীভাবের সৃষ্টিও আছে। রবীন্দ্রবাবুর

প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' ও রাজর্ষিতে তাহা কিছু পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর ছোট গল্প, 'দিদি', 'সমাপ্তি', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'প্রত্যাবর্ত্তন', 'পোষ্টমাষ্টার' প্রভৃতিতে তাহা lyricএর শক্তি ও সৌন্দর্য্য লইয়া অতি সুন্দরভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে। নাটকের মধ্যে আমাদের লীলাবতীর পার্শ্বে নীলদর্পণ আছে, আমাদের প্রফুল্ল, বলিদান, আছে। আমাদের স্বর্ণলতা আছে, শক্তিকানন আছে, শুভবিবাহ, ধ্রুবতারা আছে। আমাদের দিদি আছে। আমাদের বিন্দুর ছেলে, বিশুদাদা, ছোটকাকী আছে। আছে, কিন্তু বেশী নাই।

নিখুঁত দেশীভাবের বইয়ের মধ্যে প্রায় সবেতেই মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজের চিত্র; চিত্রপট খুব ছোট, দেশের শ্রমজীবিগণ একবারেই বাদ পড়িয়াছে। যাহাদের লইয়া দেশ তাহাদের সহজ ও স্বাধীনজীবন আমাদের এই কৃত্রিম হাতে গড়া পোষাকী সাহিত্যে কি করিয়া থাকিতে পারে।

বহুকাল ধরিয়া টেবিল, চেয়ার, আরাম-কেদারা আশ্রয় করিয়া আমরা Scott. George Eliot পড়িয়া উপন্যাস লিখিতেছিলাম, Byron ও Tennyson পড়িয়া কাব্য লিখিতেছিলাম, Moliere, Sheridan পড়িয়া নাটক লিখিতেছিলাম। আজ এখনও আমরা Scott, Byron ও Shelleyর যুগ অতিক্রম করিয়া Tolstoy ও Ibsen পড়িয়া নভেল তৈয়ারী করিতেছি, গল্পে Daudet ও Maupassantকে ফুটাইয়া তুলিতেছি। Materlink ও Strindburgএর শিষ্য হইয়াছি। নাটক লিখিতে যাইয়া আমরা একবারে মোগল বাদশাহের দরবারে যাইয়া হাজির, আমাদের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ নাই, যেন ভাল মন্দ সুখ দুঃখ যাহা কিছু সবই ছিল সেই ঐতিহাসিক যুগে,—পাঠান ও মোগল রাজত্বের সময়ে। এমন কি পাঠান মোগল চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়াও আমরা

ঐতিহাসিক ভাব রাখিতে পারি নাই। যেমন সাজাহান চিত্রিত করিতে যাইয়া আমরা King Learকে আমদানী করিয়াছি। এতই আমাদের বিদেশীয় মোহ। তাই আমাদের আসল সাহিত্য বেশী জন্ম লয় নাই।

শাক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতা

প্রায় চার শতাব্দী হইল একবার আমাদের এই দেশে, বাধা বন্ধন, কৃত্রিমতার মধ্যে পরাধীনতার পাপে দুষিত বদ্ধ জীবনের মধ্যে, এমন একটা ভাবুকতার ঢেউ উঠিয়াছিল যাহা উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধারণ, অসাধারণ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের হৃদয় তোলপাড় করিয়া একটা জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে আন্দোলনে অধিকারভেদ, আভিজাত্য ছিল না, সকলের অধিকার, সকলের মনুষ্যত্বের গৌরব অটুট ছিল। সে আন্দোলন একই সঙ্গে ধর্ম্মের পরোক্ষবাদ, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য, ও সমাজের স্বাধীনতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। সমস্ত কৃত্রিমতা সমস্ত পরাধীনতার মধ্যে তাহা একটা সরল, মুক্ত ও সুন্দর জীবনের সৃষ্টি করিয়া আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মন প্রাণকে গঠন করিয়া আসিতেছে। সেই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার যুগ হইতে বাঙ্গালী আজও তাহার সাধনার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। তখন বাঙ্গালীর সাহিত্যের সহিত জাতীয় সাধনার কার্য্যকরণ যোগ ছিল। সাহিত্য একটা অবাস্তব খাপছাড়া সৃষ্টি ছিল না। একটা concrete অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সাহিত্যে অধিকারভেদ ছিল না, কারণ সে সাহিত্য যে মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, মনুষ্যত্বের সকলের অধিকার, কাহারও অনধিকার নাই। সে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল শুধু ব্রাহ্মণ নহে, হীন কামার'

দোকানদার, চাষী, ধোপা পর্য্যন্ত। ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীও সে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্ম্মের ভাবুকতা, সমাজের বাধাবন্ধনবিহীনতার মত সে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য একটা সত্য অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা লইয়া সমগ্র জাতির হৃদয় আন্দোলিত করিয়াছিল এবং তাহাকে মুক্ত জীবনের পরিচয় দিয়াছিল। সে মুক্ত জীবনের মনমুগ্ধকর বাঁশীর সুরে সমগ্র জাতীর হৃদয় আকুল আবেগ পাগলিনী রাধার মত ছুটিয়াছিল।

স্বদেশাত্মা ও সাহিত্য-শক্তি

আজ এই দূষিত জীবনের পাপসঞ্চয়ের মধ্যে, এই বাধাবন্ধন, কৃত্রিমতার মধ্যে,—সেই সহজ সরল মুক্ত জাতীয় জীবন প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও স্বাধীনতার দিক দিয়া আমাদিগের সাহিত্যকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের জাতীয় হৃদয়-যমুনার তীরে আমাদের স্বদেশাত্মা সেই পরম মোহন সাজিয়া তমালতলে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই মনপ্রাণ পাগলকরা বাঁশী বাজিয়াছে। আমার জাতীর জীবনের নিখিল-রসাত্মিকা চিত্তময়ী সাহিত্যকে আর কেহ ঘরে বদ্ধ রাখিতে পারিবে না, জাতি কুল, মান অভিমান, লজ্জা ভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া সে সেই গোচারণ মাঠের রাখাল, খেয়াঘাটের মাঝি, তমাল-তলের বংশীধারীর দিকে ছুটিবেই'—বিশ্ব-গ্রাসিনী শক্তির লীলা দেখাইয়া ছুটিবেই শ্রীঅঙ্গে নিখিল সৌন্দর্য্যের সুষমা ধরিয়া, অন্তরে পরম জ্ঞানের অগাধ আনন্দ লইয়া, হৃদয়ে অসীম প্রেমের অবাধ উচ্ছ্বাস লইয়া। সেই গোচারণ মাঠই যে আমার জাতীয় জীবন দেবতার ক্রীড়াভূমি, সেই তমাল ছায়াই যে আমার চিরকিশোরের বিলাসক্ষেত্র, আর সেই কল্লোলিনী যমুনার লীলা লহরী আমার চিরলীলাময়ের নিত্য-তরঙ্গিত

ভাবস্রোত। আমার লোক-ললামভূতা, নিখিল জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দর্য্য-ময়ী সাহিত্য-স্বরূপিণী ভাবাত্মিকা আরাধিতা শ্রীরাধিকা যখন সেই বংশীধারীর চরণে আত্মনিবেদন করিবে, তখন সে জানিবে যে তিনি শুধু রাধিকা-হৃদিবল্লভ নহেন, এমন কি গোপী-জন-বল্লভও নহেন, তিনি জগন্মোহন, নিখিল-মনমোহন। তিনি শুধু তমালতলে, গরুচরা মাঠে, খেয়াঘাটে থাকেন না, নিখিল বিশ্বের হৃদয় দ্বারকায় তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, নিখিল বিশ্ববাসীর অন্তরে ধর্ম্ম-কুরুক্ষেত্রের তিনিই অধিনায়ক।

যিনি গোপগৃহে জাত রাখাল বংশীধারী, তিনিই মথুরার রাজা, তিনিই যুগে ধর্ম্মসাম্রাজ্যের সংস্থাপক। বঙ্গের ভাব-ময়ী রাধা তাঁহার হৃদয়-সঙ্গিনী, পাশ্চাত্য কল্পনা রঙ্গময়ী কুব্জা তাঁহার চিত্তবিনোদনের সেবিকা মাত্র।

আত্ম-দ্রোহী সাহিত্য

"ঘরে বাহিরের" আলোচনা প্রসঙ্গে রবি বাবু সাহিত্যের উদ্দেশ্য লইয়া আবার আলোচনা করিয়াছেন। উপলক্ষ্য হইয়াছে এক মহিলা তাঁহাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠির প্রথম প্রশ্ন, "ঘরে বাহিরে" উপন্যাস খানি লেখার উদ্দেশ্য কি? রবি বাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া প্রসঙ্গত সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সাহিত্যের বিচার পদ্ধতি ইত্যাদি লইয়া পুনরালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমালোচনার পর রবি বাবু এতাবৎকাল এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই, সুতরাং বর্ত্তমান লেখা সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহার একটা মীমাংসা হইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য দান করিবে। ইহা বিশেষ সুখের বিষয়। কারণ সাহিত্যের আদর্শই যদি ঠিক না হইল; তবে সাহিত্য-রচনা সার্থক হইবে কি করিয়া?

আর্ট সৃষ্টি করিব, আমার খুসি

রবি বাবু তাঁহার "বাস্তব" প্রবন্ধের art for art's sake মতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, গল্প উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য নাই। গল্প উপন্যাস লিখ্‌ব, আমার খুসি! কিন্তু তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে লেখকের মতামত স্বভাবতই সাহিত্যের ভিতর তাহার অগোচরেই ফুটিয়া উঠে।

লেখকের নহে, কালের দায়িত্ব

রবি বাবু একটা উদাহরণ দিয়াছেন। হরিণের গায়ে যে চিহ্ন আছে, তাহা protective colouring। গাছপালার সঙ্গে হরিণ বেশ মিশিয়া থাকিয়া নিরাপদ হইতে পারে। কিন্তু হরিণের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য বিশ্বকর্ম্মার। সেরূপ সাহিত্যের ভিতর লেখকের ভাল মন্দ বিচার আছে, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী লেখক নহেন, লেখকের দেশ ও কাল।

দেশ ও কাল যে সাহিত্যের অন্তরে প্রকাশ পায় ইহা পূর্ব্বে অস্বীকৃত হইয়াছিল। এমন কি প্রমথ বাবু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, কবি দেশ ও কালের অতীত। সাহিত্যে কবি দেশ ও কালের "যুগধর্ম্ম" প্রকাশ করেন বলিয়াছি বলিয়া আমাকে তিনি ঘোর বাস্তব-পন্থী Materialist বলিয়া গালাগালি দিয়াছিলেন।

তাহা হইলে দাঁড়াল এই, দেশ ও কাল সাহিত্যে প্রকাশ পায়। রবি বাবু হরিণের উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, হরিণ যেমন জানে না তাহার গায়ের চিহ্নের উদ্দেশ্য কি, সেরূপ ঔপন্যাসিকও তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য জানেন না, অথচ একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে।

কবি-মন জড় নহে, চেতন

কিন্তু হরিণ-শিশুর সঙ্গে কবির তুলনা কাব্যে ভাল শুনাইলে তত্ত্ব হিসাবে একেবারে মিথ্যা। কবি বা লেখক সত্য সত্যই দেশ ও কাল সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা প্রকাশ করেন তাঁহাদের সাহিত্য। দেশ ও কাল, কবির ব্যক্তিগত জীবন বাস্তবিকই তত্ত্ব ও উপদেশরূপে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র বাবু ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি

লিখিয়াছেন, "কবির দেশ কাল সাহিত্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা তত্ত্ব বা উপদেশরূপে নয়, শিল্পরূপেই।"

কবির মন একটা স্বচ্ছ শাদা কাচের মত নহে, যে দেশ ও কাল তাহার উপর যেমন আলো দিবে তেমনি রঙ্ তাহাতে ফুটিয়া উঠিবে। কবির মন বরং ঝাড় লণ্ঠনের মত, দেশ ও কাল হইতে সে আলো আদায় করিয়া রঙ্ বেরঙ্ সৃষ্টি করে। তাহার কাজই হইতেছে আদায় করা এবং তাহার সফলতা হইতেছে একটা নূতন কিছু সৃষ্টি।

ওথেলোর তত্ত্ব

রবি বাবু সেক্সপিয়রের ওথেলোর উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহার কোন উদ্দেশ্য খুঁজিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ভুল। রবি বাবুর একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। সেক্সপিয়ার নাটকের সমালোচকগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমানযুগের অগ্রণী Brandes ও Raleigh তাঁহারা বলিয়াছেন সেক্সপিয়ারের আসল চারিটি ট্রাজেডিতে অন্তর্জ্জগতের এক একটা গভীর সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এমন কি Brandes এক একটা ট্রাজেডির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; এক্ষেত্রে সেক্সপিয়ারের ট্রাজেডির যে কোন উদ্দেশ্য নাই বলা ঠিক হইবে না।

অচলায়তন ও গোরার শিল্প ও উদ্দেশ্য

তাহার পর, রবি বাবুর এই থিয়রি, যে নাটক লেখার উদ্দেশ্যই নাটক লেখা, তাঁহার নিজের আর্টের সঙ্গে খাপ খায় না। আমরা যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার "অচলায়তন" নাটকের উদ্দেশ্য কি, তিনি কি দ্বিধা বোধ করিবেন? অচলায়তনে শাস্ত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে কবির ভাল

মন্দ লাগা, কবির দেশ ও কাল কি তত্ত্ব ও উপদেশরূপে প্রকাশ পায় নাই? আমরা ত রবি বাবুর উপদেশ এক্ষেত্রে স্পষ্ট বুঝিতে পারি, ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোন উদ্দেশ্য খাড়া করিতে হইবে না।

"গোরা" লেখার উদ্দেশ্য কি গল্প লেখা? "গোরাতে" আবার গল্প কোথায়? যদি বলা যায় গোরাতে দেশ ও কাল, তত্ত্ব বা উপদেশ-রূপে নহে, শিল্পরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তবে বিনয় ও গোরার অত বক্তৃতা অত বাগ্‌বিতণ্ডার প্রকৃত সার্থকতা কোথায়? গোরার সম্মুখে সুচরিতার অন্তরটা কাঁপিতেছে, কিন্তু সে তাহার সঙ্গে ভক্তির সূক্ষ্ম বিচার আরম্ভ করিয়াছিল। সে বিচার, সে বক্তৃতাকে কি শিল্পরূপে গণ্য করিতে হইবে?

"অচলায়তন" শিল্প হিসাবে নিখুঁত সুন্দর। অচলায়তনের "তত্ত্ব বা উপদেশ" শিল্পকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। কিন্তু গোরাতে তত্ত্ব শিল্পকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। উপদেশ শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। শিল্প হিসাবে গোরা একটু খাট।

সেইরূপ শিল্পের হিসাবে নহে, তত্ত্বের হিসাবেই "রাজা" "ডাকঘর" প্রভৃতিও বিশ্ব-সাহিত্যে খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে অথবা করিবে।

এই সকল ক্ষেত্রে যদি কেহ বলেন যে তত্ত্ব সমুদয়, উপদেশরূপে নহে, শিল্পরূপে গল্প বা নাটকে প্রবেশ করিয়াছে তাহা হইলে প্রত্যেক গল্প বা নাটক লইয়া তাহাতে তত্ত্বপ্রকাশের জন্য কি ভাবে action এর অমর্য্যাদা ও গল্পের হানি হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান প্রয়োজন। বর্ত্তমান আলোচনায় তাহা অসম্ভব।

রবি বাবু যদি বাঙ্গালীকে পক্ষপাত-দোষী সাব্যস্ত করেন তবে তাঁহার বিদেশীয় সমালোচকগণের মত লউন। তাঁহারা তাঁহার নাটকে শিল্প অপেক্ষা তত্ত্বকেই অধিক সমাদর করিয়াছেন।

যেমন "অচলায়তন" যেমন "গোরা" তেমনি "ঘরে-বাহিরে।" প্রত্যেকের ভিতরই এক একটি গভীর তত্ত্ব।

শিল্পের নহে, মতের খাতির

রবি বাবু বলিয়াছেন, এই সকল নাটক, গল্প বা উপন্যাসে তাঁহার ভাল মন্দ বিচারকে শিল্পের উপকরণ ভাবে দেখিতে হইবে, মতামত বলিয়া দেখা উচিত নহে।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে রসানুভূতি অপেক্ষা বিষয়বিচারই বড় হইয়া রহিয়াছে সে ক্ষেত্রে কাব্য বা নাটক যে নিরাসক্ত তাহা মানা যায় না। যে সকল কাব্য নাটক বা উপন্যাসে লেখকের তত্ত্ব বা উপদেশ শিল্প বা গল্পের খাতির রাখে নাই, সেখানে শিল্পের রস অনুসরণ না করিয়া আমরা স্বভাবতই লেখকের হৃদয়ভাব অনুসরণ করি। লেখক যদি পাঠকদিগকে তখন ভৎর্সনা করেন "তোমরা আমার গল্প পড়, আমার কথা শুনিতেছ কেন?" তাহা হইলে পাঠকদিগের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অবিচার হয়।

মোট কথা, "অচলায়তন," "গোরা" অথবা "ঘরে বাহিরে" গল্পের খাতিরে নহে গল্পের মতের খাতিরে লোকে পাঠ করে। এই মত লইয়া লেখকের হৃদয় ভাব লইয়া আমাদের বিরোধ ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে তত্ত্ব বা উপদেশ

"অচলায়তনে" আমাদের অধ্যাত্ম সাধনা সম্বন্ধে একটা তত্ত্ব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ, মন্ত্রতন্ত্রের আজ্ঞা সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং অধ্যাত্ম সাধনার পক্ষে চরম বিঘ্ন, যখন গতানুগতিক ভাবে লোকে তাহাদের অনুসরণ করে। এই তত্ত্ব খুব সত্য ও গভীর, কিন্তু ইহার মর্য্যাদা

বর্ত্তমান সময়ে কমই। কারণ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, গতানুগতিক স্মৃতি অনুগত, কেবলমাত্র প্রাচীন কিম্বদন্তিপ্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইয়া আমরা নূতন ও স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মের পথ ধরিয়াছি। নব্য-হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে গতানুগতিক ভাবকেপ্রত্যাখ্যান করিয়া। "অচলায়তনের"দ্বার খুলিয়াছে বলিয়া আমাদেরকে অচলায়তনের উপদেশ স্পর্শ করে না। "গোরার" অন্ধ জাতিপ্রেমকেও আমরা অতিক্রম করিয়া নূতন ভাবে বিশিষ্ট হিন্দুজাতীয় সাধনার মধ্য দিয়া বিশ্বকে খুঁজিবার জন্য ব্যস্ত। "ঘরে বাহিরে" যে নীটশে-স্বদেশী-জুয়াচোর, নেড়ানেড়ীর অদ্ভুত সম্মিলন পাইয়াছি তাহা ত আমাদের পক্ষে এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত। জবরদস্ত স্বদেশীর জোর যার মুলুক তার নীতিকে বিদ্রূপ করার প্রয়োজন হয়ত স্বদেশীর প্রথম যুগে কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এখন নাই।

সাহিত্য ও জীবন

তত্ত্বের দিক্ দিয়া সাহিত্যকে আমি ম্যাথু আর্ণল্ডের মত জীবনের আলোচনা (criticism of life) বলিব না, সাহিত্য হইতেছে জীবন-সৃষ্টি (Creation of life)। জীবন-সৃষ্টির দিক হইতেই সাহিত্যের বিচার। একটা ফুলের শোভা,একটা মেঘের রঙ,নদীর কুলুকুলু ধ্বনি,কবির চিত্তকে আন্দোলিত করে। যে গীতি-কবিতার এইরূপে সৃষ্টি হয় তাহার লাবণ্য কবির ব্যক্তিগত প্রাণেই আবদ্ধ। কিন্তু যখন প্রকৃতির অনুভূতি সমগ্রতা লাভ করে, যখন শুধু ফুলের শোভা, মেঘের আলোছায়া নির্ঝরের শব্দের ভিতর দিয়া নহে, বিচিত্র শোভাসম্পদকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রকৃতির এক সমগ্র অনুভূতিতে কবি-হৃদয় ভরিয়া উঠে, তখন যে গীতি-কবিতার সৃষ্টি হয় তাহার লাবণ্য প্রত্যেক হৃদয়কে স্পর্শ করে, শুধু একা কবির

হৃদয় নহে। তাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতির রসানুভূতি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন ও সুন্দর, কারণ ইংরাজ কবিগণের মধ্যে প্রথম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরই হৃদয়ে প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন ভাবে নহে, সমগ্রতার মধ্য দিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। শকুন্তলা অথবা মেঘদূতেও প্রকৃতির বিকাশ বিচ্ছিন্ন ভাবে নহে, সমগ্র ব্যাপক ভাবে। আমরা বলিব প্রকৃতির রসানুভূতির দিক্ হইতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা কালিদাসের জীবন-সৃষ্টির হিসাবে খুব উচু স্থান। তাঁহাদের সাহিত্যের এই হিসাবে life-value উল্লিখিত সাহিত্য অপেক্ষা অধিক।

নাটক উপন্যাসে সমাজ-জীবনের আদর্শ সৃষ্টি

জীবন-সৃষ্টির আদর্শের দিক্ হইতে নাটক, গল্প উপন্যাসের স্থান বিচার করিতে গেলে আমাদেরকে Social value অথবা সমাজের আদর্শ সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। সমাজের প্রয়োজনে যে গল্প নাটক উপন্যাসের অবতারণা, আদর্শ সৃষ্টি তাহার লক্ষ্য, আদর্শের উচ্চনীচতা বিচারই তখন সমালোচনার মাপকাঠি।

বর্ত্তমান যুগে সবদেশেই সাহিত্য অর্থে গল্প নাটক উপন্যাস দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং সাহিত্য-সমালোচনার প্রণালী হইয়াছে, শিল্পকে মানিয়া সামাজিক আদর্শগুলি কি ভাবে নাটক নভেলে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ঐ আদর্শগুলি উচ্চ কি নীচ তাহা বিচার করা।

সহজ মানব-প্রকৃতির সহিত সমাজ-ধর্ম্মের সমন্বয়

সমাজ-সম্বন্ধে লেখা, আদর্শ-সৃষ্টি লক্ষ্য। সুতরাং প্রধান সমস্যা

সমাজ-জীবনের মূল লইয়া, তাহা এই দাঁড়াইবে—সহজ মানব প্রকৃতির সহিত সমাজ-ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যুগে যুগে নাটক উপন্যাস এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিতেছে। সমাজ-ধর্ম্মের সহিত স্বাভাবিক মানব-ধর্ম্মের একটা সমন্বয় সাধন করিয়া আসিতেছে।

সমাজ-বিদ্রোহী আর্ট

আমাদের আজকালকার বহু গল্প, নাটক, উপন্যাস সমাজধর্ম্মের সহিত সহজ মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে না যাইয়া সহজ মানব-প্রকৃতির উদ্দাম-স্রোতে একবারে গা ঢালিয়া দিয়াছে। সমাজের জীবন, সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের বহুতর আধুনিক সৃষ্টির প্রাণগত যোগ নাই বলিয়া তাহারা নিতান্ত কৃত্রিম, কল্পিত, না-ইউরোপীয়—না-হিন্দু হইয়াছে। শুধু সমাজের দিক্ হইতে নহে, সাহিত্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের নব্য সাহিত্যিকগণ সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিকে পদদলিত করাই আর্টের আদর্শ ভাবিতেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্র বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন, "তর্কটা এই রকম দাঁড়াবে,—মানব-প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করার একটা বেগ আছে, কিন্তু সেটা কি সাহিত্যে বর্ণনা করবার বিষয়? এ তর্কের উত্তর আবহমান কালের সমস্ত সাহিত্য দিচ্ছে, অতএব আমি নিরুত্তর থাকিলেও ক্ষতি হইবে না।" রবি বাবু কি বলিতে চাহেন, সাহিত্য মানবের সহজ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিবার বেগ দেখাইয়া আসিয়াছে, আর কিছু করেনাই? "চোখের বালিতে" তিনি বিনোদিনীর অন্তর প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার একটা প্রচণ্ড বেগ দেখাইয়া তাহাকে কি তিনি কাশীবাসে পাঠান নাই? বিনোদিনীর রাক্ষসী-মূর্ত্তি বিনোদিনীর সহজ কিন্তু পূর্ণ মূর্ত্তি নহে। মহে-

ন্দ্রের পার্শ্বে তিনি কি বিহারীর চরিত্র ফুটাইয়া তুলেন নাই? "চোখের বালির" শেষ অধ্যায়ে আমরা রবি বাবুকে সমাজ-দ্রোহিতার একটা প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতি পূরণের প্রয়াস পাইতে কি দেখি না?

আসল সাহিত্য ভাল নাটক উপন্যাস মাত্রেই সহজ মানবপ্রকৃতির সহিত সমাজ-ধর্ম্মের একটা মিলন ঘটাইয়াছে। শকুন্তলা নাটকের সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা যে এইখানে তাহা রবি বাবু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

সাধারণ মানবজীবন ও সহজ সমাজধর্ম্ম

এস্থলে আমাদের নব্য গল্পলেখক বা নাটককার বলিতে পারেন, সহজ মানবপ্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গিবার প্রচণ্ড বেগকে ফটাইয়া তুলিয়া, লৌকিক-ধর্ম্ম বা নীতিকে পদদলিত করিয়া আমরা নূতন লৌকিক ধর্ম্ম বা নীতির সূত্রপাত করিতেছি। ইহার উত্তর তাঁহাদের লেখা গল্প,নাটক বা উপন্যাস দিবে; তাঁহাদের সাহিত্য যে শুধু লৌকিকধর্ম্ম ও নীতিকে পদদলিত করে তাহা নহে, সাধারণ মানবজীবন ও সহজ সমাজ-ধর্ম্মকেও অগ্রাহ্য করে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে আধুনিক art for art's sake দলের আর্ট অত্যন্ত অলীক ও অসার, inartistic। তাঁহাদের সৃষ্টি আর্টের হিসাবেও খাট, কারণ আসল আর্টের সৃষ্টি যে মানবজীবনের অন্তঃপ্রয়োজনে সেই মানব-জীবন হইতেও এই আর্ট বিচ্ছিন্ন।

তাহাদের আর্ট এমন একটা অলীক বস্তুতন্ত্রহীন জগতের সৃষ্টি করিতেছে, যেখানে নীতি নাই, ধর্ম্ম নাই, সমাজের সমস্ত বন্ধন যেখানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ যেখানে সমাজ-ধর্ম্মও নাই, সমাজও নাই। যেখানে

মানুষ আছে, মানুষের সহজ উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি আছে, কিন্তু মনুষ্যজীবন নাই, সমাজবদ্ধ সংযত মানুষের ধর্ম্ম ও নীতি নাই।

অবশ্য আমি একথা বলি না যে আর্ট সর্ব্বদাই লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অনুসরণ করিবে। আর্ট লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অনেক সময়ে অবজ্ঞা করিয়াই নূতন ধর্ম্ম ও নীতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছে। বিপিন বাবুও তাই বলিয়াছেন যে হিন্দুসমাজে আর্ট লৌকিক ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়াই যুগে যুগে নূতন ধর্ম্ম স্থাপনের সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু আমি আরও বলিতে চাই যে আর্ট লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিতে যাইয়া যেন সাধারণ মানব-জীবন ও সহজ সমাজধর্ম্মকে না অবজ্ঞা করিয়া বসে ; আর্ট যেন মানবের উদ্দাম প্রকৃতিকে বিদ্রোহের উৎসাহ প্রদান করিয়া, হিন্দু বা ইউরোপীয় সমাজের নহে, সাধারণ ও স্বাভাবিক সমাজ-জীবনের মূলে না কুঠারাঘাত করে। আর্টকে যাহা কিছু ভাঙ্গিতে হইবে, তাহা শুধু ভাঙ্গিবার জন্য নহে, একটা নূতন কিছু গড়িবার জন্য।

রসস্ফূর্ত্তি ও জীবন-সৃষ্টির বিরোধ

আর্টকে কেবলি আমরা রসের দিক্ হইতে বিচার করিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ বিপিন বাবুও তাঁহার ধর্ম্ম ও আর্টের সম্বন্ধবিচারে আর্টকে রস-সৃষ্টির স্ফূর্ত্তি বলিয়াছেন। ইহাতে আর্ট খাটো হইয়াছে। আমি আর্টকে জীবনসৃষ্টি বলিয়াছি, রসসৃষ্টি জীবনস্ফূর্ত্তির অন্তর্নিহিত। মা পুত্রকে স্তন দিতেছেন। এখানে মাতৃস্নেহ হইতেছে রস, কিন্তু স্নেহের মধ্য দিয়া যে মাতৃত্বের বিকাশ তাহাই হইতেছে আসল সত্য। রসসৃষ্টি মাতৃস্নেহের প্রকাশ, একটা আনুষঙ্গিক মাত্র। এখানে আমাদের মাতৃত্বের ভিতর দিয়া যে অন্তর বাহিরে জীবনসৃষ্টি হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

সেরূপ আর্টের রসসৃষ্টিও আনুষঙ্গিক। আর্টের দ্বারা যে ব্যক্তিত্বের পুষ্টি, জীবনসৃষ্টি হইতেছে তাহাই আসল সত্য। নিম্নস্তরের আর্টের সৃষ্টিতে রসটাই প্রধান মনে হয়। যেমন অপত্যপালনে নিম্নস্তরের জীবের মাতার সুখদুঃখই প্রধান। কিন্তু বড় আর্ট মাত্রেই যেখানে শিল্পী আর্টের ভিতর দিয়া আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেন, সেখানে রস অথবা কল্পনাটা একটা অঙ্গ দাঁড়ায়, আসল অঙ্গীটা হয় জীবন-সৃষ্টি। আবার যখন রসস্ফূর্ত্তি জীবনস্ফূর্ত্তির অন্তরায় হয় আমরা বলি আর্ট তখন হীন, জীবন-সৃষ্টির হিসাবে তাহার স্থান নীচে, তাহার life value কম। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এই রসস্ফূর্ত্তির আদর্শের দিকে জোর দেওয়াতে আর্ট সহজ মানবপ্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিবার বেগকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিতেছে, সহজ ও সার্ব্বজনীন জীবনের পথ অনুসরণ করিতেছে না। এই কারণে আমাদের আধুনিক সৃষ্টি আর্টহিসাবে হীন ও জীবন-সৃষ্টির হিসাবে একেবারে অপদার্থ।

বিপিন বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন, 'আর্ট ধর্ম্মের ও নীতির মুখ চাহিয়া বসে নাই, সহজ মানবপ্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গিবার স্রোতের বেগে গা ঢালিয়াই আর্ট সংসারকে অপূর্ব্ব রূপরসে সাজাইয়া তুলে।' তাহা নহে। আর্ট সহজ ও উদ্দাম মানব-প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসে নাই। আর্ট মানবপ্রকৃতির উদ্দাম বেগকে সামলাইয়া তাহার সহিত সাধারণ মানবজীবন ও সমাজধর্ম্মের একটা মীমাংসা করিয়াছে। বৈষ্ণবগীতিকবিতায় আমরা সহজ মানবপ্রকৃতির উদ্দাম স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া দেখি না, সহজ জীবন ও সংসার-ধর্ম্মের সহিত একটা চূড়ান্ত মীমাংসাও দেখি। বৈষ্ণবকবিতায় শুধু রস-স্ফূর্ত্তি নহে, জীবন-সৃষ্টিরও পরিচয় পাই। তাই সাহিত্যের হিসাবে বৈষ্ণবকবিতার স্থান এত উচ্চে।

শিল্পীর ভ্রম

সাহিত্য-জগতে রস-সৃষ্টির আদর্শের দিকে জোর দেওয়ায় আধুনিক আর্ট এত দায়িত্ববোধহীন, তাহা যে শুধু লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহা নহে, সাধারণ মানব-জীবন ও সহজ সমাজধর্ম্ম-কেও পদদলিত করিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্য শুধু নিরাসক্ত নহে, নিষ্ঠুর করিয়াছে।

রসসৃষ্টির আদর্শে পরিচালিত আর্ট সাধারণ মানব-জীবন ও সহজ সমাজধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ নিষ্ঠুর হয়, এবং সর্ব্বশেষে আত্ম-সর্ব্বস্ব হইয়া কিরূপে আত্মঘাত করে তাহা সম্প্রতি 'অন্নপূর্ণা' নামক ক্ষুদ্র নাটকে অতি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শীরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

আমি। উঃ তোমার শিল্পের দোহাই আমায় রেহাই দাও। আমিও মানবী মানবকুলের প্রতিনিধি—আমার স্বগোষ্ঠীতে ফিরে যেতে চাই। * * এবার মানুষের সৃষ্টি, তুমি এবার সরে পড়, প্রভু!

বিশ্বশিল্পী। আমি সরি কোথায়! সরি কি করে?

আমি। ব্রহ্মত্বের লোপ করে। একবার মানুষের সঙ্গে মানুষ হও! এর মধ্যে এক, একলা এক নয়। রাজদণ্ড ছাড়, হাল ধর।

বিশ্বশিল্পী। রাণী তোমার কি হবে? ব্রহ্ম জাগিলে তোমার আশ্রয় কোথায়! তুমি যে আমার বিশ্বরূপবিলাসিনী, রাণী।

আমি। রসাতলে, পাতালে যাই—সংসার বাঁচুক!

বিশ্বশিল্পী।—আত্মহত্যা!

আমি। হাঁ, যুগে যুগে মানবকুলে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আমির সংহারে দানলীলা সাধিত হয়েছে। তাই সংসার উদ্ধার পেয়েছে।

বিশ্বশিল্পী। ঘাতক! রাণী আমায় প্রাণে মের না।

আমি। মারবো! মারবে! দুইএর সংহার না হ'লে বহুর উৎপত্তি কোথায় * * অন্নপূর্ণার দেহে এবার যুগল রস-মূর্ত্তি মিশিয়া যাইবে। এবার তৃতীয় নহে * * তোমায় কষ্ট দিলাম বন্ধু, কিন্তু আজ আমি শুধু তোমার হ'তে পারি না, আজি আমি সবাকার। * * (পড়িতে পড়িতে)

বন্ধু। বিশ্বশিল্পী মূর্চ্ছিত।

বর্ত্তমান আত্মসর্ব্বস্ব দায়িত্ববোধহীন আর্ট একদিন না একদিন তাহার ভ্রম দেখিবে। তখন বহুর মধ্যে রস-মূর্ত্তি মিশিয়া যাইবে। শিল্পী তখন নিজ হাতে গড়া বৈকুণ্ঠের মন্দির, আপনার সাজান বাগান নিজেই নষ্ট করিবে। বহুর ভিতর দিয়া যে রসের স্ফূর্ত্তি তাহা জীবন-রস। প্রকৃত রস-স্ফূর্ত্তি তখন জীবনসৃষ্টিতে পরিণত হইবে। 'অন্নপূর্ণা' নাটক যেমন ভবিষ্যৎ আর্টের ধর্ম্ম প্রাণময়ী ভাষায় ইঙ্গিত করিয়াছে, রবি বাবু সেইরূপ অতীত যুগের আর্ট আদর্শের গলিত শবকে বাচাঁইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন।

নিরাসক্তি নহে নিষ্ঠুরতা

চারিদিকে আসোয়াস্তি, ক্রন্দন, হাহাকার, হৃদয়ে হৃদয়ে শিরায় শিরায় আগুনের জ্বালা। আমাদের আর্টিষ্ট বসিয়া বসিয়া শুধু রসের সৃষ্টি করিতে, রসানুভূতি করিতে চাহিতেছেন! কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা, কি কঠোর রসানুভূতি, কি বীভৎস হাসি! "হাস! হাস! তোমার ঐ সর্ব্বনেশে হাসি ও খেলা! আর কতকাল পাহাড়ের গায়ে বৈকুণ্ঠধামের বারন্দা থেকে গভীর নিশীথে আঁধারে বসে বসে দেখবে নীচে পাহাড়ে তলদেশে খাদে খাদে সহস্র সহস্র হাপর চুল্লী অগ্নি উদ্গীরণ করছে ওযে আমার হৃদয়ে চুল্লী জ্বলে! ঐ যে কটাহে কটাহে রসের পাক!"

বাস্তবিক আর্টের দায়িত্ববোধহীনতা ও নিষ্ঠুরতা যেরূপ রবি বাবুর

মতবাদে প্রকাশিত হইয়াছে আর কোথায়ও সেরূপ হয় নাই। রবি বাবুর যে মত সবুজ পত্রের প্রমথ বাবুরও সেই একই মত। এই মত বাদের দ্বারা আধুনিক নব-নাগরিক সাহিত্য গড্ডলিকা প্রবাহের মত পরিচালিত।

রবিবাবুর মত ও কাজ

রবিবাবুর সাহিত্য কিন্তু তাঁহার মতের অপেক্ষা করে নাই। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, দেশ ও কাল তাঁহার আর্টের ভিতর দিয়া আপনাপন উদ্দেশ্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। উদ্দেশ্য তাঁহার নহে, তাঁহার দেশ ও কালের। তাঁহাকে দিয়া তাঁহার অগোচরেই তাঁহার দেশ ও কাল "নবীন প্রতিমা নব কৌশলে গড়িছে মনের মত।" ইহার সঙ্গে রবি বাবুর জীবন-দেবতার কল্পনা মিলাইয়া লইলে বুঝিব আর্ট রবিবাবুর নিকট যে একবারে দায়িত্ববোধহীন তাহা ঠিক নহে। তিনি দায়িত্বটা নিজে না লইয়া একটা অপ্রাকৃত শক্তির হাতে দিয়াছেন, তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া তিনি গাহিয়াছেন,—

একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,—
* * * *
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে
* * * *
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা
বুঝি না জাগে সেই ব্যথা

জানিনা এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

উল্লিখিত অনুভূতিকে রবি বাবুর বিশিষ্ট হৃদয়ভাব হিসাবে, তত্ত্ব হিসাবে বিচার করা উচিত নহে। কারণ তত্ত্ব হিসাবে আমি যদি অনন্ত প্রবহমান শক্তির স্রোতে ভাসিয়া যাই, তবে আমার আত্মার স্বাধীনতা, আমার ক্রিয়ার সার্থকতা কোথায়? আমি ত দেবতার শুধু পুতুল নহি, আমিও দেবতা।

যাহাই হউক না কেন, রবিবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের এই ভাবই তাঁহার সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, যে তাঁহার শিল্পের ভিতর দিয়া—

"সে মায়া মূরতি কি কহিছে বাণী
কোথাকার ভাব কোথা নিল টানি
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন"

সুতরাং তাহার নিকট হইতে আর্টের দায়িত্ববোধহীনতার থিয়রি শুনা বিচিত্র নহে।

থিয়রিতে রবিবাবুর আর্ট দায়িত্ববোধহীন, কিন্তু কাজে তাঁহার আর্ট গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে।

কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকগণ তাঁহার থিয়রিকে অবলম্বন পাইয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হইবেন। আর্টের আদর্শ হিসাবে নিকৃষ্ট ও জীবন-সৃষ্টির হিসাবে অপদার্থ যেরূপ গল্প-নাটক-রচনা আজকাল সমাদর লাভ করিতেছে তাহা আরও উৎসাহিত হইবে। ইহা দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, ধর্ম্ম ও নীতির পক্ষে এবং আর্টের পক্ষে অমঙ্গলের কথা সন্দেহ নাই।

সাহিত্য–সমালোচনার মাপকাঠি

সাহিত্যে রস ও বস্তু লইয়া অনেক দিন হইতে তর্ক চলিতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সেই আসল কথাটা—সাহিত্যের সাধনা কি—তাহাও উঠিয়াছে। রবীন্দ্রবাবু, সবুজপত্রের প্রমথবাবু, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সকলেই এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন।

"মানসীতে" শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় এই মতামতকে উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি,—এই তর্কের বিষয় বহুকাল হইল নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে আমাকে তিনি বলিয়াছেন, আমি একটা চির ও অভ্রান্ত সত্যের প্রতিবাদ করিয়া শুধু বুদ্ধির ডিগ্‌বাজী খেলিয়াছি, আর "সবুজ-পত্রের" সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়, যিনি অন্ততঃ কিঞ্চিৎ চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া আঠার পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ আমার উত্তরে লিখিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে প্রিয়নাথবাবুর অভিযোগ, তিনি তর্কের নেশায় লিখিয়াছেন, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর দেখাইয়াছেন, অবান্তর কথায় প্রবন্ধ বড় করিয়াছেন।

প্রিয়নাথবাবু একটা আসল কথা সুন্দরভাবে ধরিয়াছেন। সেটা হইতেছে, রস ও বস্তুর বিচার, সাহিত্যের সহিত রস ও বস্তুর সম্বন্ধ-নির্ণয়। প্রিয়নাথবাবু রবিবাবুর মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, রসই নিত্য-বস্তু, তাহা লইয়াই কাব্য। বস্তুর মধ্যে সে নিত্যতা নাই; সাহিত্যে বস্তু-সমাধান অপেক্ষা রসের প্রাচুর্য্যই লক্ষ্য-বস্তু।

আমার বক্তব্য হইতেছে, বস্তুর মত রসও অনিত্য। যুগে-যুগে

বস্তুর মত রসেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশকাল-পাত্রভেদে রসেরও বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এটা ঠিক নহে—রবিবাবু যাহা বলিয়াছেন—মান্ধাতার আমল হইতে আমরা একই রস উপভোগ করিতেছি।

রসের মধ্যে ধরুন প্রেম,—যাহা সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ, সাহিত্য রসের মধ্যে যাহা প্রধান। যুগে-যুগে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে এই প্রেমের কত না বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। প্লেটো ও সক্রেটিসের যুগের হেটায়রা-শ্রদ্ধা, মধ্যযুগের চিভালরি ও আধুনিক কালের ইবসেনিজিম্, এক পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধে ইউরোপীয় সমাজে কত না বৈচিত্র দেখা গিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম—যে প্রেম সমাজধর্ম্মের নিকট বলি প্রদত্ত হইল,—মৃচ্ছকটিকের নায়কের প্রেম,—চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম—বর্ত্তমান যুগে নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে সুষমার প্রেম, এবং রবীন্দ্রবাবু তাঁহার "ঘরে বাহিরে" উপন্যাসে যে প্রেম চিত্রিত করিয়াছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রসেরও যুগ বা জাতি আছে;—ঐতিহাসিক যুগে যাহা, আধুনিক যুগে তাহা নহে; হিন্দুর নিকট যেরূপ পাশ্চাত্য সমাজের নিকট সেরূপ নহে। অনেকে বলিতে পারেন, এ ত সেই প্রেমই রহিয়াছে, প্রেমের প্রকার না হয় বিভিন্ন হইল। তাহা বলিলে আমি বলিব, মানুষও ত সেই মানুষ রহিয়াছে, যুগ বা জাতি অনুসারে তাহার না হয় প্রভেদ দেখা গেল, দেশকাল-পাত্রের অভাব-অনুসারে বাস্তবের না হয় প্রভেদ দেখা গেল; তবুও যে অভাব, সেই অভাব ত চিরকাল রহিয়াছে, যে বস্তু সেই বস্তুই ত নিত্য-সনাতন। আমরা যখন প্রেমের কথা বলি, তখন দেশ, যুগ বা জাতি অনুসারে রসের বিশিষ্ট প্রকাশ মনে আসে; যখন মানুষের কথা বলি, বস্তুর কথা বলি, তখন বিশেষ যুগ বা জাতির মানুষ ও মানব-সমাজ মনে আসে।

সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া একটা অফুরন্ত উদ্দাম রসস্রোত আবহমান কালের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে। অবিরাম স্রোত চলিতেছে। নিত্য পরিবর্তনশীল তট হইতেছে বাস্তব; দেশকালপাত্রভেদে তাহার কত না বিচিত্র শোভা সম্পদ। এই রসস্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে, ডুবিতে-ডুবিতে সনাতন পুরুষ ও সনাতন নারী আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া চলিয়াছে। স্রোতের কত না বিচিত্র-ধ্বনি, নব নব সাহিত্যের কত না বিচিত্র প্রকাশ। স্রোত নিঃস্বন হইতেছে, সাহিত্যের ঝঙ্কার। তরঙ্গমালা হইতেছে, সাহিত্যের ভাবোচ্ছ্বাস! কোথায় আবর্ত্ত, কোথায় ঘূর্ণীপাক, কোথায় একটানা প্রবাহ; দেশকালপাত্রভেদে সাহিত্যের কত না বিচিত্র গতি। সাহিত্য নিত্য নূতন রসের সৃষ্টি করিয়া, নিত্য নূতন বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া, মানুষকে সেই বিশ্বমানব-মনের অগাধ আনন্দ-সঙ্গম তীর্থে পৌছাইয়া দিতেছে।

ঐ সঙ্গমতীর্থ হইতেছে—আসল রস সমুদ্র। সাহিত্যের চরম-সাধনা হইতেছে—মানুষকে ঐখানে পৌছাইয়া দেওয়া। সেইখানেই দেশকালপাত্রের অনিত্য রস ও অনিত্য বস্তু নিত্যের সন্ধান পাইয়াছে। সেখানে রসস্রোতের আর সঙ্কীর্ণতা নাই, অসীম সাগরে তাহার লয় হইয়া গিয়াছে। দুই তটও সেখানে আপনাদের খুঁজিয়া পায় না,—ধারানিবদ্ধেযু কলঙ্করেখার মত তমালতালিবনরাজিনীলা, দিগন্ত বিস্তৃত বেলাভূমিতে দুই তট আপনাদের অস্তিত্ব হারাইয়াছে। সাহিত্য সেখানে নিত্য রস ও নিত্য বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া দেশকালপাত্রকে অতিক্রম করিয়াছে, সাহিত্য সেখানে সার্ব্বজনীন হইয়াছে; কোন দেশ, জাতি বা যুগের না হইয়া, সাহিত্য সেখানে বিশ্বমানবের হইয়াছে,—সর্ব্বদেশের, সর্ব্বযুগের হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম; নিত্য রস ও নিত্য বস্তুর অনু-

সন্ধান করা সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ। সাহিত্য নিত্য রূপ ও নিত্য বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আসে; বাস্তবের যাহা কিছু হেয়, ঘৃণ্য, নগণ্য—তাহা ধসিয়া পড়ে একটা সুন্দর মহনীয় বাস্তব গড়িয়া উঠে। শুধু তাহা নহে। রসের মধ্যে যাহা কিছু বিকৃত ও ঘৃণ্য, তাহাও ঝরিয়া যায়। বিচিত্র সুন্দর ও মধুর রসের উদ্বোধনে বিকৃত রসসমূহ আর থাকে না। সাহিত্য এরূপে হেয় বাস্তব ও বিকৃত রসের মধ্যে একটা মহনীয় বাস্তব গড়িয়া তুলে, বিচিত্র ও মধুর রসের উদ্বোধন করে

এরূপে নূতন বাস্তব গড়িয়া ও নূতন রসের সৃষ্টি করিয়া সাহিত্য মানবের শিক্ষার ভার লইয়াছে। কাব্যের বর্ণিত বস্তু ও উদ্ভাবিত রস বর্ত্তমানের বিকৃত বস্তু ও রস যে অনিত্য ও অসুন্দর তাহা দেখাইয়া মানবকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছে।

কাব্যে একই সঙ্গে সত্যের প্রকাশ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়। যে কাব্য শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, আর কিছু করে না, তাহা নিম্নস্তরের কাব্য। সে কাব্যই কুৎসিৎ। আসল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সত্য-প্রকাশ ছাড়া হয় না। শুধু ভাষার পারিপাট্য ও শিল্পনৈপুণ্যে চমক লাগে, আসল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় না।

যাঁহারা কাব্যকে শুধুই রসোদ্ভাবনের দিক হইতে দেখিতেছেন, কাব্যে সত্য-প্রকাশের দিককে উপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে একটা খাপছাড়া জিনিষ করিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন। তাঁহারা কাব্যের ইতিহাস হইতে বাছিয়া-বাছিয়া কাব্য লইয়া যদি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, রসের গুণে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই সে সকল কাব্যের গৌরব, তাহা হইলে তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ

অনুপম সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চরম সত্যের সহিত সেই দেশ, যুগ বা জাতির পরিচয় স্থাপন করিয়াছে। কাব্যের মহত্ত্ব শুধু আর্টের উপর নির্ভর করে না। চাতুরী দেখাইয়া কেহ কখনও বড় কবি হন নাই। কবির অন্তর হইতে তাঁহার জাতি ও যুগ, বাহিরের সমাজ সম্বন্ধে একটা চরম সত্য প্রতিভাত না হইলে তিনি কখনও বড় কাব্য লিখিতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমালোচকগণ কাব্যের মধ্যে সত্যকে উপেক্ষা করিয়া শুধু সুন্দরকে খুঁজিতেছেন।

কোলরিজের Ancient Marinerএর বস্তু গৌরব নাই! কি আশ্চর্য্য কথা! এক বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কবি নিজেই ত উহার উদ্দেশ্য (moral) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'মানবের সহিত বহিঃ-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিশ্লেষণে Ancient Mariner ইংরাজী সাহিত্যে তুলনারহিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনা-সংস্থানের সহিত নাবিকগণের অন্তর-প্রকৃতির যে যোগাযোগ আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া আমরা কি শুধু ভাষার বৈচিত্র্য ও শিল্প-চাতুরীকেই লক্ষ্য বস্তু করিব?

Tempest ও মেঘদূত, ইহারা কি কবি-প্রতিভার শুধুই অনুপম সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি? মধুময় মোহ ও উজ্জ্বল কল্পনার উপাদানে গঠিত হইয়া ইহারা কি কোমল শ্যামদূর্ব্বাশীর্ষে নীহারবিন্দুর মত শুধুই কমনীয়, মনোমুগ্ধকর; আর কিছুই নহে! শকুন্তলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, স্বয়ং রবীন্দ্র বাবু ত বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ বিচারে—সেক্সপীয়ার Tempestএ যে অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক Tempest নাটক নগ্নপ্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত শিশু-মানবের সহিত কঠোর বাস্তব ও বাহিরের সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের একটা জলন্ত ছবি। আর মেঘদূত! আমি ত মেঘদূত সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শকুন্তলার যেমন মিলনে বিরহ, মেঘদূতে সেরূপ বিরহে

মিলন। যে প্রেমের সহিত সমাজের ও বিশ্বপ্রকৃতির বিরোধ নাই, সেই প্রেমই সত্য; সে প্রেমে বিঘ্ন নাই, হিন্দু কবি কালিদাস ইহাই দেখাইয়াছেন। বিরহী যক্ষ যখন অসীম বিরহবিধুরা বর্ষা-প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিলাইয়া দিল, তখন আর বিচ্ছেদ দুঃখ রহিল না। বিরহেই মিলন হইল, যখন বিরহ শুধু আপনার অন্তরে নহে, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিতে অনুভূত হইল। মেঘদূত বড়; কারণ ইহা অকাশ-কুসুম নহে। এই সংসারের অন্তঃস্থল হইতে উদ্গত কবির অভিজ্ঞতায় আশ্রিত ইহা সুন্দর পদ্মের মত।

আমরা দেখিলাম, সাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রত্যেকে প্রত্যেককে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। ফুলের যেমন সৌরভ ও সৌন্দর্য্য—গন্ধ ও শোভা, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টার প্রাধান্য স্বীকার করিব? ফুলের উদ্দেশ্য কি? শুধু কি বন আলো করিয়া বসা? ফুল যে চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত করে, তাহা উপেক্ষা করিয়া আমরা কি শুধু শোভাই দেখিব? সাহিত্যে সেরূপ সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য স্বীকার করা ভুল হইবে।

এটা ঠিক যে, যাহা পরম সুন্দর, তাহাই চরম সত্য; কিন্তু সাধারণ আলোচনায় এই সার কথাটা ভুল হয়। ভুল না হইলে সাহিত্য-মন্দিরে বাস্তবকে অমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে 'প্রবেশ নিষিদ্ধ' বলিয়া কেহ প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাহিত্যে বস্তুই সত্য-প্রকাশের আশ্রয়।

মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করিতে যাইয়া, আমরা আমাদের অন্তরে আদর্শ-মানুষ সম্বন্ধে ধারণার আশ্রয় লই। সেই আদর্শই মানুষ যাহা আমাদের কল্পনা—তাহাই আসল সত্য ও নিত্য। প্রত্যেক মানুষের ভিতর কমবেশী অনুসারে সেই আসল আদর্শ-মানুষটি ফুটিয়া আছে—কিন্তু কোথাও পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া নাই।

শুধু মানুষ নহে, জড়প্রকৃতি—চেতনরাজ্য, সকল স্থানেই এই বিচার

পদ্ধতি খাটে। জড়, চেতন, মানুষ, সমাজ, ব্যক্তিগত,জীবন, সামাজিক জীবন, বর্ত্তমান ও অতীত—সবক্ষেত্রেই একটা কল্পিত মাপকাটি দ্বারা আমরা বিচার করিয়া থাকি। মানুষের আদর্শই নিত্য সত্য ; অন্য সব অনিত্য ও মিথ্যা।

সাহিত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধেও আমাদিগকে সেই একই বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। ব্যক্তি, সমাজ, ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ, স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতি ভগবানের সম্বন্ধ—ইহাই হই-তেছে সাহিত্যের বাস্তব। সাহিত্য জড় ও চেতন, ব্যক্তি ও সমাজের বহির্জগতের কোন-না-কোন বিশেষ সম্বন্ধের সহিত আমাদের স্থাপন করে। সাহিতের বাস্তবের সহিত এই পরিচয়-স্থাপন-প্রয়াসকে বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, সাহিত্য ফটোগ্রাফের মত হুবহু নকল না করিয়া মানস আদর্শের সৃষ্টি করিতেছে কি না। কবির মন ক্যামেরার মত নহে, কাব্য ফটোগ্রাফ নহে। কবি বাস্তবের মধ্যে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করে। নিত্য বস্তু হইতেছে Ideal Reality—মানস-আদর্শ। তাহাই বাস্তবের স্বরূপ, তাহাই সত্য। আর এই বাস্তব অনিত্য, মিথ্যা। ফটোগ্রাফি সূর্য্যকিরণের অধীন, কিন্তু কাব্য প্রাকৃতিক আলো হইতে তাহার আদর্শ চিত্রিত করে না, সে আলো শুধু কবির অন্তরেই প্রতিভাত।

The light that never was on sea and land
The consecration and the poet's dream

সে আলো ভিন্ন কাব্যের বস্তু চিত্রিত হয় না। নিত্য বস্তু ও অনিত্য বাস্তবের প্রভেদ পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস বা সংবাদ-পত্রের কোন প্রভেদ থাকিবে না। আর্টের সেইখানে ব্যর্থতা।

রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালিতে" যে বাস্তবের সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহাতে শুধুই রক্তমাংস—ইন্দ্রিয়লালসার নগ্ন ও কুৎসিত মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব এখানে রক্তমাংসের, ভোগ-লালসার; সুতরাং ইহা অনিত্য, মিথ্যা ও সমাজ-দ্রোহী। রসের হিসাবেও বলা যায়, কোন রসই ইহাতে বিকাশ লাভ করে নাই। রসাভাব হইয়াছে,—সুতরাং শিল্প-কলার দিক হইতেও ইহা অসুন্দর।

পক্ষান্তরে "গোরা"। চরিত্র-অঙ্কনের দিক হইতে বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, গোরার বাস্তব অলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কবির মানস আদর্শ বাস্তব। রসবৈচিত্র্য বেশী নাই; তবুও ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিগত নীতি ও সমাজধর্ম্ম প্রভৃতির সম্বন্ধ-বিকাশে কবির প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা নিত্য ও সত্যানুসন্ধান-প্রয়াসে সফলকাম হইয়াছে।

আমাদের সাহিত্যে "গোরার" কল্পিত আদর্শ বাস্তব অপেক্ষা "চোখের বালির" হেয়, জঘন্য ও অসত্য বাস্তব অধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। জোলা, ডডে, ফ্লবেয়ার একটা ঝুটা বাস্তবের ধুয়া লইয়া আমাদের সাহিত্য-আসরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আদর্শ ছাড়িয়া সাহিত্য সাধারণ বাস্তবকেই আশ্রয় করিতেছে। হেয় ও ঘৃণ্য বাস্তব সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে প্রকটিত হইতেছে কেবল তাহাদের নগ্ন ও বীভৎস রূপ—আদর্শের মহিমা ও সৌন্দর্য্য তাহাতে নাই।

"নারায়ণে" প্রকাশিত সত্যেন্দ্র গুপ্তের 'কথানাট্য' এবং শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এইরূপ সৃষ্টি। চরিত্র-উন্মেষ ও আদর্শকল্পনা অপেক্ষা একটা ঘৃণ্য বাস্তবের উদ্দাম ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসার ছবি এখানে মুখ্য বস্তু হইয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর "ঘরে বাহিরে" কোন কল্পিত আদর্শ বা কোন নিত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুধু পাওয়া গিয়াছে, উদ্দাম কাম-প্রবৃত্তির পোষাকী রূপ। চরিত্র-বিশেষের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে বিশেষ আদ-

র্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা অবশ্য বাস্তব। কল্পনা বা আদর্শ অথবা নিত্যবস্তু ছাড়িয়া উপন্যাসখানি জমাট বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া আপনার মর্য্যাদা হারাইয়াছে। শুধু আদর্শের দিক দিয়া নহে, সাধারণ ও সার্ব্বজনীন নৈতিক জীবনের সাপেক্ষদিকেও রবিবাবুর বাস্তব একেবারেই হীন, অসঙ্গত।

সাহিত্যে বাস্তব ও নিত্য বস্তুর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, অনিত্য ও নিত্য রস-উদ্বোধনে সেই একই বিচার-পদ্ধতি খাটে। সাহিত্যে নিত্য বস্তুর উপেক্ষা ও অনিত্য বাস্তবের প্রতিষ্ঠার মত রসা-ভাস অথবা রসের বিকারও আর্টের হিসাবে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়।

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া অনেক দিক হইতে কিছু কিছু কথা বলা হইল। কোন গোলমাল যাহাতে না হয়, তাহার জন্য, সার কথাটা আর একবার খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

(ক) আসল সাহিত্য একই সঙ্গে সত্যের প্রকাশ ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। সত্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করা ভুল হইবে।

(খ) সত্য ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেশ, যুগ বা জাতি অনুসারে বিভিন্ন হয়।

(গ) সুতরাং কোন দেশের বা যুগের সাহিত্য, যুগ ও জাতি-ধর্ম্মানুযায়ী সত্য-প্রকাশ ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করে।

(ঘ) সাহিত্য যুগধর্ম্ম অবলম্বন করে বলিয়া, ইহা লোকশিক্ষা ও সমাজগঠনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

(ঙ) সাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয়—নিত্যবস্তু ও নিত্য রস উদ্বোধনের দ্বারা।

(চ) মানুষের মানস-আদর্শই নিত্য বস্তু; তাহাই সাহিত্যের

অবলম্বন। আধুনিক নব-নাগরিক সাহিত্য তাহা আশ্রয় না করিয়া জঘন্য বাস্তবের পূতিগন্ধে বিভোর হইয়া এক শ্রেণীর ফরাসী-সাহিত্যের আংশিক অনুকরণে অনিত্য বস্তু ও অসত্যের প্রকাশ ও রসাভাসের প্রশ্রয় দিতেছে; অথবা শুধু অলীক কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া অবাস্তব হইয়াছে।

(ছ) নিত্যবস্তুর উপেক্ষা ও বাস্তবকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া নব-নাগরিক সাহিত্যের চেষ্টায় আর্টের অবনতি ও সমাজের অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে।

(জ) নব-নাগরিক সাহিত্য যে শুধু নিত্য বস্তুকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহা নহে; রসাভাস অথবা রসানুভূতির বিকারসাধনের জন্য সাহিত্যের মর্যাদাহানি হইয়াছে।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে মোপাঁসা ডডে এক শ্রেণীর ফরাসী লেখকগণের আদর্শের অনুকরণে আমাদের সাহিত্য নিত্য বস্তু, নীতি ও সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অসত্য ও সত্যাভাসের সৃষ্টি করিতেছে! এই গেল সাহিত্যে বস্তুর হিসাবে কথা। রসের হিসাবে আমরা আমাদের সত্য ও প্রত্যক্ষ রস ত্যাগ করিয়া কল্পিত ও অমূর্ত্ত রস লইয়া চটক লাগাইতেছি।

এই দুই কারণে আমাদের সাহিত্য কৃত্রিম, কল্পনা-প্রসূত, বস্তুতন্ত্রহীন হইয়াছে।

অনুকরণের মোহ দূর না করিলে আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। ইবসেন, বার্ণাড শ, জোলার কল্পিত ভাবের দ্বারা অভিভূত থাকিলে চলিবে না। দেশের সাহিত্য এই দেশের ও যুগের বাস্তবের মানস-আদর্শকে নিত্য বলিয়া বরণ করুক, সত্যের উপর আপনার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করুক। বিদেশী কল্পিত রস ছাড়িয়া আপনার

অনুভূতিকে অবলম্বন করুক। সত্যের প্রতিষ্ঠা, আসল প্রত্যক্ষ রসের সৃষ্টি, আর্টের বিকাশ, সাহিত্যের দেশ, যুগ বা জাতিধর্ম্ম বিচার ও বিশ্লেষণ ও আপনার ভাবুকতার দ্বারা তাহার মধ্য হইতে নিত্য বস্তু ও নিত্য রস সন্ধানের অপেক্ষা করিতেছে। যতকাল আমাদের সাহিত্য আমাদের দেশ ও যুগের অন্তরের নিত্য বস্তু ও নিত্য রসের সন্ধান না পায়, ততকালই আমাদের মধ্যে সাহিত্যের সহিত নীতি ও ধর্ম্মের—আর্টের সহিত সমাজের—শিল্পকলার সহিত শিক্ষা ও সাধনার বিরোধ থাকিবে; আর ঐ বিরোধ লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা, নিন্দাবাদ, প্রতিবাদ চলিতে থাকিবে।

সাহিত্যের দায়িত্ব

আর্ট-বিলাসিতা

আজকাল একদল হঠাৎ-লেখক দেখা দিয়াছেন যাঁহাদের মুখরতায় সাহিত্য-মন্দিরে হাট-বাজারের অভিনয় সুরু হইয়াছে। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য যে সাধনা প্রয়োজন ইহারা তাহা জানেন না—বিদ্যানুশীলন, অধ্যবসায় ইহাদের জন্মকোষ্ঠীতে লেখা নাই। একেবারে ইহারা হঠাৎ-আর্টিষ্ট। মা সরস্বতী মিনার্ভা হয়ে যেন ইহাদেরকে জন্ম দিয়েছেন,—হাতে ষ্টীলপেন্ ও চোখে চসমা শুদ্ধ। সাহিত্য সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা যেমন অদ্ভুত, আদর্শও সেরূপ বিকৃত। ইহাদের মতে সাহিত্য শুধু বিলাসের উপকরণ। কাজের যেখানে শেষ হইয়াছে, সাহিত্যের আরম্ভ সেইখানে। সন্ধ্যার অবসর না হইলে তাহা জমিয়া উঠিতে পারে না। সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া ইহারা উদাহরণ দেন, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় গল্পের বইয়ের নাম, "হাজার রাতের এককাহিনী"—আরব্যোপন্যাস। আরব্যোপন্যাসের নাম সাহিত্যের সব চেয়ে বড় সৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে যাঁহারা আনিতে পারেন তাঁহারা এই বিশ্বসভ্যতার হাজার আলোকের মধ্যে হাজার-এক-রাতের অন্ধকার লইয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহাদের জীবন এই বর্ত্তমান বিপদ ও সংঘর্ষের মধ্যে আরব-সুন্দরীদ্বয়ের সেই বাদশাহের মত মোহ আলস্য ও আত্মম্ভরিতায় আচ্ছন্ন!

সত্য ও কল্পনা

এঁদের মতে সাহিত্য হইতেছে—সত্য ও কল্পনার সোণার বাসর। কল্পনা-সুন্দরীর সহচরীগণের সেখানে জয় জয়কার—আর সত্য বরের মাথা হেঁট।

বাসর রসোদ্রেক করিয়া খালাস—রসের ভালমন্দ, শ্লীলতা, অশ্লীলতা বাসর বিচার করে না এবং অসংযত ও অসম্বদ্ধ ভাবপ্রকাশে বাসর চির-প্রসিদ্ধ। এঁদের সাহিত্যও বাসরের মত সুনীতির ও কুনীতির বড় একটা ধার ধারে না এবং অসম্বদ্ধ রচনায় এঁরা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এঁদের সাহিত্যে কল্পনার বেয়াদবী জুলুম জবরদস্তি—শেষে কল্পনার নিকট দাসখত পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়া সত্য লজ্জায় অপমানে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন।

তাই এঁদের সাহিত্য বাসরের মত অল্পস্থায়ী—কেবলমাত্র এক রাত্রের, দিবসের আলোকে ফুটিতে না ফুটিতে বাসরের প্রদীপের মত এঁরা আপনি নিবিয়া যাইবেন।

সাহিত্য একরাত্রির বাসর নহে, সত্য ও কল্পনার চিরমিলনের স্থান। কল্পনা-সুন্দরীর সহচরীগণের নিকট হইতে সত্যের চিরদিন নাকমলা কাণমলা খাইতে হয় না। কল্পনা-সুন্দরী সাহিত্য-সংসারে সত্যের দাসী হইয়া প্রবেশ করেন। তিনিই সাহিত্য-সংসারে লক্ষ্মীশ্রী আনেন। আইবুড়ো সত্যের যে সংসার নীরস ছিল, সেখানে কল্পনা আসিয়া ফুল ফুটাইয়া তুলেন, নিবিড় আনন্দ আনেন। কল্পনা-সুন্দরীর সিঁথিতে মঙ্গল-রেখা, তাঁহার বেশবিন্যাস সাজ-সজ্জা সমস্তই তাঁহার প্রিয়তমের সত্যের সমন্বয় ও আনন্দের জন্য। আর তাঁহার প্রসাধন-দর্পণে বাস্তবের ঠিক সত্য মূর্ত্তিটি প্রতিভাত—ideal realty-র প্রকাশ যাহা সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান।

এই হঠাৎ-আর্টিষ্টের দল আবার নূতন প্রকার একটা জাতিভেদ তৈয়ারি করিয়াছেন। যেমন (১) দর্শনের সত্য (২) তত্ত্বের সত্য (৩) অনুভবের সত্য (৪) রসের সত্য (৫) সাহিত্যের সত্য। সত্যকে এঁরা এমনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছেন যে সে বেচারী তাঁদের দল হইতে পলাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। আর যত মিথ্যার দৈত্য-দানব মিলিয়া এক তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়া আর্টের মুখে ছাগমুণ্ড বসাইয়া, সত্যহীন শিল্পের শাকসব্জীতে তাহার উদর পূরণ করাইয়া শিবহীন সাহিত্যযজ্ঞের সূচনা করিয়াছেন। যত মিথ্যা খেলায় তারা ভরপুর, আর যত "রসগঙ্গাধরে"র চিত্তে মিথ্যা রসের আবেশ জাগাইতেছে।

সত্য এক অখণ্ড। একই সত্য তত্ত্বের ভিতর, শিল্পের ভিতর, দর্শনের ভিতর, সাহিত্যের ভিতর আপনার প্রকাশ খুঁজিতেছে। সাহিত্যের অন্তরে মানুষ সত্যের সহিত আরও নিবিড় পরিচয় লাভ করিতে পারে। কারণ সাহিত্যে রসাবেশের ভিতর দিয়া সত্যের পরিচয় হয়। আনন্দের ভিতর দিয়া পরিচয়ই নিবিড় পরিচয়।

সাহিত্য ও রস

"সাহিত্য রসোদ্রেক করিয়া থাকে"—হঠাৎ-আর্টিষ্টের দল বলিতেছেন। সাহিত্য রস সৃষ্টি করে বটে। কিন্তু সে কোন রস—সে যে প্রাণ রস, জীবে জীবে জড়ে জড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সে রসের ব্যাপ্তি। সে হইতেছে অখণ্ড আনন্দরস। এই রসধারা সত্য ও কল্পনার চির-মিলনের ধারা, আর এই আর্টিষ্টরা যে রসের কল্পনা করিতেছেন তাহা খণ্ড রস তাহার সঙ্গে অসত্যের উন্মাদনার যোগ, তাহা ক্ষণিকের, তাহার অঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগটা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে খণ্ডীকৃত হয়। তৈলধারাবৎ এক ধারায় প্রবাহিত নহে।

প্রাচীন রসবিচারে আছে—

"ব্রহ্মাস্বাদমিব অনুভাবয়ন্ লৌকিকচমৎকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ"—অর্থাৎ রস ব্রহ্মাস্বাদের ন্যায় অনুভব জন্মায়। যেখানে রস ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ভোগের উচ্চে উঠে না সেখানে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তাহাকে "লৌকিক" রস বলিয়াছেন, "তাহাতে কেবল একের তৃপ্তি।" "পর্য্যন্তে বিরসো ভবতি"—সেই রসের শেষ পরিণতি বিরস, অতৃপ্তি। সাহিত্যের রস আরও ব্যাপক, একের মধ্যে আবদ্ধ নহে, এবং তাহার শেষ অবস্থায় অবসাদ আসে না। তাহা অলৌকিক, তাহার সঙ্গে অখণ্ডের যোগ আছে।

যে সাহিত্য শুধু খণ্ড রসের উদ্রেক করিয়া ক্ষান্ত তাহা বৈঠকখানার গল্পগুজবী নিষ্কর্ম্মার সাহিত্য হইতে পারে, তাহা বড় সাহিত্য নহে। বড় সাহিত্য একটা বড় বিষয় লইয়া আলোচনা করে। মানুষের উচ্চ-ভাব ও হৃদয়-বৃত্তিকে মন্থন করিয়া বড় সাহিত্যের জন্ম।

কর্ম্মই সরস্বতীর শরীর

একি অদ্ভুত কথা—

"কাজ যেখানে হইয়াছে, সাহিত্যের সেইখানেই আরম্ভ শেষ"। কাজের যেখানে আরম্ভ সাহিত্যের সেইখানেই প্রথম প্রকাশ। কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, মনুষ্য-জীবনের কাজের গুরুভার ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রসার। বড় কবি বা বড় সাহিত্যিকের স্বর্ণ-সিংহাসনের উপাদান আলস্যের জড়তার ও বিলাসিতার ভোগস্পৃহা নহে। মানুষের কর্ম্মই মা সরস্বতীর শরীর, মানুষের জীবনের কর্ম্মের আনন্দ, আশা নিরাশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ সরস্বতীর হৃদয়-বৃত্তি। তাঁহার চরণদ্বয় আরামের ফেন-শয্যায় ও বিলাসের সুখাসনে বিরাজিত নহে,

কমল-সরোবরে কমলের উপর তাহা স্থাপিত। জীবনের সুখ দুঃখ মন্থন করিয়া কত সাধ আশা, নিরাশার রাগে রঞ্জিত হইয়া রাঙা কমল ফুটিয়াছে।

সাহিত্য ও জীবন

সাহিত্যের রূপ যে জীবনেরই অপরূপ প্রতিমা। সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের উপাদানও জীবনই তৈয়ার করিয়াছে ও করিতেছে। অলসের জীবন নহে, মোহ ও কল্পনাচ্ছন্ন জীবন নহে, সতেজ, সবল জীবন। জীবনই সাহিত্যের জন্মদান করে, জীবনই সাহিত্যকে লালন-পালন করে, আবার সাহিত্যও জীবনের পোষণের ভার লয়। জরাগ্রস্ত পিতার জীবন শিশুতে নবীকৃত হইতেছে; এইভাবে জীবন ও সাহিত্য পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে পুষ্ট হইবে। বৃদ্ধ পিতা শিশুর বলে নবজীবন লাভ করিতে পারেন—তাঁহার এই আশা যেন ব্যর্থ না হয়। সাহিত্য যেন তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান, তাহার দায়িত্ব না হারায়। যে সাহিত্য জীবনের বিরোধী সে কুপত্র, সে ঝুটা সাহিত্য। এমন নীতি ও রীতি বঙ্গ-সাহিত্যে এখন অনেক সময় প্রশ্রয় পাইতেছে যাহা জীবনের বিরোধী—যেটা আশ্রয় করিলে যে জীবনের পথে মানুষ সেই আদিম কাল হইতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সে পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আদিম বর্ব্বরতা হইতে আধুনিক সভ্যতায় পদার্পণ করিয়া মানুষ এটা অন্ততঃ ঠিক বুঝিয়াছে যে পবিত্রতার আদর্শ খাটো করিতে গেলেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ সেই আদর্শ বরং বড় করিয়া রাখিয়াই জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং বড় আর্টিষ্ট কখনই পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সমান চক্ষে দেখেন না।

জীবনের সাহিত্য

ভারতের বড় সাহিত্য কখনও কেবলমাত্র বৈঠকখানাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লয় নাই। মহাভারত, রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত, চণ্ডী ও বৈষ্ণব-সাহিত্য ভারতীয় জ্ঞান ও সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিগুলি সমগ্র ভারতীয় জীবনকে আশ্রয় করিয়া ক্রম বিকাশ লাভ করিয়াছে,—সীতা, সাবিত্রী, রামলক্ষণকে আমরা জীবনে ও কর্ম্মে সত্য করিয়া আজও তুলিতেছি; কালিদাসের কুমার-সম্ভব, মুকুন্দরামের চণ্ডী, চৈতন্য ভাগবত অথবা বৈষ্ণব-পদাবলী লোকে দৈনিক জীবন সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করিয়া থাকে। কলেজের সেক্সপীয়ার অথবা গেটে বা রবিবাবুর কাব্য সাহিত্যের পাঠের মত নহে।

রসাভাস

হঠাৎ-আর্টিষ্টের দল চোখ রাঙ্গাইয়া হয়ত বলিবেন, রসস্ফূর্ত্তি হইলেই হইল, দূর কর এ বিড়ম্বনা নীতির উপদ্রব। হঠাৎ পণ্ডিত কি না তাই তাঁহারা আবার প্রাচীন পণ্ডিত অলঙ্কারিকদিগকে সাক্ষী মানেন। তাঁহারা রসের গণনায় বীভৎসটাকেও বাদ দেন নাই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যে কুতুহলী অহল্যার আখ্যান আছে, দ্রৌপদীর কথা আছে, উর্ব্বশীর কথা আছে! এই হইল নজির! বীভৎস রসের না হয় স্ফূর্ত্তি হইল কিন্তু প্রাচীন অলঙ্কারিকেরা বলেন যে রসের একটা স্থায়ী ভাব আছে—বীভৎস রস যদি ঘৃণার উদ্রেক না করিল তাহা হইলে রসাভাস হইবে। সেটা বর্জ্জনীয়। "তদাভাসা অনৌচিত্য প্রবর্ত্তিত।"— রসাভাস ও ভাবাভাস তখনি হইল যখন "সহৃদয় সামাজিকগণ" যেখানে

যে রস ও ভাবের উদ্রেক অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করেন সেখানে সেই রস ও ভাবের আবেশ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু যখন কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীকে, রবিবাবু যখন বিনোদিনী ও বিমলাকে, শরচ্চন্দ্র যখন কিরণময়ীকে মোহিনী মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিলেন তখন আমরা আলঙ্কারিকের মত বলিব রসাভাস হইয়াছে। হলেই বা সেখানে প্রতিভার পরিচয় কিন্তু শিল্প হিসাবেও সেগুলিকে খাট বলিতেই হইবে। তাহা ছাড়া অলঙ্কারিকের কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ত বলা আছে, "শিবেতরক্ষতয়ে"। মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গলনাশ ইহারই জন্য কাব্য লেখা হয়,—তাঁদের সাক্ষীর এই কথা ত হঠাৎ-আর্টিষ্টের বিপক্ষে যাইবে।

রবিবাবুর উভয় সঙ্কট

হঠাৎ-আর্টিষ্টের অনেক আব্দার—এঁরা বলিতেছেন, "চোখের বালি" ও ঘরে বাহিরে" উপন্যাসে লেখক দেখাইয়াছেন, "অধঃপাতের অতলে„ পড়্তে পড়্তে মানুষ কি করিয়া সাম্‌লাতে পারে" বরং বলিলেভাল হইত, রবিবাবু তাঁহার "art for arts' sake" থিয়রতে অতলে পড়্তে পড়্তে কি করে সাম্‌লে গিয়েছেন, তাহা এই দুইখানি বইয়ে দেখান হইয়াছে। ফলে হইয়াছে tragedy of passion যাহা হইলেও হইতে পারিত তাহা হয় নাই অপরদিকে লোকপ্রিয়তা লক্ষ্য করাতে চরিত্র দুইটি যেভাবে ক্রমবিকাশ করিতেছিল তাহাতে অসঙ্গতি আনা হইয়াছে অথচ তারা লোকপ্রিয়ও হইতে পারে নাই। হঠাৎ-কাশীবাসিনী বিনোদিনী ও হঠাৎ-সতী বিমলা art for arts' sake ও art with a purpose. সত্যহীন শিল্প ও সত্যমূলক শিল্প এই দুই থিয়রির দুই নৌকায় পা দিয়া গল্পের মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব-কবিতা ও বর্ত্তমান সাহিত্য।

বৈষ্ণব-পদাবলী লইয়া আজকাল একটা খুব আন্দোলন উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছেন বৈষ্ণবকবিতা বাঙালীর আসল খাঁটি কবিতা। বাংলার কোমলপ্রাণ বৈষ্ণব কবিতাতেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, সেই আসল সুরটি বাংলার আধুনিক কবিতার বাজে হট্টগোলের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। বাঙালীর কাব্যের সেই সহজ ও জাতীয় প্রাণধারা আধুনিক গীতি-সাহিত্যে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্য কেহ বলিতেছেন, বৈষ্ণবকবিতা রসোত্তরের দিক হইতে বিচার করিলে খুব উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে না। ইহা কামশাস্ত্রের মাল-মসলার অধিক যোগান দিয়াছে, মানব-প্রেমের বিশেষ মালমসলার যোগান দেয় নাই। বৈষ্ণব-গীতি-কবিতার বিশিষ্টতা কোথায় এবং ভাবী সাহিত্যে ইহার ভাবগুলি কি স্থান অধিকার করিবে তাহা ইঙ্গিত করিবার একটা চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত এই আন্দোলনের তর্কবিতর্কের মূল কারণ সাহিত্য-শিল্প শব্দের অভিব্যঞ্জনা ও তাহার আদর্শসম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা। আগে শিল্পসম্বন্ধে গোড়ার ধারণাগুলি পরিষ্কার করিয়া লইলে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সহজ হইবে। সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণা আজকাল ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি আমাদের সংস্কৃত অলঙ্কার-সাহিত্যের কাব্যের denotation শব্দের ব্যাপ্তি ত্যাগ করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের কাব্যের denotationই গ্রহণ করিতেছি। রঘুবংশ, শকুন্তলা উত্তররামচরিতের মত আমি [illegible]

ধর্ম্মের বিচিত্র ভাব ও আদর্শ একই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এক সঙ্গে দান্তের একমুখী-দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিয়াছিল। দান্তের Divine Comedy বা Vita Novo দান্তের মহাকাব্য বা মিল্টনের মহাকাব্যের যাচাই করিতে গেলে আধুনিক শিল্প-বিচার-প্রণালী কিছু ত্যাগ করিতে হইবেই এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে, Dante বা Milton মানবীয় অন্তঃপ্রবৃত্তি, মানুষের ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতই বর্ণনা করিয়াছেন। Divine comedy বা Paradise Lostএর মানবীয় ভাগই বেশী। কিন্তু বৈষ্ণব বা সুফী-সাহিত্যের ভাব ও প্রেরণাগুলি অতীন্দ্রিয়, তুরীয়। এগুলি নিছক ধর্ম্ম-সাহিত্য, এ আর্টের বিচার একবারেই অন্য মাপকাটি অবলম্বনে হইবে।

এই প্রভেদ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনা করিতে হইবে। হইতে পারে পাশ্চাত্যের কোন কোন সাহিত্যে বাৎসল্য, সখ্য, বা প্রেমের সুন্দর বিকাশ দেখা গিয়াছে, কিন্তু সবক্ষেত্রে ভাবগুলি মানবীয়, ভাব ও অভিব্যঞ্জনা অতীন্দ্রিয় নহে, মানবীয় রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বলিয়াছেন, Tennyson এর Rizpah বা De Profundisএর বাৎসল্য ও শিশু-জন্মের রহস্যকথা বৈষ্ণব-কবিতা অপেক্ষা অনেক উচ্চ কথা। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় যে শাশ্বত শিশুর চিরন্তনী লীলার কথা আছে, তাহা কি Tennyson এর Rizpah বা সেক্সপীয়রের Cordeliaতে আছে? কোথায় পদাবলী, আর কোথায় পাশ্চাত্য সাহিত্য! সেই চিরন্তন শিশু নন্দদুলালের মোহন নৃত্যের তালে তালে—

যেন শূন্য অম্বর মাঝে বাজে সদা বাজে
কোন্ কৌতুক লীলাময় চিরন্তন শিশুর
নূপুর নিক্কণ রুণরুণ,—

যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, এবং তার মুখের ভিতর।
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরন্তান॥

শিশুর এই বিশ্ব-লীলার ভাব কি কোন সাহিত্যে আছে, না ধর্ম্মে আছে! গোষ্ঠলীলার যাহা নিতান্ত বাহিরের দিক তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্য Pastoral Ballads এর কিছু তুলনা হইতে পারে, কিন্তু আছে কি সেখানে নন্দরাণীর সেই অধীরতা ও উৎকণ্ঠা, গোপবালকগণের সেই নিতান্ত আত্ম-সমর্পণের ভাব,—

নন্দরাণী গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে গোপাল আনি দিব কোলে
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥
সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর-ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়া গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥

অথবা সেই চঞ্চল ধবলী শ্যামলী ধেনু-বৎসগণকে রাখাল-রাজার মুরলী-রবে আজ্ঞাপ্রচার, প্রেম-হৃদি-মন্থনলব্ধ অমৃতের জন্য সেই রাধার ভাবে ননীচোরার আবদার, রাখাল-বালকগণের জীবনের আনন্দ ও স্বাধীনতা, ঘরমুখো বদ্ধজীবনে সেই "জগতে কাহার না হই অধীন, জগতে কাহার না ধারি" প্রভৃতির সেই রূপক-লীলা?

তাহার পর যেটা বৈষ্ণবকবিতার অন্তরের ভাব, সেই সখ্যরস ধর্ম্ম-জীবনের কি অপূর্ব্ব ও মধুর রসাস্বাদন। হাফেজ ও ওমারখায়ামে

সখ্যরস আছে সত্য। কিন্তু সেখানে পাত্রধরের নিতান্ত বাহিরের দিকটাই বেশী ফুটিয়াছে। আছে এক এক সময়ে বৈরাগ্যের গুরুগম্ভীর বাণী, কিন্তু সেটা দর্শনের তত্ত্বের ভাবে বিকাশলাভ করেছে, শাকীর অনুরাগের ভাবে তাহার সহিত মিলন-সম্ভোগের আনন্দে মোহটা মুক্তিরূপে ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। শাকীর প্রেমে বিচিত্র উজ্জ্বল মধুর রসের আবেশ অপেক্ষা মদিরার বর্ণনা, শাকীর মুখজ্যোতির ছটা, ফোটা গোলাপ ও ফুটন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অনিত্যতাই বেশী ফুটিয়াছে। মানুষ একটা অনধিগম্য ও অপরিভবনীয় লীলার ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র ইহা সে অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছে—"হেসে নাও দুদিন বইত নয়, কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়" গাহিয়া সে "হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে পরিহাস করিতেছে।" ইহা হয় একটা ইন্দ্রিয়লীলার মোহের কাব্য না হয় তাহার প্রতিবাদে একটা মর্কট বৈরাগ্য সাধনের দর্শন; বৈষ্ণব-কবিতার মত ভগবৎ-প্রেমের নিবিড় অনুভূতি ও আনন্দ, জ্ঞানের আত্মহারা ভাব, ইহাতে নাই। তাহা ছাড়া হাফেজ ও ওমারখায়াম প্রভৃতি কাব্যে রূপক, প্রতি-রূপ ও ভাবের জন্য বাহ্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াছেন; এবং মানু-ষের অন্তঃপ্রকৃতি অপেক্ষা তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য ও ভূষণের মোহ তাঁহা-দেরকে আকৃষ্ট করিয়াছে। এই জন্য তাঁহাদের কাব্য কখনই মানুষের অন্তরের জিনিষ হইতে পারে না, তাহাদের সৃষ্টি মানুষের বাহিরে, এবং তাহার উপভোগও মানুষের বাহিরে হয়। আমাদের গোষ্ঠলীলায়, আমাদের রান্নাঘর ও ক্ষীর ননীর ভাণ্ডার ঘর হইতেই বৈষ্ণব-কবিতার রূপক ও ভাবগুলি বিকাশ লাভ করিয়াছে, মানুষ ও প্রকৃতির বাহিরে বেড়া-দেওয়া সুদূর "ময়খানা"-উৎসব ঘরে নহে। জীবনের Concrete বস্তুতন্ত্র ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া তাহা জীবনকে এমন ভাবে নিবিড় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে।

সাধারণের সাধনা মাত্র, কবির ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনার বস্তুতন্ত্র অভিজ্ঞতায় তাহার বিকাশ নহে।

গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন,—

শুনইতে কানু মুরলী রব মাধুরি
শ্রবণ নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন যুগল ঝাঁপলু
তবু মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহলু মা তোয়।
ভরমহি তা সঞে নেহ বাঢ়াওলি
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনিগুণ পরখি পরখ রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়াবি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম জলদ রস আশে।
সো অব নয়ান নীর দেহ সিঞ্চই
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে॥

প্রেমের প্রকাশ ও বিস্তৃতি হইতেছে অন্তরের বেদনার ভিতর দিয়া। কানুর পিরীতি জাতি কুল ছাড়া, "ধরম করম সরম ভরম কিবা জাতি কুল তার"; সকল ত্যাগ করিয়া সুখের ঘর অনলে পুড়াইয়া, লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য বরণ করিয়াই কানুকে পাওয়া যায়।

Tennyson এ মানবীয় প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা ও শোধন পাওয়া যায়-Browning আরও উচ্চস্বর-গ্রামে উঠিয়াছেন। এমন কি সেই নিত্য

পুরুষ ও বিতানারীর ভাবও Browning এ পাওয়া যায়। One word more এর মূল কথা এই যে শিল্পীর দুইটা দিক আছে, একটা দিক দিয়া সে র‍্যাফেলের মত ছবি আঁকে, ডান্টের মত মহাকাব্য লিখে, সেই দিক সে পৃথিবীর নিকট প্রকাশ করে, কিন্তু আর একটা দিক দিয়া কবি বা শিল্পী তাহার নিভৃত আত্মা নির্জ্জনে প্রেমাস্পদের নিকট প্রকাশ করেন। কবির এই গোপন আত্মপ্রকাশই তাঁহার জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের জিনিষ।

উচ্চদরের পাশ্চাত্য প্রেমসাহিত্যের সব স্থানেই যুগলপ্রেমের প্রতিষ্ঠা। কাব্যজগতে একটি পুরুষ ও একটি নারীর সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠা সে হিসাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম যুগলের প্রেম নহে। কারণ রাধা ত প্রিয়ের ভুজবন্ধনে আবদ্ধা একটি নারী নহে। জগতের নিখিল জীবই সেই রাধার ভাবে কৃষ্ণানুগতা ও কৃষ্ণপ্রেমাধিকারিণী। কৃষ্ণ যে ব্রজবল্লভ এবং তিনি যে গোষ্ঠলীলায়, ঝুলনে, রাসলীলায় সকলকেই মিলনানন্দ ভোগ করান।

সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলিল শ্যামের সনে॥
ব্রজ-নারীগণ দেখিয়া তখন
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন করল বচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়।

আবার জ্ঞানদাস গাহিতেছেন,—

ব্রজ রমণীগণ হেরি হরষিত মন
নাগর নটবর রাজ।

নটন বিলাস উলাসহি নিমগন
চৌদিকে রমণী সমাজ ॥
যূথে যূথে মেলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলী ধরিয়া সুঠাম।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ
মাঝহি রাধা কান ॥

রাধা যে শুধু একক ভাবে মিলন-সম্ভোগ করেন না, তাহার প্রিয়-সহচরীগণেরও ব্যাকুলতা মিটাইবার সুযোগ দান করেন ইহাতে একের বহুর জন্য আত্মবিলোপ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বীয় অধিকার হইতে আপনি আপনাকে বঞ্চিত করা, একের উৎকর্ষ সাধনকে বহুর ভোগের জন্য উৎসর্গ করা—সার্ব্বজনীন বিশ্বধর্ম্মের ভবিষ্য ক্রমবিকাশে এই ভাবের মর্য্যাদার ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে।

গোপিকাগণের মধ্যে রাধার প্রাধান্য ও গৌরবের কারণ এই যে আত্মার ক্রমবিকাশে এমন স্তর আছে সেখানে ভগবানের সহিত সম্ভোগে দেহের ভাবগুলি একেবারে বা কমবেশী অন্তর্হিত হয়। রাধার ভাব সখীগণ অপেক্ষা উচ্চ-স্তরের সাধন-অবস্থা বোঝায়।

রাধা যে বহু আর সেই এক অদ্বিতীয় রাস-বিহারী যে যূথে যূথে মেলি বহুর সঙ্গে একই কালে লীলা করিতেছেন, ইহা একটা religious concept গভীর সাধনা ও নিবিড় অনুভবের ফলবদ্ধ তত্ত্ব। উপনিষদ্-বেদান্তের ভিতর দিয়া যে সাধনার ধারা অব্যাহত ভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার চূড়ান্ত ফল। এই ভাবটি আমাদের বৈষ্ণব-কবিতা ও ধর্ম্মের মূলভিত্তি। ইহাকে স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াই কবিতাগুলা লেখা হইয়াছে, সুতরাং রাধার ভাবে জীবের একাত্মবোধের পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ আবশ্যক হয় নাই, কারণ যে সাধনায় ঐ তত্ত্বলাভ হইয়াছে

তাহাই যে এই সকল কবিতার প্রস্রবণ। Tennyson, Browning বা রবীন্দ্রনাথের যুগলপ্রেমের মর্য্যাদার সেই Uniqueness অর্থাৎ এক-সর্ব্বস্বতা ইহার তুলনায় নিতান্ত নিম্নস্তরের সুরে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের "অনন্ত প্রেমে"—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে
মিলন মধুরলাজে,
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।

আবার Browning এর Last Ride Together

And yet—She has not spoke so long!
What if heaven be that, fair and strong
At life's best; with our eyes upturned
Whether life's flower is first discerned
Me, fixed so, ever should so abide?
What if we still ride on, we two,
With life for ever old yet new
Changed not in kind but in degree,
The instant made eternity :—
And heven just prove that I and she
Ride, ride together, for ever ride?

অনন্তপথের যাত্রায় যুগলই যাত্রী আর সে যাত্রায় মুহূর্ত্তও অনন্তকাল হইয়াছে। যুগলের প্রেমে চির জনমের বিরাম লভিল পলকে।

The instant made eternity ঠিক এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথে আছে—

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিয়াছিল কি জাগিয়া
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চির জনমের বিরাম লভিল পলকে
এ কি সত্য !
মোর সুকুমার ললাটফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব
হে আমার চির ভক্ত
এ কি সত্য ?

রবীন্দ্রনাথের প্রেমে জগতের সকল সৌন্দর্য্য যেন প্রেমের প্রকাশ।

"তোমার মুখখানি কালো আঁখি 'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা,
তোমারি ললাটে নব-বরষার বরণডালা !"

আবার,

"কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে
মরণ-বাঁধন মোরে দুই ভুজে বাঁধা রে
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চল বাঁধিতে"

কিন্তু

"নিখিল সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ ফুটাইতে পারেন নাই। একটী প্রেমের বিরহ মিলন সকলের বিরহ মিলন না হইলে যে সে মিলন ব্যর্থ, নিখিলের দুঃখের ভিতর দিয়া একটী প্রেমের বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করিলে যে প্রেম সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, এই Humanism রবীন্দ্রনাথে বিকাশলাভ করে নাই। তাঁহাতে বিকাশ লাভ করিয়াছে প্রেমের একক ভাব, তাহার সৌন্দর্য্য ও নিত্যতা। তাহাই বিশ্বমথন সকল যতন, সকল রতন হার। কিন্তু যে প্রেমের সীথিমূল লেখা অরুণ সিন্দূর রেখা, যাহাকে দেখিয়া নিশির শিশির ঝরে, যাহাকে দেখিয়া প্রভাতে আলোকের পুলক—তাহাত নিখিল মানব জীবনের সুখ সম্ভোগ, দুঃখ বেদনা যন্ত্রণার ভিতর দিয়া অনুভূত হইতেছে না। রবীন্দ্রনাথে প্রেম "স্থির আছে শুধু একটী বিন্দু ঘূর্ণীর মাঝখানে," যে ঘূর্ণী হইতেছে আকাশ সিন্ধুর ঘূর্ণী—কিন্তু Cosmos জগৎ-ঘূর্ণীর মাঝখানে যেমন প্রেমের প্রতিষ্ঠা, তেমনি অনন্ত ও নিত্য Life of humanity মানব জীবনের সুখ দুঃখের ঘূর্ণীপাকের মধ্যে যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা তাহা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না। আর এইখানেই বৈষ্ণব-কবিতার বিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণ শুধু Cosmos বিশ্বের মাঝখানে নহেন অশান্ত বিরাম বিহীন নিখিল মানব জীবনের মধ্যেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা।

অথচ Uniqeness বা একত্ববোধ যাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে তাহা

অন্ত কোথায়ও নাই। নিত্যপুরুষ ও নারীর লীলার কথা পদাবলীতে যেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে সেরূপ অন্ত কোথায়ও নাই—

মা বাপ জনম না ছিল কখন
আমার জনম হ'ল,
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল।
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ
ঘরের ভিতর বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ।

আবার---

মাটির জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চায---
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।

বিপুলা পৃথ্বী ও অনন্ত কাল আমারি কল্পনার ভিতর ছিল। সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ ও কাল লইয়া আমি খেলা করিতাম। সেই কালাতীত কাল হইতে যখন পৃথিবী জন্মায় নাই, দিন রাত্রিও জন্মায় নাই তখন হইতে আমাতে আর তোমাতে সেই নিত্তন লীলা চলিতেছে, আবার যখন তোমাতে আমাতে মিশিয়া গেলাম তখন,---

একূল ওকূল দুকূল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ
কহে চণ্ডীদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ।

রাধা আদি[illegible] আদ্যা নারী ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহু কৃষ্ণস্মৃতি-বিলাসিনী, আবার সকল জীবের মত কৃষ্ণপ্রেমভিখারিণী। বৈষ্ণব কবিতার বড় কথা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের একসর্ব্বস্বতা নহে, রাধার ভাবে জীবের একত্ববোধ এবং কৃষ্ণের ভাবে সেই একের নিকট বহুর আত্মসমর্পণ।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা হইতে অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। পদাবলীর অনুকরণে তিনি অনেক সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও পদাবলীর এই উচ্চ দিকটা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেম-কবিতার মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেই মদনভস্মের পরের—

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে,

তাহার মধ্যে যুগলের একসর্ব্বস্বতাটুকুই ফুটিয়াছে। যুগলের নারীর সৌন্দর্য্য যেন বাহ্যজগতের অপরূপ জ্যোতি। গোবিন্দদাসের একটি গানে রাধার ভাবে এইরূপ একটা বিশ্বের ছবি ফুটিয়াছে।

তোমার হৃদয়ে বেণী-বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ-গিরি কোর।
সুন্দর বদন ছবি কনক-ধূম্র-পিবি
ততহি তপত [illegible]উ মোর ॥
সুন্দরী তোহারি চরণ যুগ ছাড়ি।
গৌরী আবাহনে কাঁহা চলি যাওব
তুঁহু সে হিরণ্ময়ী গৌরী ॥
সিন্দুর সুন্দর মৃগমদে পরশল
এই হৃদয় গেহ মাগি

তুয়া পদতলথ-ভিত্ত রাজহি সৌঁপিনু
সুন্দর সহজ পরাগী॥
কাম সাগরে ত্রাম সহজেই মিলগান
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর কলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দ দাস সুখ চাই॥

কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতার প্রধান তত্ত্বই হইতেছে উপরোক্ত এক-সর্ব্বস্বতা নহে,—রাধার ভাবে নিখিল জীবের সেই অদ্বিতীয় পুরুষের অনুরাগে প্রতিষ্ঠা। এই Humanismটাই, সর্ব্বজীবে এই একাত্মবোধই বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে আধুনিক বিশ্বসভ্যতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ভাব, এবং ইহার বিকাশলাভ আধুনিক সভ্যতাকে নূতন বলে বলীয়ান্। নূতন সম্পদে গৌরবান্বিত করিবে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবগীতি-কবিতা বিশ্বজগৎকে যে এক নূতন দান দিবে এ সম্বন্ধে পরে বলিব, শুধু এখন মনে করাইয়া দিই যে শ্রীচৈতন্যের লীলায় এই Humanism, সকল জীবকে আলিঙ্গন করিবার পতিতপাবন ভাবুকতা চিন্তারাজ্যে ও দৈনন্দিন জীবনে, রাজপুরুষ ও শ্রমজীবিগণের জীবনযাত্রায় এক অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা আনিয়া সুমহান্। বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণরাধার গোপন মিলন ও রাধার জাতি-কুল-ত্যাগের "কলঙ্ক"-কাহিনী বাহির হইতে দেখিতে গেলে নিতান্ত এক-সর্ব্বস্ব মনে হয়,—যেমন রাধার উক্তি, জগৎ শ্যামময়—

শ্যামসুন্দর সরূপ আমার
শ্যাম শ্যাম ধরা ধার
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণ মন

বা——মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে।
সেই তো তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥

অথবা শ্যামের উক্তি,—জগৎ রাধাময়—

গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হ'লো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা-আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে॥

কিন্তু যিনি রাধাবল্লভ তিনিই আবার গোপীবল্লভ, নিখিল জীবের হৃদয়স্বামী। বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা অপেক্ষা শ্রীগৌরচন্দ্রলীলা-প্রসঙ্গে এই ভাবটী বেশী প্রকটিত হইয়াছে।

Sex-Psycholgy লইয়া কথা উঠিয়াছে। ইহাও আবার বলা যাইতেছে যে পদাবলী কাম-শাস্ত্রের মত কামের হাবভাব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছে। অশিক্ষিত পটুত্বের নিদর্শন ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

রসকথাটার ইংরাজী শব্দ নাই। কামশাস্ত্র অথবা Havelock Ellisএর বিরাট গ্রন্থ কামের আবেশের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মনের বিচিত্র বিকার ও বিভিন্ন ভাবের খেলা বর্ণনা করে। বৈষ্ণবসাহিত্য যে রসের বর্ণনা করেন, তাহার উদ্ভব হয় অন্য প্রকারে। আমার নানা স্তরের Personality আছে। একটা 'আমি'—অন্নময় আমি, ভোগময় আমি,

দেহের আমি, ইন্দ্রিয়ভোগ-তৃষ্ণার্ত্ত আমি, কামসম্ভোগের আমি। সেই নিম্নস্তরের "আমির" বর্ণনা কামশাস্ত্র ও Sex-Psychologyতে আছে। আর একটা উচ্চস্তরের 'আমি' আছে—তাহা জ্ঞানময় আমি, আত্মস্থ আমি, প্রেমানন্দ-সম্ভোগের আমি। এই আমিরই বর্ণনা পাওয়া যায় বৈষ্ণবসাহিত্যে।

যেমন জ্ঞানদাসের—

রূপলাগি আঁখি ঝরে গুণ মন ভোর
প্রতিঅঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতিঅঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে।

কিংবা গোবিন্দদাসের—

নয়ান-ভূষণ শ্যাম দরশন
শ্রবণ ভূষণ গুণে
করের ভূষণ শ্রীপদসেবন
বদন ভূষণ নামে।
অন্তর ভূষণ শ্যাম প্রেমমণি
জিনি মন্মথ রাজে
হিয়ার ভূষণ শ্যামাঙ্গ পরশন
ভূষণে কি আর কাজে।
কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার
নাসার ভূষণ গন্ধ
পিরীতি ভূষণ প্রতি তনু মন
কহয়ে দাস গোবিন্দ।

তুরীয় জগতে চির-কিশোরের সহিত নিবিড় মিলনে যে অতীন্দ্রিয় সম্ভোগ হইয়াছে তাহা বৈষ্ণবকবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে—ইন্দ্রিয় রস-বোধকে আশ্রয় করিয়া। এই রসবোধে ইন্দ্রিয়ভোগ নাই, ইন্দ্রিয়ের বিরতি আছে। ভগবৎপ্রেম-সম্ভোগজনিত এই ইন্দ্রিয়-বিরতি বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়দমনের সহায়, যদিও বৈষ্ণব-সাহিত্যের রূপক বা Symbolism টা ইন্দ্রিয়ভোগকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে। হিন্দুই জগতে সব জাতির মধ্যে যুগলের সম্বন্ধকে মলিনতার স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। হিন্দু জ্ঞানচক্ষুতে Sexকে যুগলের আকর্ষণী শক্তিকে সৃষ্টির অনাদি লীলা বলিয়া বুঝিয়াছেন। তন্ত্র-সাহিত্যের ইহাই অপূর্ব্ব ধারণা। এই ধারণার ফলেই,—পরম পুরুষ ও নারীর, শিব ও শক্তির, নারায়ণ ও লক্ষ্মীর সম্ভোগ লীলায় অনাদি অনন্ত সৃষ্টিস্থিতিলয়ের জ্ঞানে—হিন্দু কিশোর-কিশোরীর সম্বন্ধে কলুষের স্পর্শমাত্র আনিতে দেয় নাই। জ্ঞানময় আমি ভোগময় আমির জীবনে যে transfiguration বা ভাববৈপরীত্য আনয়ন করে, তাহাতে ইন্দ্রিয়সম্ভোগও বিশুদ্ধতা লাভ করে। তখন ইন্দ্রিয়গণ স্বকার্য্যে বিরত হইয়া জ্ঞানময় আমির অপূর্ব্ব ও মধুর যুগলপ্রেমের অতীন্দ্রিয় রসাস্বাদনের সহায় হয়,—ইন্দ্রিয়সম্ভোগের মত সে রসমাধুর্য্যভোগে অবসাদ নাই, অশান্তি নাই, অতৃপ্তি নাই। "নিতুই নূতন পিরীতি রতন"। তাহা নিত্য নূতন আনন্দ ও রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ।

মরমে মরমে জীবন মরমে
জীয়ন্তে মরিল যারা
নিতুই নূতন পীরিত রতন
যতনে রাখিল তারা।

নিত্য নূতন আনন্দ টুটে না, ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে,—

"সুজন পীরিতি পরাণ রেখ
পরিণাম কভু না হবে টোট
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার
দ্বিগুণ সৌরভে উঠয়ে তার।"

ইন্দ্রিয়গণ তখন নির্জ্জীব থাকে কিন্তু ভক্তের volition ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাহাদের abstract ভাবগুলা অতীন্দ্রিয় জগতে এক নূতন ও স্থায়ী রস আস্বাদন করে। দেহে ইন্দ্রিয়ের বিকার দেখা যায় না। দেহে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা ইন্দ্রিয়নিরোধেরই নিদর্শন, তাহাকে বৈষ্ণবগণ অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বলেন, যেমন—

"স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।
তত্র রাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চলশূন্যতাদয়ঃ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

বৈষ্ণব-কবিতার এই Psychology মনস্তত্ত্বটুকু না বুঝিলে সব জায়গাতেই উল্টা বুঝালি রাম হইবে। যেমন উল্টা বুঝিয়াছেন শ্রীযুক্ত অজিতকুমার।

নিম্নস্তরে যে ভাবগুলির উদ্রেকে ভোগময় আমির ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্ত হইতেছিল, উচ্চস্তরে সেই ভাবগুলিরই পরিপাকে অতীন্দ্রিয় রসের আবেশ হয়। উচ্চস্তরে রসের আবেশে ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ হয় না, আত্মার আনন্দ হয়। তাহা অত্যন্ত ঘনীভূত ভাব, এবং তাহার দ্বারা হৃদয় পবিত্র হয়। এই মনোঘটিত ব্যাপার বৈষ্ণবমহাজনগণ প্রেমের ব্যাখা করিতে যাইয়া স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন—

সম্যঙ্মসৃণিতঃ স্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যাহার দ্বারা হৃদয় সম্যকরূপে নির্ম্মল হয়, যাহা অত্যন্ত মমতাযুক্ত ও যাহা অত্যন্ত ঘনীভূত, এইরূপ যে "ভাব" তাহাকেই পণ্ডিতগণ "প্রেম" বলিয়া থাকেন। শ্রীভক্তমালগ্রন্থ প্রেমের ক্রমবিকাশের ধারা নিম্নলিখিত ভাবে দেখাইয়াছেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজসুখসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য প্রেম মহাবল॥
অনেক বিপদে মন কিঞ্চিৎ না টলে।
প্রেমের লক্ষণ সেই সাধুশাস্ত্রে বলে॥
সেই প্রেম পরিপাকে হৃদয়েতে হয়।
স্নেহ নাম ধরি সুখ অধিক বাঢ়য়॥
স্নেহ পরিণামে তব মান নাম হয়।
চক্রগতি শোভা হয় রস সুখময়॥
মান পরিপাকেতে বিশ্বাস মিত্র বৃত্তি।
সখ্য দুই ভাতি হয় সুখের উন্নতি॥
প্রণয় বলিয়া তবে হয়তো আখ্যান।
প্রণয়ের পরিপাকে রাগের লক্ষণ॥
বহু যে দুঃখতে সুখ করিয়া মানয়।
ঈষৎ না টলে মন রাগ সেই হয়॥

"আমি" যখন ইন্দ্রিয়প্রীতির ঊর্দ্ধে উঠিয়া জ্ঞানময় হয় তখন সে ভূমাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার অধিকার লাভ করে, সেই চঞ্চল ও চিরন্তনকে ভুজবন্ধনে বাঁধিয়া প্রেমের বিচিত্র রস ধীর ও স্থায়ী ভাবে উপভোগ করিতে পারে।

নিম্নস্তরের “আমির” ভাবের উন্মত্ততা আসে বাহির হইতে। জ্ঞানময় “আমির” রসের আবেশ হয় ভিতরকার সাধনার দ্বারা, Personality উদ্যোগী-ব্যক্তির ইচ্ছার প্রভাবে,—জোর করিয়া। বৈষ্ণবগণের গীতি-কবিতা তাই সাধনার সামগ্রী, বৈঠকখানায় ও মাসিকপত্রে আলোচনার কাব্য নহে। পদাবলীর শ্রোতা ও পাঠকগণ ভক্ত রসিক সাধক না হইলে তাহাদের ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। বৈষ্ণবমহাজনের এক একজন এক একটি ভাবকে চৌষট্টি রসের এক একটি আশ্রয় করিয়া রস ফুটাইয়াছেন। সেই বিশিষ্ট রসের উদ্রেক ও তাহার সাহায্যে ভগবৎ-লীলা-প্রকটনের চেষ্টার দিক হইতেই বৈষ্ণবগীতি-কবিতার বিচার হয়, কাব্য-সমালোচনার মাপ-কাঠি অবলম্বনে নহে। তবুও পদাবলীর কাব্যাংশটুকু সাহিত্য-রসিকেরও উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। যাঁরা রসজ্ঞ নহেন তাঁহারা বাহিরেই থাকুন, কিন্তু বাহির হইতে মাপকাটি লইয়া যেন আত্মার গোপনসম্ভোগের নিভৃত দেশের কথা আলোচনা না করেন।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছে যে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহিল তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা।

ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমব্যথা ॥

অনেকে বলিতে পারেন যে কবি বা গীতিকার যে ভাব মনে লইয়া কবিতা লেখেন তাহারই মাপ-কাঠিতে কবিতা বুঝিতে হইবে, কবির মনেই কবিতার জন্ম ও সার্থকতা। কিন্তু ফুলের গন্ধের সার্থকতা যেমন ফুলের জীবনেই নহে, ভোক্তার সৌন্দর্য্য-পিপাসায়, তেমনি কাব্যেও—

কবি গাহিয়াছেন,

"একাকী গায়কের নহে ত গান, মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আর একজন গাবে মনে ॥

যে ভাবে আমরা বৈষ্ণবগীতি-কবিতার রস আস্বাদন করি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কবিতার সার্থকতার বিচার অসম্ভব। কাজেই বৈষ্ণব-কবিতার সমালোচনায় একদিকে যেমন ভক্তের রসবোধের উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক, অপরদিকে সেরূপ কবির নিজের অন্তরের প্রবেশ পথ জানা উচিত।

কোন কবিতা বুঝিতে হইলে জাতীয় জীবনধারার যে উচ্ছ্বাস হইতে কবিতার জন্ম, তাহার সহিত নিবিড় পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ যেখানে কবিতা রূপক বা প্রতিরূপের অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে সেখানে কবিতার প্রাণের উৎসটির সন্ধান না পাইলে পদে পদে তাহাকে ভুল বুঝিতে হইবে।

হিন্দুজাতীয়-সাধনার অনুবৃত্তির সহিত না মিলাইয়া লইলে বৈষ্ণব-কবিতা বুঝা অসম্ভব। বৈষ্ণব-কবিতা মানবীয় প্রেমের অভিব্যক্তি নহে, ধর্ম্ম-সাধনার—হিন্দু এই ভাবেই বৈষ্ণবকবিতাকেই গ্রহণ করে। কোন হিন্দুই বৈষ্ণবকবিতাকে নিছক মানবীয় প্রেমের প্রকাশ মনে করেন না। যাঁহারা জাতির সহিত রক্তের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই চণ্ডীদাস

ও বিদ্যাপতির সহিত Burns ও Tennyson এর কবিতার তুলনা করেন।

রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমানের কথা একদিকে যেমন আমাদের নিজেদের অন্তরের ভগবানের সহিত নিবিড় মিলনের আস্বাদ আনিয়া দেয়, তেমনি আর একদিকে শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের ভাবোন্মাদ আমাদের মনে একটা সর্ব্বাবরণমুক্ত জীবনের চিত্র ফুটাইয়া তুলে। কেবল মান, অভিমান আছে বলিয়া, যুগলের দৈহিক সম্বন্ধের আশ্রয়ে কবিতা ফুটিয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবগীতি কাম-মূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কতদূর অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণবকবিতা যে সকল রূপক ও প্রতিরূপকে অবলম্বন-করিয়াছে, জাতীয় জীবন হইতে তাহাদের অর্থ ও ইঙ্গিত যেমন একদিকে সহজে গতানুগতিকভাবে আমরা লইয়া থাকি, অপরদিকে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তির আত্মপ্রকাশ দ্বারাও তাহাকে নিত্যই বৈচিত্র্যে ও রসমাধুর্য্যে ভরপুর করিয়া তুলি।

প্রত্যেক ব্যক্তির বিচিত্র রসাস্বাদনের ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রত্যেকের হৃৎ-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করিতেছেন। একদিকে চিরন্তন শিশু-নন্দ-দুলালের নূপুর-কিঙ্কণ, অপরদিকে কুঞ্জবিহারী রাধাবল্লভের বংশীগীতি প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ভগবৎ-মিলনের কত না পুরাতন লীলাকাহিনী, বর্ত্তমানের কত না বিচিত্র লীলা-উপভোগ আনয়ন করে। জীবনের অভিজ্ঞতার সে বিচিত্র লীলা কত না নূতন ভাবে আজ কত লোকের অন্তরে নিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে।

সমাজের জীবনধারার অনুবৃত্তি ও ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাত্ত বৈষ্ণবগীতি কবিতা যে মহৎ ও মধুময় জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় দান করে, তাহার সহিত বোষ্টম-বোষ্টমী-জীবনের কেন

আকাশপাতাল প্রভেদ অবিশ্বাসী প্রতিবাদকারী হয়তো এ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। বোষ্টম-বোষ্টমী তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শের সঙ্গে বিচ্যুতি যে বুঝিতে অক্ষম ইহা মনে হয় না। তাহাদের সঙ্গে যাহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাহারাই বলিবেন,—তাহাদের পতন হইয়াছে, বুদ্ধির দোষে নহে, চরিত্রের দুর্ব্বলতায়। আশাক্ষত অনধিকারীর নিকট অনেক সময়ে বৈষ্ণবগীতিকবিতার ভক্তি ও আত্মসমাগম সাধারণ মানুষের ভাবপ্রবণতা তখন যৌন আকর্ষণ বলিয়া বোধ হয়। ভাবের উদ্দাম প্রকাশই তখন ভক্তির লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। ভাবের নির্ব্বোধ প্রশ্রে ইচ্ছা ও সংযমের শক্তিও দুর্ব্বল হয়। কাজেই ধর্ম্ম তখন বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্য না লইয়া ইন্দ্রিয়ভোগের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। ভাবের বিকার সকল ক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এই বিকারের জন্যই বৈষ্ণবকবিতা আমাদের নিকট অর্থময় ও উপভোগ্য। কিন্তু ভাবের বিকার ধ্বংস-প্রবণ, তাহা জীবন গড়িয়া তুলে না অথচ আমরা বৈষ্ণবকবিতার মধ্য দিয়া যে জীবন গড়িয়া তুলিবার একটা প্রণালী পাইয়াছি তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

চলিত ও সাধুভাষা

চলিত ভাষা ও তরল অনুভূতি

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার সম্বন্ধে সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও তিনি চলিত ও সাধু ভাষার যেভাবে প্রকৃতির বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সবটা মানা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, চলিত ভাষার প্রাণ অনুভূতির তারল্য, সাধু ভাষার প্রাণ অনুভূতির গভীরত্ব। তিনি নানা কবিতার উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ভাবের গাম্ভীর্য্য, আত্মপ্রতিষ্ঠ-ভারিত্ব সাধুভাষা ভিন্ন প্রকাশিত হইতে পারে না; এবং তাঁহার ইঙ্গিত হইতেছে যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবি যে এক্ষণে চলিত ভাষা ব্যবহার করিতেছেন তাহার কারণ শান্ত, আত্মস্থ ধ্যানপরতার পরিবর্ত্তে অধীর আবেগ, বিক্ষুব্ধ চিত্তের খেলা তাঁহাদের ভাবজীবনের অঙ্গ হইয়াছে।

তাঁহার মতের সহিত আমার খানিকটা মিল থাকিলেও আমার মনে হয় তাঁহার সাধু ও চলিত ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ অত্যন্ত স্থূল হইয়াছে, এবং সেই জন্য তাঁহার সেই বিচার বিশ্লেষণের ফললব্ধসিদ্ধান্তের সবগুলি নির্ভুল নহে।

চলিত ভাষা ও গভীর অনুভূতি

প্রথমতঃ ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, চলিতভাষা গভীর ও মহত্ত্বব্যঞ্জক হইতে পারে না। আমাদের আউল ও বাউলের

গানে, রামপ্রসাদী, কমলাকান্তী, ভাটিয়াল গানে, অত্যন্ত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ তাহাদের ভাব অত্যন্ত মহৎ ও গভীর। ধ্যানের আত্মরতি, চিন্তার স্থৈর্য্য ত রামপ্রসাদীর মৌখিক ভাষায় কত বিচিত্র ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—একটা উদাহরণ দিতেছি,—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ কর্‌লে ফলতো সোনা।"

এখানে ভাষা শুধু চলিত নহে। দৈনন্দিন কর্ম্মজীবন হইতে শব্দ ও কল্পনায় imageryটাও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। একই সঙ্গে গানটি মহৎ ও প্রাণস্পর্শী। নিত্য পরিচিত জীবনের ভাবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য পরিচিতের ঊর্দ্ধে এক গভীরতর অনুভূতির সন্ধান আমরা রামপ্রসাদের প্রায় সকল গানেই পাই। এক্ষেত্রে যদি বলি চল্‌তি ভাষা নির্ম্মল আত্মস্থ প্রকৃতির প্রকাশের অযোগ্য, তাহা হইলে তাহাকে অবিচার করা হয়।

সাধুভাষা ও ইঙ্গিতবহুলতা

তবে কোন্ ভাবে প্রণোদিত হইলে অন্তর হইতে চলিত ভাষা ফুটিয়া বাহির হয়? কোন্ ভাবই বা সাধুভাষাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত? সাধু ভাষার উদাহরণ, যেমন রবীন্দ্রনাথের—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত-ক্ষিতি সৌরভ রভষে
ঘনগৌরবে নব-যৌবন বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

ইহার সঙ্গে রবীন্দ্র নাথেরই চলিত ভাষার কবিতা ধরা যাউক—

নীলনবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে
ঘরের বাহিরে।

* * *

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারা দিন আজি খোয়ালে
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।

অথবা রবীন্দ্রনাথের আর একটি চলিত ভাষার কবিতা—

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।"

পাঠকের মনে এই তিনটি কবিতায় কি অনুভূতি জাগায়? প্রথম কবিতায় সমগ্র বর্ষাপ্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ভাবের স্বরূপটি প্রকাশিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতায় বর্ষার এক একটা concrete ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ষার ভৈরবত্ব, নবীনত্ব ও মত্তমদিরতা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কেমন ইঙ্গিতবহুল সাধুভাষায়। ইহা "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" শ্রেণীর কবিতা—তাহারি মত ইহার ইঙ্গিত, ভাব প্রবণতা, তাই তাহারি মত ইহার ভঙ্গিমা ও শব্দবিন্যাস। শেষ দুইটি কবিতায় বর্ষার abstract ভাব-স্বরূপের পরিবর্ত্তে বর্ষার একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

* *

*

চলিত ভাষা ও বস্তুতন্ত্রতা

বর্ষা প্রকৃতির 'মত্ততা,' 'নব অনুরাগ,' পুলক, ও নবীনত্বের পরিবর্ত্তে আমরা এইগুলিতে পাইতেছি নীলনবঘন, রাখাল বালকের কথা দিনক্ষেপ, খেয়াপারাপার বন্ধ হওয়া, বেণুবন দুলা, নদীতে বাণ, ওপারেতে ঝাপসা গাছপালা, মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা, ইত্যাদি। এখানে ভাষার ইঙ্গিত নাই, ভাষা নিত্যপরিচিত চল্‌তি। চল্‌তি ভাষায় হসন্ত শব্দগুলা একটির পর একটি পড়িয়া কেমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ উৎপন্ন করিয়াছে। হসন্ত বর্ণগুলির অবিরাম উত্থান পতন প্রকৃতির নাট্যশালায় একটীর পর একটী বর্ষার অসংখ্য ছবির উত্থান পতনের ন্যায় হইয়াছে। অপরদিকে প্রথম কবিতাটীর ভাষা ও ভঙ্গিমা খণ্ড খণ্ড ছবির প্রকাশ অপেক্ষা একটা অখণ্ড ভাব-স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযোগী। ছন্দের কেমন টানা ধীরগতি, সাধু ভাষার শব্দগুলি কেমন ইঙ্গিতবহুল; স্বরবর্ণগুলিও আমাদের কর্ণকে অবকাশ ও বিশ্রাম দিয়া—ঐ আসে ঐ যেমন—ভাবকে জমাট বাঁধিতে দিতেছে। ধীর, উদাত্ত ছন্দের ও শব্দবিন্যাসের তালে তালে ভাবটি আত্মপ্রতিষ্ঠায় ভরপুর হইয়া মন্থরগতিতে চলিয়াছে। চল্‌তি ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণের খণ্ড খণ্ড ধ্বনিতে বর্ষার খণ্ড খণ্ড ছবি প্রকাশের সুবিধা হইয়াছে, সাধুভাষার স্বরবর্ণের ধীর ও টানা শব্দ ভাবটির আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছে। প্রথম কবিতায় সাধু ভাষার ছন্দের সাহায্যে বর্ষার ভাব—স্বরূপটি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, শেষ দুইটি কবিতার ক্ষিপ্র ছন্দ ও ভঙ্গিমা ও তাহাদের বস্তুতন্ত্র ভাষা অবলম্বন করিলে তাহা হইত না, শেষ দুইটি কবিতায় বর্ষার বাস্তব ছবিগুলি যেরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা প্রথমটির উদার ছন্দ ও ইঙ্গিতবহুল ভাষা ব্যবহার করিলে হইত না। যেখানে ভাবের

স্বরূপ প্রকাশ অপেক্ষা বাস্তব ছবি প্রকাশের প্রয়োজন অধিক সেখানে ইঙ্গিতবহুল সাধু ভাষা না লইয়া চল্‌তি ভাষাকেই আশ্রয় করিতে হইবে। যেখানে রূপের প্রকাশ অপেক্ষা ভাবের ইঙ্গিতবাহুল্য ফুটাইতে হইবে সেখানে ভাষা ইঙ্গিতবহুল, ছন্দ ও ভঙ্গিমা এমন হইবে যে তাহাদিগের চারিদিকে যে ভাবরাশি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহারা গুরুত্ব ও মহত্ব ব্যঞ্জক হয়।

* *

*

ভাবের স্বরূপ বনাম বাস্তব ছবি

রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিতেছেন,—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননি জননী।"

তখন তাঁহার হৃদয়ে দেশ সম্বন্ধে একটা abstract ধারণা জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশমাতার ভাব-স্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে মোহিনী ও কল্যাণী মূর্ত্তিতে প্রতিভাত এই গানে সংস্কৃতের অনুযায়ী ইঙ্গিতবহুল ভাষাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার abstract ভাবটি পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু যখন দেশের ভাবস্বরূপ না হইয়া দেশের খণ্ড খণ্ড concrete বাস্তব ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তখন তিনি সাধু ভাষা ত্যাগ করিয়া চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। গানটির ছবি ও ভাব কেমন সুন্দর বস্তুতন্ত্র হইয়াছে,—ছন্দের গম্ভীর মন্দ্র আর নাই ব্যঞ্জনবর্ণের খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত ধ্বনিতে গানটি মুখর হইয়াছে।

আমার সোণার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

*　　　　*　　　　*

ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি।

*　　　　*　　　　*

"দিন ফুরুলে সন্ধ্যা হলে কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে।
মরি হায় হায় রে॥ ইত্যাদি

আবার যখন এই গানটিতে বাস্তব ছবির অন্তরে স্নেহ, মায়া, প্রভৃতি abstract ভাব হঠাৎ জাগিয়াছে তখন ভাষাও সাধু, ইঙ্গিতবহুল হইয়াছে চল্‌তি ভাষার হসন্তের ঝঙ্কার আর নাই, সাধু ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের সংমিশ্রণে ছন্দটির তখন কেমন টানা মন্থরগতি হইয়াছে।

কি শোভা কি ছায়া গো
কি স্নেহ কি মায়া গো
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।

দেশের বাস্তব ছবির পর ছবি চল্‌তি ভাষার হসন্ত ঝঙ্কারের সহিত ফুটিয়া উঠার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথের সেই মনোহারী ও প্রাণস্পর্শী কবিতা—

"বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুপ মালা
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট-কিরণে ভুবন আলা
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে
আমরা বাঙ্গালি বাস করি সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে।"

ব্যক্তিগত বনাম বিশ্বগত ভাব

আবার হৃদয় ভাবের abstract ও concrete আছে। কবির আবেগ যখন ব্যক্তিগত তখন সেটা concrete.

বিশ্বের দিকে কবির দৃষ্টি তত বেশী নাই, সেখানে কবির ভাষা ইঙ্গিতবহুল সাধু ভাষা না হইয়া চল্‌তি concrete বস্তুতন্ত্র হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের—

আমার সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ফুটবে রে ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙ্গীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

অপরদিকে কবির অনুভূতি যখন বিশ্বচরাচরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত তখন ভাষা abstract ইঙ্গিতবহুল হইবেই।

কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে কুসুমে ডাকি
তুমি তো কোমল বিলাসী কমল দোলায় বায়ু
দিনের আলোক ফুরাতে ফুরাতে ফুরায় আয়ু,

রবীন্দ্রনাথের—

"নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসি
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!"

ইহাতে abstraction এর চরমের পরিচয় পাই। বিশ্ববাসীর নিখিল বাসনার প্রতিমূর্ত্তি উর্ব্বশী।

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদি রক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘু ভার
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনি।

এখানে ভাষা abstract সাধু, ইঙ্গিতবহুল, ছন্দ গম্ভীর, উদাত্ত। আবার "নিরুদ্দেশ-যাত্রা"র ইঙ্গিতগুলা কেমন ইঙ্গিতবহুল ভাষাও গম্ভীর ছন্দে ব্যক্ত !-

"বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়
　　অপরিচিতা
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
　　দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল
দিকবধূ যেন ছল ছল আঁখি
　　অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উর্ম্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
　　চরণতলে
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
　　কথা না বলে।"

প্রেম-কবিতায় চল্‌তি ভাষা

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় যেখানে ভাব ব্যক্তিগত সেখানে ভাষা চল্‌তি concrete বস্তুতন্ত্র। আবার যেখানে abstract প্রেম কবির অন্তর ছাপাইয়া বিশ্বচরাচরের ভাবের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়াছে সেখানে ভাষা সাধু ও ইঙ্গিতবহুল।

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমারি সাধের সাধনা"র
সঙ্গে— "যদি আসে তবে কেন যেতে চায়
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়।

"আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।"

তুলনা করিলে আমরা চল্‌তি ও সাধু ভাষার বিভিন্ন ভাব প্রকাশের উপযোগিতা বুঝিব।

ধর্ম্মসঙ্গীতে চল্‌তি ভাষা

আমাদের ধর্ম্মসঙ্গীতে দেখি, যখন তত্ত্বের বস্তুতন্ত্র জ্ঞান হয় তখন সত্য শিব, সুন্দর, ভূমা প্রভৃতি ছাড়িয়া আমরা দুর্গা, কালী, কৃষ্ণকে আশ্রয় করি,—তত্ত্বগুলি সাধকের নিবিড়তর অনুভূতিতে বস্তুতে পরিণত হয়। তত্ত্বের সত্য শিব সুন্দরের শিব নিবিড়তর পরিচয়ে শিবশক্তির শিবে পরিণত হয়। আমাদের লোকসাহিত্যের চল্‌তিভাষা ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক নিবিড় জ্ঞানকে, দৈনন্দিন জীবনের অন্তরের অবস্তকে অত্যন্ত বস্তুতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে।

শব্দের লঘু-গুরুত্ব

বাস্তবিক কবিতায় চল্‌তি ও সাধু ভাষার অধিকার ও অনধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া যে সূত্রটির ইঙ্গিত করিলাম শব্দ-যোজনায়ও তাহাই খাটে। Abstract ভাব প্রকাশ করিতে সাধু ভাষার ইঙ্গিতবহুল শব্দই প্রশস্ত। একটা abstract ভাব চল্‌তিভাষার ছন্দ ও চল্‌তি শব্দের বস্তুতন্ত্রতাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ করিতে

যাইলে ভাবটির মর্য্যাদা হানি হয়, চল্‌তি ভাষাও তাহার অযোগ্যতার পরিচয় দান করিয়া লজ্জিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মৌখিক ভাষার সুলভ নৃত্যপ্রিয়তায় মুগ্ধ হইয়া এইরূপ ভাব-বিভ্রাট্‌ ও ভাষা-বিভ্রাট্‌ অধুনা বাধাইতেছেন। সাধু ও চল্‌তি ভাষার আলাদা আলাদা অধিকার, তাহা না মানাতে অনেকস্থলে তাঁহার ভাবের গৌরবহানি ও ভাষার পঙ্গুত্ব ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিভ্রাট্‌

গভীর ও মহৎ ভাব অত্যন্ত concrete ইঙ্গিতহীন ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাইলেই ভাবটি দুর্ব্বোধ্য হয়, কারণ ভাবের সেই গুরুভার বহন করিবার ঐ ভাষার সামর্থ্য নাই। রবীন্দ্রনাথ হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি—

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌ল।
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌ল।
মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায়
অর্পিনু হাতে তাঁর
খেদ নাই, আর মোর খেদ নাই।

এখানে "দুঃখের বরষা," "বক্ষের দরজা," "মিলনের পাত্র" অত্যন্ত

ইঙ্গিতবহুল, কিন্তু সমগ্র কবিতার ভঙ্গিমা, ছন্দ ও শব্দবিন্যাস এত concrete করা হইয়াছে যে ইঙ্গিতগুলার পাঠকের মনে যতটা কার্য্য করা উচিত ছিল তাহা করিতে পারে নাই। কবিতার universal বিশ্বমুখী ভাবগুলা ভঙ্গিমার বাস্তবতার জন্য অত্যন্ত খাটো হইয়া পড়িয়াছে, ফলে কবির নিজের অন্তরের দুঃখ আপনার ভাবেও প্রকাশিত হয় নাই এবং বিহ্বলভাবেও হয় নাই। ভঙ্গিমা বা কবিতার বাহিরের কাঠামোটা গুরুত্ব ও মহত্ত্ব ব্যঞ্জক হইলে এই দোষ ঘটিত না। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরীর' 'মৃত্যুর প্রতি,' 'মানস-সুন্দরী'র 'সমুদ্রের প্রতি,' প্রভৃতি অনেক কবিতার ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য থাকাতে অত্যন্ত গভীর ও মহৎ হইয়াও পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য হয় নাই। যে চল্‌তি ভাষার স্বভাবতঃ ইঙ্গিত কম, তাহার দ্বারা অধিক ইঙ্গিত প্রকাশের ভার দিলে তাহার উপর অযথা অত্যাচার করা হয়। "ফাল্গুনীর" এই গানটি ধরা যাউক—

"খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল
খেলতে খেল্‌তে ফল যে ফলে,
খেলার ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
'খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্বলে যে হয় ছাই।"

প্রথম তিন লাইনে খেলার কেমন একটা বাস্তব ছবি প্রকাশিত, ছন্দের কেমন ক্ষিপ্রগতি এবং শব্দগুলাও কেমন বস্তুতন্ত্র,—কিন্তু ঐ বাস্তব ছবির পশ্চাতে প্রকৃতির সৃষ্টির যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা চল্‌তি ভাষার অযোগ্যতা হেতু প্রকাশিত হয় নাই। তাহার পর "ভয়ের ভীষণ রক্তরাগ" ও "খেলার আগুণের" ভীষণ ভাষায় বাস্তব খেলাটুকুর

ছবিও হারাইলাম এবং ইঙ্গিতবহুল ভাষার অতর্কিত ও অনধিকার প্রবেশে মহৎ ভাবটিকেও চিনিয়াও চিনিতে পারিলাম না।

গদ্যে চল্‌তিভাষা

কবিতায় চল্‌তিভাষার বাস্তবতার দ্বারা কিছু ইঙ্গিত তবুও প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু গদ্যে তাহা একেবারেই চলে না। কারণ গদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ভাবগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। ইঙ্গিত যে গদ্যে থাকিবে না তাহা নহে, কিন্তু সে ইঙ্গিত শেষে না হেঁয়ালিতে পরিণত হয়।

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে॥"

ইত্যাদি।

ইহাকে যদি গদ্যে লিখি "আমার সকল কাঁটাকে ধন্য ক'রে ফুল ফুটিবেই" তাহা হইলে ইহা হেঁয়ালি ছাড়া আর কিছু হইবে না। ইহাকে গদ্যে প্রকাশ করিতে হইলে, "আমার সকল স্খলন, পতন ত্রুটির কণ্টককে আচ্ছাদিত করিয়া জীবনের সার্থকতা ও আনন্দ কুসুম হইয়া ফুটিয়া উঠিবে।" এই ভাষা হেঁয়ালি হইবে না! পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্রের ভাষার যে একটা উদাহরণ দিয়াছি—"যে পাওয়া না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে যাচ্ছে, আর ভূমার বাঁশী বাজছে" ইহা গদ্যে একবারেই চলিতে পারে না।

ভাষার যুদ্ধ

প্রমথ বাবু লেখায় ইঙ্গিত-ব্যঞ্জক বহুতর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, অথচ তিনি তাহাকে চল্‌তিভাষা বলিতেছেন। তাঁহার ক্রিয়াপদগুলি ছাড়া তাঁহার ভাষা সংস্কৃতের অনুযায়ী, অথচ তিনি ও

তাঁহার দল বলিতেছেন যে তাঁহারা দক্ষিণ বঙ্গের মৌখিক ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। আমরা পুস্তকে "চল্‌তি ভাষা তাহাকেই বলিব যাহা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীর ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশ করিতে করিতে বঙ্গীয় লেখক সাধারণের মধ্যে চলিতেছে—সেই পারম্পর্য্য রক্ষা না করিয়া আমরা যদি প্রদেশে প্রদেশে মৌখিক ভাষাকে লেখ্য গদ্যে পরিণত করি এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে একটা অনাবশ্যক যুদ্ধ তুলি তাহা হইলে সময় ও শক্তির অপব্যয় হইবে। জাতির এই দুর্দ্দিনে যখন জাতীয় সমস্যাগুলির মীমাংসা করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে তখন কবে কোন ভবিষ্যতে একটি প্রাদেশিক ভাষা সকল প্রাদেশিক ভাষাকে পরাস্ত করিবে তাহার আশা ও প্রতীক্ষা করিবার একবারে সময় নাই।

কৃত্রিম সাহিত্য

আমি বলিয়াছি, আমাদের নব-নাগরিক-সাহিত্য যাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার জন্য আস্ফালন করিতেছে, তাহা কৃত্রিম সাহিত্য। তাহা দেশের ও জাতির concrete বাস্তব জীবনকে আশ্রয় না করিয়া শিক্ষিত সমাজের হাতে বিদেশী সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল ও নবীনচন্দ্রের যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যের বিদেশীয়তা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'মেঘনাদ বধ,' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গোরা,' 'চোখের বালি,' 'পরপারে' প্রভৃতিতে আমরা সেই একটানা পাশ্চাত্যস্রোতের লীলাখেলা দেখিতে পাই। এটা আমাদের অগৌরবের কথা নহে। প্রথমতঃ—আমাদের সাহিত্যে আমরা বিদেশী

জীবনের আস্বাদ পাইয়া জাতীয় জীবনকে আরও নিবিড়ভাবে চিনিতে শিখিয়াছি। আমাদের সাহিত্যের বিদেশীয়তাই গৌণভাবে জাতীয়তার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—পর-দেশী সাহিত্য-স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত দেশী সাহিত্য-স্থষ্টিও হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দেশী সাহিত্যস্থষ্টির অভাব ঘটে নাই।

বিদেশী সাহিত্য-স্থষ্টি কৃত্রিম,—কারণ উহার উৎপত্তি দেশের বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করিয়া নহে, বিদেশীয় জীবনের abstractions অলীক অবাস্তব কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে রচনা-ভঙ্গীটাও কৃত্রিম হইয়া পড়ে। জাতির জীবনের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই বলিয়া প্রকাশ-প্রণালী-সহজ, সরল না হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমাদের নব-নাগরিক-সাহিত্য অনেক স্থলে এরূপে বিদেশী সাহিত্য-স্থষ্টিরই পরিচয় দান করিয়াছে, এবং রচনা-কৌশল একবারে অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইযাছে।

লিপিকৌশল প্রয়োজনের দাস

আর্ট মানে এ কখনও নহে, সহজ কথা কঠিনভাবে বলা! সাহিত্যে জীবনের প্রকাশ। জীবন সহজ, সরল পথ খুঁজে। যে আর্ট বা লিপি-কৌশল সহজ নহে, সরল নহে, যাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য সাধন দরকার—সে আর্টের আবার আকর্ষণ বা প্রয়োজন কোথায়, সে আর্ট একবারে অকেজো—ব্যর্থ! এটা স্বীকার করিতেই হইবে, রচনা-কৌশল সাহিত্যের প্রয়োজনের দাস।

রবীন্দ্রনাথ রচনায় একটা নূতন ছাঁদ, নূতন ভঙ্গী আনিয়াছেন। তাহার শক্তি আছে, স্ফূর্ত্তি আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাহার নিয়ম নাই, সংযম নাই। একবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সে সহজ-বুদ্ধির অগম্য

হইয়া পড়ে। এই হালের 'সবুজপত্র' হইতে রবীন্দ্রনাথের লিখন-ভঙ্গীর অনাবশ্যক আড়ম্বরের একটা উদাহরণ দিতেছি,—

"একজন লোক ব্যবসা করচে। সে লোক করচে কি?—তার মূলধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনফা, অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করচে: পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে' না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজচে,—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিক সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাঙ্কে জমানো কোম্পানি-কাগজের কূল ত্যাগ করে', সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কি দেখচি?—না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না পাওয়া-সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেন না, এ যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্চে এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্চে।"

রবীন্দ্রী

এই রকম ঘোর-প্যাচে একটা দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করা সহজ ভাষার উপর অযথা অত্যাচার! যাহার যাহা ক্ষমতা নাই তাহাকে তাহা করিতে দিলে সে যে শুধু নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইবে তাহা নয়, উপরন্তু যে ভাবটীকে সে প্রকাশ করিতে যাইতেছে তাহাকেও হাস্যাস্পদ করিবে; এ যেন কোন রাজা-মহারাজাকে দরবারী-পোষাক পরাইয়া ধূলা-কাদা-মাটী মাখা কুলি মজুরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে নাচিতে বলা।
"না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজবে—সেই

বাঁশি ভূমার বাঁশি।" প্রথমতঃ—"না-পাওয়া"র অর্থই হইতেছে অলব্ধ, সুতরাং এটা পুনরুক্তি! দ্বিতীয়তঃ—ইহার মধ্যে তিনটি কথা, 'অদৃশ্য' 'অলব্ধ' ও 'ভূমা'র আভিজাত্য গৌরব পরিস্ফুট, অথচ ইহাদের বাদ দিলে ভাবটী প্রকাশিত হইবে না! তাহা ছাড়া ভূমার যে অর্থ তাহার উপর এই চল্‌তি ভাষার কোন দাবী নাই। ভূমা বলিলে 'সকল', 'সমস্ত' Aggregate ছাড়া আরও কিছু কিছু বুঝায়। ভূমার যাহা ইঙ্গিত তাহা চল্‌তি ভাষার কোন শব্দ প্রকাশ না করিয়া একটা Concrete অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে। চল্‌তি ভাষার জন্ম মানুষের সাধারণ অনুভূতি বস্তুতন্ত্র ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া। 'ভূমার' পরিবর্ত্তে সে ভগবান্ বা তদনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করিবে,—অথচ রবিবাবুর "ভূমা" কথাটি এইরূপ কোন Concrete-ভাব প্রকাশক নহে।

চল্‌তি ভাষায় বস্তুতন্ত্রতা

যদি চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে চল্‌তি Concrete-ভাব-প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ভাবগুলি যেখানে Abstract সেখানে ভাষা Abstract ইঙ্গিতবহুল, "পোষাকী" হইতেই হইবে, সেখানে লেখা ভাষা এবং সংস্কৃত শব্দ আশ্রয় না করিলে চলিবে না।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। ধরুন 'মধু' শব্দটি। ইহা সংস্কৃতে মধু জিনিষটাকে বুঝায় ত বটেই, তাহা ছাড়া ইহা স্বস্তি ও মঙ্গলবাচক আরও অনেক Abstract অর্থ প্রকাশ করে। মধু শব্দটিকে মিষ্ট বস্তু অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে চল্‌তি ভাষায় ব্যবহার করিলে, তাহা কোন চল্‌তি ভাব প্রকাশক হইবে না। ইহার Abstract অর্থে ব্যবহার লেখা ভাষায় ভিন্ন চলিতে পারিবে না।

রবিবাবুর লেখা হইতে উদ্ধৃত অংশটুকু পড়িলেই মনে হয় একটা উচ্চ ভাবকে জোর করিয়া কাঙালের সাজে সাজান হইয়াছে।

লিখন-ভঙ্গীতে অসঙ্গতি

আমি চল্‌তি ভাষা সম্বন্ধে কোন অগৌরবের কথা বলিতেছি না। চল্‌তি ভাষা আমাদের ঘরের ভাষা, আমাদের কৃষক, মজুর, মুদী, দোকানীর ভাষা। আমাদের জাতির সাধনালব্ধ জ্ঞান তাহার Concrete রূপ পাইয়াছে আমাদের চল্‌তি ভাষায়। উপনিষদ ও বেদান্তের Abstract জ্ঞান পুরাণ ও তন্ত্রের Concreteকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপনিষদ ও বেদান্তের ভাব ও ভাষা, উভয়ই ঘনীভূত, Abstractও আপনাদের আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে গৌরবান্বিত।

তন্ত্র ও পুরাণের প্রকাশ প্রণালী সহজ ও সরল। সূত্রের বন্ধন এড়াইয়া ভাব ও ভাষা কথা ও কাহিনীর বস্তুতন্ত্রতায় মুক্তি লাভ করিয়াছে। উপনিষদ ও তন্ত্র-পুরাণের ভাষা আপনাপন ভাব প্রকাশ প্রণালীর উপযোগী। সেইরূপ আমাদের লেখ্য ও চল্‌তি ভাষা আপনাপন স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশপ্রণালীর উপযোগী। সেইরূপ আমাদের লেখ্য ও চল্‌তি আপনাপন স্বতন্ত্র ভাবপ্রকাশপ্রণালীর উপযোগী। সেইজন্য চল্‌তি ও পোষাকী ভাষাকে এক জোয়ালে জুড়িয়া দিলে ভাব-বোঝাই গাড়ী একবারে অচল হইয়া পড়িবে।

রবীন্দ্রবাবু হালের লিখন-ভঙ্গীতে Abstract ভাব জোর করিয়া চল্‌তি ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন: সুতরাং তাহা কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট হইয়াছে ত বটেই, ভাবগুলি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। সবুজপত্রে রবীন্দ্রী ভাষা কৃত্রিম, আর 'বীরবলী' সেই কৃত্রিম রবীন্দ্রীর কৃত্রিম সংস্করণ।

দেশের ধ্যানীদের ধ্যানলব্ধ ও জ্ঞানীদের জ্ঞানলব্ধ চরমতত্ত্ব সেরা Abstractions গুলি আমাদের চল্‌তি ভাষায় Concrete ও বাস্তবে রূপান্তরিত হয় এবং আকাশের আলোর মত আপনার একমেবাদ্বিতীয়ের অখণ্ডতায় প্রকাশিত না হইয়া আমাদের প্রতি গৃহাঙ্গনের ফুলে-ফুলে, পাতায়-পাতায় আমাদের প্রতি ঘরের কোণের দীপে দীপে আমাদের প্রত্যেক সন্ধ্যার আকাশের তারায় তারায় আমাদের প্রত্যেক নদীতে সন্ধ্যায় ভাসান দীপগুলির মত জ্যোতির্বিন্দুতে ফুটিয়া অনন্তরূপ সাগরের দিকে ভাসিয়া চলে।

যাহা অখণ্ড বলিয়া অরূপ ছিল তাহাই রূপে রূপে খণ্ড হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিল। চল্‌তি ভাষায় এই বাস্তবও খণ্ডরূপে প্রকাশ। যাহা সত্য শিব ও সুন্দররূপে তত্ত্ব ছিল তাহা আমাদের লৌকিক সাহিত্যে, ব্রতকথায়, ছড়ায়, রামপ্রসাদী; ভাটিয়াল গান প্রভৃতিতে Concreteরূপ পাইয়াছে। শুধু চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে নহে,—চল্‌তি ভাষায় জীবনের সব দিকেই Concrete অভিজ্ঞতার প্রকাশ, লেখ্য ভাষা Abstractions লইয়া নাড়া চাড়া করে,—সে Abstractions গুলি চল্‌তি-ভাষায় কিছুতেই খাপ খায় না। রবিবাবুর অনুচরবর্গের হাতে পড়িয়া রবীন্দ্রীতে অনেক সময় তত্ত্ববিচার ও আবোল-তাবোল বকার কোন প্রভেদ থাকে না। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে ছাঁদ, যে ভঙ্গী আনিয়াছেন তাহা বহুকাল টিকিবে কে বলিল ?

নিত্যনূতন লিখন-ভঙ্গী

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা-ভঙ্গী ও বঙ্কিমের রচনা-ভঙ্গীর মধ্যে অনেক তফাৎ। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গী বিভিন্ন। বিবেকানন্দের রচনা-ভঙ্গীর একটা বিশিষ্টতা আছে। আধুনিক যুগেই দুই একজন

প্রতিভাবান্ লেখকের লিখন-ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের লিখন-ভঙ্গীকে পরাজিত করিবে না কে বলিল? বিদ্যা-সাগরী গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রী চলিল না। রবীন্দ্রী চলিবে কে বলিল?

বাস্তবিক লিখন-ভঙ্গী জিনিষটা যুগে যুগে নূতনই হইয়া আসিতেছে। কাজেই নব-নাগরিক-তন্ত্রের লেখকদের মধ্যে অনেকে যখন রবীন্দ্র-নাথের রচনা-কৌশল ও বাক্য-বিন্যাসকে ধরা-বাঁধা রীতির মত অনুসরণ করিতেছেন, তাহাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া ভাষার ব্যাসকূট ও ভাবের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিতেছেন,—তখনি বলিতে হয়—সাহিত্যে আর ভাষার কসরৎ দেখাইবার প্রয়োজন নাই, এখন ভাবের আদর বাড়াইতে হইবে। ভাবকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

ধরা-বাঁধা রীতি

সাহিত্যের ভাবগুলা কৃত্রিম হইয়াছে বলিয়াই প্রকাশ-প্রণালীতে রবিবাবুর লিখন-ভঙ্গী একটা ধরা-বাঁধা রীতির মত অনেক লেখকদিগের ভিতরে মাথা চাগাইয়া দাঁড়াইয়াছে। লিখন-ভঙ্গীকে তখনি স্বাভাবিক বলিব যখন ভাব ও ঘটনা বিশেষে তাহা বিভিন্ন হয়। রবীন্দ্রী লিখন-ভঙ্গীর উপর নব-নাগরিক-সাহিত্য অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়াছে। স্থান, কাল, পাত্র অভেদে তাহা ব্যবহৃত হইতেছে। আকর্ষণটা এত বেশী হইয়াছে যে উহা কেহই এড়াইতে পারিতেছেন না। লেখকের শিল্প ত এইখানেই খর্ব্ব হইয়াছে বলিব যখন স্বাভাবিক ভাবে নহে, একটা বিশিষ্ট লিখন-ভঙ্গীকে চেষ্টা করিয়া স্থান, কাল, পাত্র নির্ব্বিশেষে জাহির করা হইয়াছে।

রচনা-কৌশল জিনিষটার প্রয়োজন ভাবপ্রকাশের জন্য। অনেক

সময় নব-নাগরিক-সাহিত্যে রচনা-কৌশল ভাবপ্রকাশের জন্য নহে, কৌশল দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া রচনা-কৌশল একটা ধরা-বাঁধা রীতি নহে যাহা ত্যাগ করিলে বিপদের সম্ভাবনা। প্রত্যেক সাহিত্যিকের আলাদা-আলাদা রচনা-কৌশল। একটা ধরা-বাঁধা রীতি ব্যবহার করিতে গেলেই সে ভাব অপেক্ষা আপনারি ভঙ্গী জাহির করিতে ব্যস্ত থাকে,—লেখকের নিজস্ব লিখন-ভঙ্গী থাকিলে সে ভাবপ্রকাশের মধ্যে আপনার অস্তিত্ব-টুকুও জানিতে দেয় না।

আসল কথা, এক এক রকম লিখন-ভঙ্গী মনোহরণ করে সত্য, কিন্তু সেই লিখন-ভঙ্গীকে আসল সুন্দর বলিব যাহা মর্ম্মস্পর্শী, কথার কসরৎ যেখানে ভাবের মূর্ত্তিটিকে অস্পষ্ট করিয়া তুলে না। ভাবের সঞ্চারের কষ্টিপাথরে ঘসিলে আসল কি মেকী লিখন-ভঙ্গী তখনি ধরা পড়ে।

অনেকেই জানেন রবীন্দ্রবাবুর কয়েকখান বই লিখন-রীতির দোষে অনুবাদের পর তত মনোহরণ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাংলা ভাষায় যাহা খাপ খাইয়া গিয়াছিল তাহা অনুবাদে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের পরিচয় দান করিয়াছে।

সত্য ও অকৃত্রিমতা

এই ত গেল লিখন-ভঙ্গীর কথা। সাহিত্যের দেহের কথা, জড় অংশের কথা। ভাবই হইতেছে সাহিত্যের ভূষণ। ভাব সত্য, মৌলিক ও অখণ্ড হইলে তাহা কুরূপ ও রুগ্ন দেহের ভিতর দিয়াও ফুটিয়া উঠিবে। আত্মার জ্যোতিকে কখনই অপটু শরীর ঢাকিয়া রাখিতে পারে না,—সাহিত্যের অন্তরের সৌন্দর্য্য বাহিরের শিল্পের খাতির না

রাখিয়াই প্রকাশিত হবে। বাস্তবিক, সত্য ও সুন্দর ভাবের একটা আলাদা শ্রী, সৌন্দর্য্য ও সুষমা আছে যেটা শিল্পীর শিল্পত্ব অপেক্ষা ঢের বড়।

সাহিত্যের ভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় নব নাগরিক-সাহিত্যিকের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে যুক্তি ও তর্কের সাহায্য না লইয়া অশিষ্ট ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন।

ভাব সত্য হওয়া চাই। যাহা সত্য তাহা পূর্ণ। জীবনের একটা ক্ষুদ্র নগণ্য অংশকে খুব বড় করিয়া দেখিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলিলে তাহা অপূর্ণের প্রকাশ, সুতরাং অসত্যের প্রকাশ হইবে। বাংলা সাহিত্যে একশ্রেণীর Realist সাহিত্যিক, নাটক উপন্যাসে জীবনের পাপের, কদর্য্যের, জঘন্যের দিকটা এরূপে বড় করিয়া আঁকিয়া, একটা খণ্ডরূপের সৃষ্টি করিতেছেন। আর্ট ও নীতির যে বিরোধ তাঁহারা সৃষ্টি করিতেছেন তাহার মূল এইখানে। সত্যের পরিপূর্ণ রূপ। সত্যের মূর্ত্তি খণ্ড নহে। আসল আর্টিষ্টকে আপনার সাধের কল্পনার রচনা-মালাটির সবটা গাঁথিয়া তুলিতে হইবে, দুই একটা ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া যদি তিনি ভোগ করেন, ও ভোগ করান, মালার অখণ্ড রূপটি যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে বলিব তিনি ভোগী, তিনি অসত্যের পথে গিয়াছেন। যে আর্ট—এবং তাহাই হইতেছে প্রকৃত আর্ট—সত্যের পরিপূর্ণ রূপ দিতে যাইবে, সে দেখিবে নীতির সঙ্গে তাহার কোন বিরোধ নাই। Conventional morality বা কোন বিশিষ্ট যুগ বা সমাজের নীতির সঙ্গে তাহার বিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু সার্ব্বজনীন নীতির সঙ্গে তাহার বিরোধ নাই। রবীন্দ্রবাবুর "ঘরে-বাহিরে" উপন্যাসে আমার মনে হয় শুধু Conventional morality নহে, সার্ব্বজনীন, সর্ব্বকালের ও সর্ব্বসমাজের নীতিকে অপমানিত করা হইয়াছে।

তারপর যে ভাব সত্য তাহা স্বাভাবিক। তাহা লেখকের ব্যক্তিগত সাধনা ও লেখকের জাতির সাধনা সাপেক্ষ। লেখক কল্পনায় যে বাগান সাজান তাহা ফুল ধরে ও ফুল ফুটায় স্বদেশ ও জাতির মনক্ষেত্রে। স্বদেশ ও স্বজাতির মনক্ষেত্রে কল্পনা-বাগানটি সজ্জিত বলিয়া সে ফুল ফুটাইতে পারে—বিদেশের ভাবে শুধু আকাশ-কুসুম ও কাগজের রং বেরং ফুল ফুটিবে মাত্র—তাহা অস্বাভাবিক, অসুন্দর ও মিথ্যা। নব-নাগরিক-সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাই এরূপ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত।

শেষ কথা—যে ভাব সত্য তাহা প্রকাশিত হয় সহজ ও সরলভাবে। আর্টিষ্টের শ্রেষ্ঠ কুশলতা—সহজ ও সরল রীতিতে। তখন রচনা-কৌশল ও বাক্য-বিন্যাস আয়ত্ব করিবার জন্য সাধনা করিবার প্রয়োজন হয় না। সে আর্ট সোজাসুজি সমগ্র জাতির মর্ম্ম স্পর্শ করে—আপনাকে কোটী কোটী লোকের মধ্যে বিলাইয়া সে আর্ট কালাতিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কোটী কোটী রূপ গ্রহণ করিতে থাকে।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ

হঠাৎ আর্টিষ্ট গণের মত এই যে বন্ধনহীন শিল্পী হইতেছেন "ভালমন্দের দ্বন্দ্বের বাহিরে"। তিনি দ্রষ্টা, ঋষি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাঁহার নাই, তিনি নিয়মের বন্ধন কেটেছেন! রবীন্দ্রনাথ প্রায় একবৎসর হইল যে ধুয়া তুলিয়াছেন তাহারি পুনরাবৃত্তি ইহারা করিতেছেন।

আংশিক সত্য

আমি যে বলিয়াছি, সাধু ও শিল্পীর কার্য্যের প্রভেদ করণ নিরর্থক এবং তাঁহাদের উভয়েরই পূর্ণাবস্থা নহে, সাধনাবস্থা, সুতরাং তাঁহাদের উভয়েরই আচার নিয়ম আছে—এ কথার কোথায়ও প্রত্যুত্তর পাই নাই। সাধু মানে ইংরাজী moralist নহে, সাধু মানে আমরা বাংলায় সচরাচর যাহা বুঝি তাহাই,—সাধু ও শিল্পী উভয়ই জীবনের সমগ্রতাটুকু দেখিতে প্রয়াসী। যখন শিল্পী জীবনের এক অংশটুকুকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখেন তখন তিনি সমগ্রের জ্ঞান হারান। তখন তিনি খণ্ড সত্যের প্রকাশ করেন, বিকৃত, খণ্ড রসের সৃষ্টি করেন। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিরও তখন হানি হয়, কারণ সৌন্দর্য্য যে পরিপূর্ণের রূপ। অপূর্ণ বিকৃত রস যাহাতে প্রকাশ পায় আর্টের মাপকাটিতে তাহা অতি নীচে "শুধু রক্তমাংস, বিষয়-সম্ভোগ ইন্দ্রিয়পরতার অপূর্ণ রসপূর্ণ শিল্প কোন দিন আদর পায় নাই।" ইহা খুব সত্য কথা।

রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'

শুধু রক্তমাংস, ইন্দ্রিয়পরতা আংশিক সত্য,—মাইক্রসকোপের নীচে

একটা গাছের ছালের এক অংশকে খুব প্রকাণ্ড করিয়া দেখিলে যেমন আংশিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় সেইরূপ। রক্তমাংস ও ভোগতৎপরতাকে অনেক বর্ত্তমান লেখকের আর্ট মাইক্রসকোপের মতন প্রকাণ্ড করিয়া তুলিতেছেন, সমগ্র জীবনের দিক হইতে দেখিতে গেলে সে ছবি নিতান্ত খাপছাড়া Out of perspective এবং অসত্য। রবিবাবুর সেই পতিতার প্রতি নির্দ্দিষ্ট সুন্দর কথা—

"আনন্দময়ী মূরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,—
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি!"—

অথবা ডষ্টয়ভেস্কির সেই বাণী—

I am not prostrating before you, I am prostrating my self before all suffering humanity, এ কথা কয়জন শিল্পী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন! রবীন্দ্রনাথ ও Dostoeivesky পাপ ও জঘন্যতার ছবি আঁকিতে যাইয়া একটা পূর্ণজ্ঞান ও অখণ্ড রসবোধের সৃষ্টি করিয়াছেন—আমাদের বর্ত্তমান বাংলা শিল্প সে মহনীয় আদর্শের নাগাল পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের তাপসকুমার পতিতার ভিতর "দেবতার কোন নূতন প্রকাশ" দেখিয়া তাঁহাকেই আহ্বান করিয়াছিলেন,

"আনন্দ মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে প্রভা,
অমৃত সরস তোমার পরকাশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!"

এবং রুশজন-বেদনার বাণীমূর্ত্তি ডষ্টয়ভেস্কি পতিতার ভিতর সমগ্র জনমানবের বেদনার মূর্ত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। জগতের দুইজন

শ্রেষ্ঠ শিল্পী এরূপে ইন্দ্রিয়ভোগের পশ্চাতে যে শাশ্বত সার্ব্বজনীন সত্য লুক্কায়িত আছে তাহাকে বাহির করিয়াছেন।

"নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা"

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের থিয়রি হইতেছে ভোগীর ভোগীত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। তিনি লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়কে দমন রাখিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের সত্যভোগকে নির্ব্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্যবিক্ষোভ তাহার ভয়ে ইন্দ্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই অন্তরায়।" ইন্দ্রিয়ের আবার সত্যভোগ, ইন্দ্রিয়ের আবার দেবতা কোথায়? বড় কবি বড় শিল্পী ভোগের মধ্যে ইন্দ্রিয় লীলার মধ্যের সত্য ও সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পান নাই। ভোগের "সত্য" ভোগের নিগূঢ় তথ্য যদি কিছু থাকে তাহা হইতেছে ভোগের ক্ষণিকতা অসত্যতা ও অসৌন্দর্য্য। বড় কবি ও বড় শিল্পী মাত্রেই তাহা প্রকাশ করেন। তাহাই রবিবাবুর "পতিতা" কবিতায় এই কয় লাইনেই ব্যক্ত—

"দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা
দূর দুর্গম মনোবন বাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।"

TREATMENT OF GUILT.

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নাটকে পাপের অসত্যতার ভিতর দিয়া অনুতাপের দাবানলে চিত্তকে নির্ম্মল শুদ্ধ করা হইয়াছে। মানুষের যে সত্য প্রকৃতি তাহা পাপের সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছে। ঠিক যেন

অগ্নিপরীক্ষা। ইবসেনের treatment of guilt পাপের চিত্র আঁকিবার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। Hawthorne এর The scarlet letter এও ইহাই পরিস্ফুট। আপনি নিজেকে নির্য্যাতন দিয়া নিদারুণ দুঃখভোগের মধ্যে একটি রমণী আপনার দৌর্ব্বল্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে—প্রায়শ্চিত্তের এমন করুণ কঠোর মর্ম্মস্পর্শী ছবি বিশ্বসাহিত্যে বিরল। টলষ্টয় Anna Kareninaর রেলগাড়ীর তলে শেষে আত্মহত্যার শোচনীয় চিত্র আঁকিয়া তাহার ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা দেখাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী কিরূপ ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আপনাকে নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই জানেন। কিন্তু এখানে বাস্তব জীবনের নির্য্যাতন অপেক্ষা ভাবপ্রবণতাই অনুতাপের ইন্ধন জোগাইয়াছে। আর এক প্রকার প্রণালী হইতেছে, জন্মাধিকার ও আবেষ্টনের প্রভাবকে বড় করিয়া তুলিয়া পাপের জঘন্যতাকে খাট করা,—ইহার নিদর্শন টমাস হার্ডির প্রসিদ্ধ Tess উপন্যাস, Strendburg এর Mils Jalia, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের দেবদাস ও চরিত্রহীন।

কিন্তু কোথায়ও "ভোগের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়-লীলার সত্য-সৌন্দর্য্য" প্রকাশ করা হয় নাই। ইন্দ্রিয় লীলা যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, সে বিক্ষোভ, সে উত্তেজনা যে ক্ষণিকের বুদ্বুদের মত। জীবনের স্রোত চঞ্চল হইলেও গভীর। বুদ্বুদ নহে, গভীর ও নিত্যবহমান স্রোতই সত্য।

সমাজের ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্ম

প্রবোধবাবু শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের একটা মত তুলিয়াছেন যে আর্টের জন্ম সাধারণ উদ্দাম মানব প্রকৃতি হইতে; আর্টের

সৃষ্টি হইয়াছে, সমাজের ও ধর্ম্মের সঙ্গে সমাজের বাধা-বন্ধনহীন মনুষ্য প্রকৃতির বিরোধ হইতে। "সমাজ-দ্রোহী আর্ট" নামক উপাসনায় প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি এই মতের আলোচনা করিয়াছি। বিপিন বাবুর কথার সবটা মানিয়া লওয়া যায় না আমি সেখানে দেখাইয়াছি। আর্টের কাজ বিরোধ সৃষ্টি নহে, বিরোধ নিবারণ। আর্ট কোন বিশেষ দেশের বা যুগের নীতি ও সমাজ ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে পারে সত্য,—বাস্তবিক যুগে যুগে আর্ট তাহাই করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু Conventional morality বিশিষ্ট সমাজের ধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সাধারণ সার্ব্বজনীন নীতি ও সমাজ ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা,—এই দুয়ের প্রভেদ আছে। বড় আর্ট কখনও যে সাধারণ সার্ব্বজনীন জীবন হইতে তাহার জন্ম ও পুষ্টিলাভ তাহার মর্য্যাদা হানি করে না। ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সত্য ও সৌন্দর্য্য দেখাইলে সে মর্য্যাদা-হানি ঘটিবে।

কাব্যের বিষয়-গুরুত্ব

ইন্দ্রিয় লীলার যে বিক্ষোভ আছে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া কাব্য লেখা যাইতে পারে। কামোন্মত্ততা, প্রচণ্ড লোভ ও ক্রোধ কাব্যে প্রকাশিত হইতে পারে। অস্কার ওয়াইল্ড বলিয়াছিলেন, রাগের আবেগে ভাল কাব্য লেখা যায়। কিন্তু তাকে ভাল কাব্য বলা যেতে পারে না, প্রকাশের form বা প্রণালী হাজার ভাল হইলেও। খালী বাইরের form কাঠাম বিচারকে আর্টের মাপকাটি করিলে চলিবে না, ভিতরকার Content তত্ত্বটুকুর ও আলোচনা করিতে হইবে। Landor একস্থলে লিখিয়াছেন, "We may write little things well, and accumulate one upon another but never will any be justly called a great poet unless he has treated a

great subject worthily. He may be the poet of the lover and the idler, he may be the poet of green fields and gay society; but whoever is this can be no more, 'A throne is not built of bird's nests nor do a thousand reeds make a trumpet" ছোট বিষয় সম্বন্ধে অনেক খুব ভাল করিয়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু কেহ কখনও বড় কবির আখ্যা পায় নাই যে খুব বড় বিষয় যথাযোগ্যভাবে আলোচনা করে নাই। সে প্রেমিকের অথবা অলসের কবি হইতে পারে, সৌখীন সমাজ তাহাকে আদর করিতে পারে কিন্তু তাহার বেশী সে কিছু নহে।

কাব্যে মুক্তির আস্বাদ

ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ, ক্ষণিক উত্তেজনা—তাহাতে জীবনের কতটুকুইবা অভিজ্ঞতা লাভ হয়—তাহার স্পর্শে স্নেহ, সখ্য, প্রীতিপ্রেম বিকৃত হয় অনন্ত সত্য ও সুন্দর কোথায় লুকায়!

আর্ট সমগ্র জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করে, "সৌন্দর্য্যের গীতি চিরন্তন", যে থামিয়া যাবেই বদ্ধ ক্ষুদ্র আত্মার নিকট। শারদপ্রাতের ও চৈত্রের মধুযামিনীর গীতোচ্ছ্বাস, অরণ্যের পর্ব্বতের সমুদ্রের গান, ঘনঘোর বরষার বজ্রগীতস্বর কে শুনিতে পায়, আকাশের অসীম নীরবতায়,—লোকালয়ের চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতায় কাহার প্রাণ নিশিদিনমুগ্ধ, নারীর গোপনচিত্তে কল্যাণ ও আনন্দের নিত্য বিনিময়, অকলঙ্কিত শিশু হৃদয়ের দিব্যভাব কাহার হৃদয়মাঝে অঙ্কিত, জড় ও চেতনের জীবন ও মরণের রহস্য কাহার নিকট প্রকট,—বিশ্বের মৃত গানগুলি কাহার কাছে নূতন প্রাণ পায়, অ-লোক হইতে কে নূতন সুর খুঁজিয়া লইয়া বিশ্বজগতের প্রভাতীগান গায়, জগতের অশরীরী আশা-

গুলি কাহার হৃদয়ে মুকুলিত হইয়া ফুটিয়া উঠে,—কে বিশ্বপ্রাণ-যমুনার স্রোতে স্নান করিতে করিতে কত পৃথিবী, কত চন্দ্রমা, গ্রহতপনের কত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গীত শুনিতে পায়—সে কি কভু ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে মুগ্ধ,—সে দেহাত্মবোধ হীন, তাহার গানও দেহমুক্ত। ইন্দ্রিয়ভোগ গীতিকাব্যে প্রকাশ কর, কিন্তু সে গীতিকাব্য খুব নিম্নস্তরের।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা

তাই বাইরন অপেক্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর স্থান উচ্চে। শিল্পের জন্য নহে, তত্ত্বের জন্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এত আদর। আর আমাদের রবীন্দ্রনাথের ত কথাই নাই, গীতিকাব্যে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চস্থান দিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না।—গীতিকাব্যে তাঁহার শিল্পের যেমন পরাকাষ্ঠা, তেমনি তত্ত্বের মহিমা।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ কবি, ঔপন্যাসিক নহেন

কিন্তু গীতিকাব্যের প্রাণ ভাবের আবেগ, নাটকের ও নভেলের প্রাণ ব্যক্তিচরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত। কবির জীবনের অভিজ্ঞতা খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হয়, কবির আত্মপ্রকাশ খণ্ডিতভাবে হয় এবং সে আত্মপ্রকাশ আবেগাতিশয্যের মধ্য দিয়া। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এক একটি তত্ত্ব—কলার সৌন্দর্য্যে ও আবেগের প্রচণ্ডতায় মহনীয় মনোমুগ্ধকর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাটক উপন্যাস সেরূপ জমাট বাঁধিতে পারে নাই। 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী' রবীন্দ্রনাথের Lyrical Drama গীতি-নাট্য। নাটকের ব্যক্তির চরিত্রস্ফুরণ অপেক্ষা আমরা গীতিকাব্যের খণ্ড খণ্ড আবেগোচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের সকল

নাটকেই দেখিতে পাই। এবং 'ঘরে বাহিরে' তিনি যে উপন্যাসলিখন-রীতি নূতন চালাইয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার Lyrical genius কবি-প্রতিভার উপযোগী হইয়াছে। এক একটা আত্মকথা যেন এক একটা passionate আবেগোচ্ছ্বসিত কবিতার মত লেখা। সকলেই দেখিবেন, "গোরা" ও 'নৌকাডুবি' অপেক্ষা 'ঘরে বাহিরের' ঢের বেশী ঝাঁঝ। রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গীতিকবিতা লিখিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে আরম্ভ করিয়া তুরীয়ের কথা সবই আমরা তাঁহাতে পাই। শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় অনেক ছাঁটিয়াছেন, অনেক বাছিয়াছেন, তিনি জগৎকে যে উপহার সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু নাটক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পায় নাই। Passion টুকু তিনি ঝাঁঝালো করিয়া ফুটাইয়াছেন কিন্তু passions এর ঘাতপ্রতিঘাত, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সেরূপ তিনি কোথাও ফুটাইতে পারেন নাই। তিনি যে স্বভাবসিদ্ধ কবি, সত্য সত্যই তাঁহার যে lyrical genius. নাটক উপন্যাসে তিনি passions ফুটাতে পারেন। তিনি রং ফলাতে জানেন। চিত্রের কয়েক অংশ অতি উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর করিয়া তিনি আঁকেন, কিন্তু সমগ্রচিত্রের পূর্ণ মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠে না। গাঁছের কয়েকটা ফুল স্তবকে স্তবকে আগুন জ্বালায়, কিন্তু সমগ্র গাছটি পত্র ও পুষ্পে ফুলে ও ফলে মিলিত হইয়া পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয় না।

উপন্যাসে কলুষের স্পর্শ

তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে সাধারণ জীবন সমস্যার উপর নূতন আলোক ফেলিতে যাইয়া স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটি অত্যন্ত বেশী পরিমাণে ও মলিন morbid ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। Hudson

নভেল-সমালোচনার একটা মাপকাটি দিয়াছেন। "If, the spell of the moment being broken, we look back on a novel we have just been reading and become conscious that we have been tricked into strong feeling without sufficient or upon un-worthy cause, that our emotion has been merely factitios and will not stand the impartial judgment of the next day, or that the interest aroused has been of that gross and morbid kind which leaves a taint opon the mind, then no, matter what may be its artistic merits, the book must stand condemned.

কোন নভেল পাঠ করিবার পর তাহার তাৎকালিক মোহ অতিক্রম করিয়া যদি আমাদের পুনরায় চিন্তা করিয়া মনে হয় আমাদের উদ্বেগ কোন বিশেষ অথবা সৎ কারণে জন্মায় নাই এবং পরের দিনের পক্ষপাতশূন্য বিচারে তাহা টিকে না, অথবা বইখানির প্রতি যে আসক্তি হইয়াছে তাহা আমাদের মনে মলিনতা ও কলুষতার স্পর্শ আনিয়াছে তাহা হইলে, বই খানির শিল্পের গুণ যাহাই হউক না কেন নিশ্চয়ই দোষযুক্ত ও নিন্দনীয়।

খণ্ড সত্যের অনধিকার

এই মাপকাটি অবলম্বন করিলে "চোখের বালি" ও "ঘরে বাহিরে"কে দোষ-যুক্ত সাব্যস্ত করিতেই হইবে। যিনি জীবনের একটা সামান্যতম আংশিক সত্যকে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলেন, তিনি কবি, নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিক হইতে পারেন, কিন্তু বড় কবি, বড় নাট্যকার, বড়

ঔপন্যাসিক তাঁহাকেই বলিব যিনি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা দেখাতে পারিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য, বাঙালী গানের রাজা হইয়া জগৎ কবিসভার মাঝে গর্ব্ব করিয়া বিশ্বের নিকট যে একটা নূতনবাণী সে অনিয়াছে তাহা বলিতে পারিয়াছে, কিন্তু আমাদের নাটক উপন্যাস আমাদের আধুনিক জীবন-মরণ সমস্যার মীমাংসা বিশেষ কিছু করে নাই, অনিশ্চিততা ও অবিশ্বাসের অন্ধকারের ধ্রুব স্পষ্ট আলোক দেখাইতে পারে নাই। জ্যেঠামহাশয় নীচজাতির নীচত্ব না মানিয়া তাহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিয়াছেন, আর সন্দীপ উত্তেজনার নেশায় স্বদেশী আন্দোলন জাগাইয়াছিল তাই সে বিফল হইয়াছে, —জাতীয় জীবন-মরণ-সমস্যার আলোচনার এ অংশ বটে, কিন্তু নিতান্ত সামান্য অংশ। দেশের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ সমগ্র জাতীয় জীবনের অতি অল্প টুকু ইহাতে প্রকাশিত। এবং যে টুকু প্রকাশিত তাহাও নিতান্ত ঢালের এক পিট one side of the shield হইয়াছে। 'গোরায়' পরেশ বাবুর উপদেশ ও সন্দীপের প্রতি ঘরে-বাহিরের নিষেধ বাক্য,—দেশধর্ম্ম বিশ্বমানবের বৃহত্তর যোগ হইতে ছিন্ন হইলে সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার নামান্তর হয়, ইহা আমরা মানি। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে, বিশ্বধর্ম্ম দেশের অন্তরের যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অলীক ও বস্তুতন্ত্রহীন। তাহা ছাড়া সন্দীপের দেশভক্তি ধোঁয়ার মত অলীক দেখাইতে গিয়া ঔপন্যাসিক যে নাড়ী ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে বাঁধিয়াছে সেই প্রাণ-নাড়ীর উপর ছুরি চালাইয়াছেন। কল্পনার রংমশালে তিনি যেভাবে যৌন সম্বন্ধ ফুটাইয়াছেন, তাহা আমাদের এবং অন্যের দেশ সত্য বলিয়া কিছুতেই বরণ করিতে পারিবে না—সে যে নিতান্ত atomistic ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব তাহাতে মক্ষিরাণীর জন্য মক্ষি-সমাজ-জীবন চলিতে পারে, কিন্তু মনুষ্য সমাজ-জীবন চলে না। একটা comprehensive ব্যাপক sociolo-

gical outlook সামাজিক্ দৃষ্টি দিয়া দেখিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নাটক উপন্যাসের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের আদর্শ টিকে না।

"ঘরে বাহিরে" প্রমথ বাবুর ব্যাখ্যা

'গোরায়' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের আদর্শ আংশিক ভাবে আলোচিত। কিন্তু "ঘরে-বাহিরে"তে ইহা সবিশেষ পাওয়া যায়। এইবার ঐ বইখানির মূলতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন যে "ঘরে-বাহিরে" তিনি শুধু আপন মনে জালই বুনিয়াছেন, অর্থাৎ এটাতে কোন তত্ত্ব তিনি জাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহা কেবল আর্টেরই সৃষ্টি। কিন্তু তাঁহার পাঠকবর্গের সকলেই ইহার ভিতর বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার একটা মীমাংসা খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য না সম্মুখে রাখিলে বইটির পূর্ব্বাপর কোন সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি লক্ষিত হয় না।

এখন বইটির উদ্দেশ্য বা তত্ত্বের ব্যাখ্যা নানাভাবে করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথচৌধুরী মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন, সন্দীপ হইতেছে নবীন ইউরোপ, নিখিলেশ হইতেছে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও বিমলা হইতেছে বর্ত্তমান ভারত। বিমলা "এই দোটানার ভিতর পড়েই নাস্তানাবুদ হচ্ছে—মুক্তির পথ যে কোনদিকে তাহা খুঁজে পাচ্ছে না"। এই symbolism রূপকটুকু আগাগোড়া টানিলে বইয়ের ভিতর আমরা কি নবীন ইউরোপকে সন্দীপের বেশে কেবল Nietzcheর জোর যার মুল্লুক তার থিয়রি সপ্রমাণ করিতে দেখিতেছি? Patriotismটা ইউরোপে কি শুধুই প্রচণ্ডক্ষুধা ও কামোন্মত্ততার রূপে দেখা গিয়াছে? নিখিলেশের সহিষ্ণুতা যাহা এক প্রকার দুর্ব্বলতারই নামান্তর তাহা কি সনাতন ভারতবর্ষের আসল প্রকৃতির পরিচয়! আর বিমলা কি পাশ্চাত্য-

সভ্যতার রংমশালে মুগ্ধ ভারতের অন্তরাত্মার প্রতিমূর্ত্তি! বাস্তবিক প্রমথবাবুর রূপক কিছুতেই গল্পের আগাগোড়ার সহিত খাপ খায় না।

নারী-সমস্যার আলোচনা হিসাবে অসম্পূর্ণ

"ঘরে-বাহিরে"কে যদি বর্ত্তমান নারীশিক্ষা সমস্যার মীমাংসা ধরা যায় তাহা হইলেও ইহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। প্রথমতঃ আমাদের দেশের বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা যে রমণীর হৃদয়ে লালসাবৃত্তিকে প্রবলভাবে জাগাইয়া তুলিবে এবং স্ত্রীলোককে ঘর হইতে টানিয়া আনিলে সে মাতা না হইয়া রমণী বা কামিনী হইবে, এই দিকটাই রবিবাবুর উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষার আসল সমস্যা হইতেছে এইটা, যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের ভিতর দিয়া জন্মের ও শিক্ষার সার্থকতা, না শ্রম জীবনে পুরুষের সহিত সহকারিতার দ্বারা! স্ত্রীলোক জননী হইয়া জাতির প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে, না শিল্পে রাষ্ট্রে সমাজে পুরুষের সহচরী ও সখী হইয়া করিবে? এই ভাবে নারী সমস্যার আলোচনা করিলে বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-সমস্যা পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতাম, কিন্তু ইহা না করিয়া রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত স্ত্রী-পুরুষের passion এর দিকটা মলিন morbid ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, ফলে আর্ট হিসাবে ও তত্ত্ব হিসাবে উভয় হিসাবে বইখানা খাটো হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের নারীসমস্যার ত খুব কমই ইঙ্গিত ইহাতে পাওয়া গিয়াছে।

স্বদেশীর আলোচনা হিসাবে অসত্য

তাহার পর যদি বইখানিকে বর্ত্তমান দেশসেবাপদ্ধতির আলোচনা বলিয়া ধরি তাহা হইলেও আমরা যে মীমাংসা পাই তাহাতে কিছুতেই

তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। প্রথমতঃ সন্দীপের বাজার-পোড়ানো ও Picketting স্বদেশ ভক্তিকে যদি নবীন ভারতের ভাব বলি তাহা হইলে নবীন ভারতকে স্বদেশিকতাকে অপমানিত করা হইবে নবীন ভারতের স্বদেশ ভক্তিকে কেরোসিন তেলের আগুনের মত ভাবিলে অত্যন্ত অন্যায় ও নিতান্ত অবিচার করা হয়। নূতন ভারতের স্বদেশ প্রেম এখন অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক এবং বিচিত্র পথে বিচিত্র কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিচিত্র ত্যাগের মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নূতন কর্ম্মজীবনের নূতন কর্ত্তব্য ও সমস্যার দিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ—সনাতন ভারতবর্ষের সর্ব্বসহনশীলতা কি নিখিলেশের জড়ভরতত্বর দ্বারা সঠিক প্রকাশিত? নিখিলেশের Passivityকে কখনই আমাদের কর্ম্মযোগীর দেশে বড় আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

বস্তুতন্ত্রহীন

তাহা ছাড়া আমার মনে হয় নিখিলেশের চরিত্র মনস্তত্ত্ব হিসাবে অসত্য ও অসম্ভব। সন্দীপ, বিমলা ও নিখিলেশ তিনটিই বস্তুতন্ত্রহীন কেবল তত্ত্বমাত্র বলিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধটাও সেইরূপ বস্তুতন্ত্রহীন। কোন সত্যকার স্বামী নিখিলেশের অবস্থায় পড়িলে এরূপ করিতে পারে কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ—ইহা কেবল বস্তুতন্ত্রহীন আর্টের জালবুনানি।

আর বিমলাকে বাহিরের একটা নৈতিক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে আনিয়া তাহাকে পুনরায় ঘরে টানিয়া লওয়ার শুধু একটা মনস্তত্ত্বঘটিত কারণ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। উপন্যাসে তাহার ফিরে আসাটাই যদি প্রতিপাদ্য বিষয় হয় তাহা হইলে তাহাকে শুধু মানসিক উদ্বেগের মধ্যে না ফেলিয়া সামাজিক ও অন্যান্য নির্য্যাতন ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়া নির্ম্মল ও শুদ্ধ

করা উচিত ছিল। বিমলার বাহিরে যাওয়াটা কেবলমাত্র মনস্তত্ত্ব ঘটিত ব্যাপার নহে।

ইহা সকল দেশে ও সকল সমাজের মূলে কিরূপ আঘাত করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, অথচ ঔপন্যাসিক তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত বস্তুতন্ত্রহীন আর্টথিয়রির খাতির রাখিতে গিয়া তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করেন নাই।

শিল্প ও তত্ত্বের খর্ব্বতা

বিমলার বাহিরে বেড়ানো—উভয়তঃ মনে ও স্থূলে তাহাকে যে পাপের স্পর্শ দিয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত কেবলমাত্র মনোজগতে হইলে, পাঠকের মনে বিমলার প্রায়শ্চিত্তটার যে মূল উদ্দেশ্য তাহা হারাইয়া যায়। বিমলার প্রায়শ্চিত্তের তীব্রতা রবিবাবু কিছুই ফুটান নাই—ইহাতে শুধু তত্ত্বের কেন শিল্পেরও খর্ব্বতাই প্রমাণিত হইয়াছে। ঘরে-বাহিরে বইর নাম। ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া পুনরায় ফেরানোই যদি উদ্দেশ্য, তবে সেই উদ্দেশ্যেরই জন্য বিমলার প্রায়শ্চিত্তটাকে আরো তীব্র করা উচিত ছিল। বিশেষতঃ সন্দীপ সম্বন্ধে বিমলার শেষ উক্তিগুলির ভিতর সন্দীপ হইতে তাহার বিমুখ হওয়াটা সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে হয় না; সন্দীপের মধ্যে "অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে" বুঝিয়াও সে যে পুনরায় আর এক বুদ্ধিতে বলিতেছ—"এই ত মধুর"; এই ভাবটা তাহার শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। শেষে সে সন্দীপকে রুদ্র দেবতার একটা প্রকাশ বুঝিয়া তাহার প্রতি একটা তীব্র মধুর মোহে আকৃষ্ট হইল—এই আমরা বইয়ের শেষে পাই। ঘরে-বাহিরের মূল স্ত্রীচরিত্র সত্যই প্রলয়রূপিণী ও সার্ব্বজনীন সমাজের পক্ষে হৃৎপিণ্ডমালিনী করা

হইয়াছে। তাহাতে প্রলয়ঙ্করী প্রিয়া অর্থাৎ মোহিনীর ভাবটুকু বেশী ফুটিয়াছে, তাহাতে গৃহিণী ও জননীর ভাব তেমন ফুটে নাই।

প্রেমের হীন-আদর্শ

নারী-জীবনের চরিতার্থতা শুধু প্রিয়ার ভাবের চরমবিকাশেও হয় না—একটি ভাবের একাধিপত্যে চরমসুখলাভ সুদূর পরাহত হইবেই। নরনারীর চরম সুখ তখনই হইবে যখন তাহাদের প্রেম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ থাকিবে না, যখন তাহাদের জীবন বাহিরের সমাজ, মানবের ভবিষ্যৎ ও বিশ্বের জীবনের সঙ্গে স্নেহ ও করুণার সম্পর্কে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিকাশসাধন করিতে পারে। এ সম্বন্ধে অনিত্য অসুন্দর ইন্দ্রিয়ের আচরণের একটা বোঝাপাড়া তাহা না করিয়া প্রবৃত্তিগুলিকে নীতি ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলা—এই হইল আর্টের আদর্শ, আর ইহা দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বিশেষ-রসানুভূতির খাতির লইয়া বাংলা সাহিত্যজগতে মাথা চাগাইয়া দাঁড়াইয়াছে! বিড়ম্বনা ত কম নহে।

আর্টের বিদ্রোহিতার মূল কারণ

আমার মনে হয় 'সাহিত্যের এই আদর্শ জীবনের স্থিতির অংশটুকু অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র গতিটাকেই বরণ করিয়াছে। কিন্তু স্থিতি ও গতি লইয়াই জীবন নীতির স্থিতিশীলতা ও ব্যক্তির প্রকাশের গতিশীলতা এই দুইটি লইয়াই জীবন। ইহাদের একটিকে অস্বীকার করিলে সমগ্র জীবনবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমমূলক হয়। আর্টের এই ভ্রমমূলক ধারণার জন্য সাহিত্যের সঙ্গে নীতিবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই কারণে এখানকার হঠাৎ আর্টিষ্টগণ ব্যক্তির প্রকাশের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের মহিমায়

মুগ্ধ হইতেছেন. তাঁহারা জীবনের সমগ্রতাকে অনুভব করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেছেন না।

আর্টের কর্ত্তব্য বোধ

আর্টের এ খণ্ড আদর্শ ধূলিসাৎ না হইলে আমাদের জীবন কথনই সতেজ ও মহৎ হইতে পারিবে না।

এ যুগের ও জাতির নানা কর্ত্তব্য নানা সমস্যা। পুরাতন রীতি নীতি চলিয়া যাইতেছে; নূতন এখনও আসে নাই। বিশ্বে আমাদের স্থান কোথায় তাহা এখনও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। বিশ্বও এখন একটা ভয়ানক বিপ্লবের মধ্য দিয়া আপনার অগ্রসরের পথ খুঁজিতেছে। আর্টের বিলাসিতার সময় নাই। লঘুচিন্তার অবসর নাই আর্টের সৃষ্টিতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এখন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইয়াছে ও সমগ্রের সহিত যোগ হারাইতেছে। এখন সমগ্র জীবনকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে। জীবন 'কি', 'কেন', 'কোন্ পথে' আর্ট ঠিক্ করিবে—আমরা যে সন্দেহ ও অনিশ্চিততার অন্ধকারে দিশেহারা। আর্ট আলোক দেখাক্। বিরোধের মধ্যে জীবনের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিক্। ভয়ের ও অবিশ্বাসের অতীত করিয়া অভয়দান করিয়া, বিপুল উৎসাহ সঞ্চার করিয়া, আকুল আবেগ আনয়ন করিয়া আমাদের সাহিত্যের বিচার করিবার সময় বিশেষতঃ নাটক উপন্যাসের সমালোচনায় আমরা এই মাপকাঠির দিকেই মনোযোগ দিব,—লেখকের তত্ত্বটুকু বাহিরের জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্খার বিরোধ নিবারণে কতটা সমর্থ। লেখকের মৌলিকতা, তাঁহার তত্ত্বের গভীরতা ও দুর্ব্বল জীবনকে সত্যের পথে প্রেরিত করিবার নৈতিক বল হৃদয়ঙ্গম-করিবার মুখ্য প্রয়াসকে যেন শিল্পের রসাস্বাদন চেষ্টা বাধা না।

শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব।

শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নানা গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার "শ্রীকান্তে"। এক হিসাবে "শ্রীকান্ত" যেমন তাঁহার বস্তুগত জীবনের প্রতিরূপ, তেমনি, সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার আর্ট ও তত্ত্বের সম্পূর্ণ অবয়বের পরিচায়ক। তাঁহার মনোগত জীবনের ইতিহাসে ইহা একটা স্পষ্ট পরিণতির সূচনা করিয়া, পরবর্ত্তী রচনার সহিত একটা বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিতেছে। শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গল্প উপন্যাসের তত্ত্বের দিকটা প্রথম পড়াতেই বেশ সুন্দর ভাবে ধরা পড়ে। গৃহ এবং সমাজ-জীবনে স্নেহ ও ভালবাসা স্বাভাবিক আধার হইতে বঞ্চিত অথবা বিক্ষিপ্ত অথবা সমাজের বিধি-নিষেধের জন্য অবিন্যস্ত হইয়া অহরহঃ যে কত গভীর বেদনার, কত দুঃখ-গ্লানি লজ্জার সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের সেই ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, ব্যর্থ প্রেমের বেদনার পুরোহিত। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী লেখার ছত্রে-ছত্রে এই গভীর বেদনা গুমরিয়া-গুমরিয়া উঠিয়াছে,—pathos স্ফুরণে তিনি বাংলা উপন্যাসে অদ্বিতীয়। সমাজ ও গৃহের বিধি-বিধানের জন্য এই ক্ষুব্ধ এবং উৎক্ষিপ্ত ভালবাসার বিহ্বলতা যে গৃহে ও সমাজে কত করুণঘটনায় প্রকাশিত হয়, তাহা অতি ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শরৎ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। "বিন্দুর ছেলেতে" স্নেহ বিবশা কাকীমার অপরিসীম বেদনা, "পল্লী-সমাজে" বিধবা রমার নিষ্ফল ও নিষ্পাপ প্রেম এবং অব্যক্ত ত্যাগ ও দুঃখ, এমন কি "দত্তাতে" ও বিলাস ও রাসবিহারী

কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত দত্তা কন্যার নীরব ভালবাসা, গার্হস্থ্য-বিধান ও সামাজিক ব্যবধানের আঘাতে ক্ষিপ্ত ও চূর্ণ হইয়া, কত না মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীর উপাদান হইয়াছে,—একদিকে ভালবাসা ও স্নেহের নিষ্ফলতা, অপর দিকে অনুদার গৃহ ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাইয়াছে।

শরৎ বাবুর আর একটা বিশেষ কথা বলিবার আছে; সেটা এই; —জীবনে শুধু কতকগুলা দুঃখ ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিবেই, তাহা নহে। জীবনকে ফুলে-ফলে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে,— আর সেই সার্থক করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় ত্যাগ। ঐ ত্যাগই একমাত্র সত্য—গৃহ-ধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম ও ন্যায়ধর্ম্ম এই ত্যাগের কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। যাহার ভিতরে সত্যই এই ত্যাগের শিখা জ্বলিয়াছে, তাহাকে বংশপরম্পরাগত সাধারণ বিধি-নিষেধের মাপকাটীতে বিচার করা উচিত নহে। এইটাই তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যে খুব modern note, এবং এইখানেই তিনি হিন্দু-সমাজকে সঙ্কীর্ণ বিধি-নিষেধ-প্রবর্ত্তিত হীনতা ও দুর্ব্বলতা হইতে উদারতা ও বিশালতার দিকে আহ্বান করিয়াছেন।

এইবার তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনের একটা স্তর-বিভাগ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—

১। প্রথম স্তরে স্নেহ ও ভালবাসা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার জন্য অদ্ভুত ধরণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া একটা দুঃখের ও ত্যাগের উপাদান হইয়াছে।

"রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে,"—গল্পে দুষ্টছেলের প্রতি স্নেহপরায়ণা নারীর ভালবাসা, অভিমান ও কলহের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

"বিরাজ-বৌ" তে স্বামী-প্রেম স্বাধিকার হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া, অভিমানের শিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে মিলনের সার্থকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। "বৈকুণ্ঠের উইলে" ভ্রাতৃপ্রেম অদ্ভুতভাবে স্বভাবে ও শিক্ষার তারতম্য হেতু বিকৃত হইয়া, তাহাদের শত চেষ্টা ও দুঃখকে লঙ্ঘন করিয়া ও যে বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে স্নেহের নৈরাশ্য ও লক্ষ্যচ্যুতির ব্যঞ্জনা বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

২। গৃহ-ধর্ম্মের শাসন ও সমাজের বিধি-নিষেধের জন্য স্নেহ ও প্রেম নিষ্ফল হইয়া পূর্ব্বস্তরের সেই বেদনার ব্যঞ্জনা পুনরায় আরও গম্ভীর ও স্পষ্টসুরে গায়িতেছে। "পরিণীতায়" পিতামাতার অমত ললিতা ও শেখরনাথের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহার আশঙ্কা ও অভিমান শেষে স্নেহের নিকট পরাজয় মানিল। বিদ্রোহ এখনও উত্তপ্ত হয় নাই, শুধু কিশোরীর মৌন সলজ্জ নৈরাশ্য অতি কোমল মধুর ভাবে ফুটিয়াছে।

এই স্তরের গল্প-উপন্যাসের তত্ত্বটী গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া সামাজিক সমস্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও এই সমাজ ও আত্মবিদ্রোহ প্রবল না হইয়া ব্যক্তি-প্রেমের স্ফুরণ ও দুঃখের ইতিহাসের অধীন রহিয়াছে। শ্রীকান্ত ও দেবদাস এই স্তরের সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও সুন্দর অভিব্যক্তি। এখানে প্রায় সকল নর ও নারী সমাজের তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া, প্রেমের সরল ও স্বাধীন প্রকাশে বাধা পাইয়া, সাধারণ জীবন যাত্রা হইতে বিভিন্ন দিকে উদ্দামভাবে ছুটিয়া গিয়াছে। সমাজ-বিদ্রোহ, এমন কি আত্ম-বিদ্রোহ তাহাদের জীবনে ঘোষিত হইয়াছে। এইজন্যই শ্রীকান্ত ভবঘুরে, দেবদাস উচ্ছৃঙ্খল; সাধারণ বিচারে সে উন্মাদ, তাহার কথোপকথন সাধারণের নিকট প্রলাপের ন্যায় পীড়াদায়ক। এইজন্য পিয়ারীর নারীত্ব ও মাতৃত্বের সংঘর্ষ ও

তাহার সার্থকতা এবং অভয়ায় বঙ্গনারীর স্বাভাবিক অন্তর্মুখীনতা ও দুর্ব্বলতা, সহিষ্ণুতা ও পরাধীনতাকে ছাপাইয়া উঠিয়া সুতীক্ষ্ণ, সরল ও সত্যদৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে নির্ব্বিবাদে অসঙ্কোচে তাকাইয়া চলিয়াছে। এইজন্য অন্নদা দিদি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাপুড়িয়ার গৌরবহীন ও অপরিচ্ছিন্ন জীবনের ভিতর যেন সংসারকে বিদ্রূপ করিবার জন্য তাহার সতীধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক অটল ও অবিকম্পিত হস্তে ধরিয়া ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। এইজন্য পার্ব্বতী কখনও তাহার স্বাভাবিক স্বামী-সেবা, কখনও বা অতিথি-সেবা, সদাব্রতের উপর বাধা-বিঘ্নের নিষ্ফলতার মধ্যে একটী তীক্ষ্ণ কৃত্রিম বিসদৃশ জোর দিয়া দেবদাসের প্রতি স্নেহ ও মমতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। এইজন্যই কিরণময়ী একটা তীব্র জ্বালাময় অসঙ্কুচিত বাল্য ইতিহাসের সংযোজক চিহ্নের জীবন্ত রূপ ধরিয়া সমাজ-নিষিদ্ধ কালা-পাণি পার হইয়া কলিকাতা হইতে আরাকান এবং আরাকান হইতে কলিকাতা করিতেছে। সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক অলঙ্ঘনীয় বিধি-নিষেধের একটা নিষ্ঠুর পরিহাস ছুরিকার ঔজ্জ্বল্যের মত মানুষের সরল ও স্বাধীন স্নেহ ও প্রেমকে ত্রস্ত করিয়াছে।

৩। দ্বিতীয়স্তরে যে সকল সামাজিক সমস্যা স্নেহের নিষ্ফলতা প্রদর্শনের কারণমাত্র হইয়াছে, সেগুলি এখন স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থকারের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার বিচারের অপেক্ষা করিতেছে। বিভিন্ন প্রকারের সমাজের আদর্শ ও বিধি এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপর ইহাদের প্রভাব তিনিও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সত্য ও কল্যাণের বাটখারায় ওজন করিতেছেন। বিভিন্ন সামাজিক আদর্শে পরিচালিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কৃত্রিম প্রতিবন্ধক প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া একই সঙ্গে স্নেহের পরিনতি ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতেছে। 'দত্তা' ও 'গৃহদাহ' প্রভৃতি নূতন

উপন্যাসে লেখক সম্প্রতি এইভাবেই চলিতেছেন। দত্তা কন্যা বিজয়া ও নরেনের মিলন এবং বিজয়ার সমাজের ও অভিভাবকের প্রতিকূল বিবাহে যে প্রেমের সফলতা দেখা গিয়াছে, সেই সাফল্য গৃহদাহের বিচিত্র সংঘর্ষের মধ্যে কিরূপে শেষ অধ্যায়ে পরিস্ফুট হইবে, আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। 'গৃহদাহে'র সমস্যাটী 'দত্তার' তুলনায় আরও জটিল হইয়াছে। কারণ বিভিন্ন আদর্শে চালিত অচলা স্বেচ্ছায় হিন্দুগৃহের ও হিন্দুনারীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে। যতদিন অচলার স্বামীপ্রেম পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই সংঘর্ষ ও যন্ত্রণা অফুরন্তভাবে চলিতে থাকিবে এবং অচলার সামাজিক আদর্শের স্মারক ও প্রতিরূপ সুরেশ ততদিনই ধূমকেতুর মত তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া অকল্যাণের পথে লইয়া যাইতে থাকিবে। 'ঘরে বাইরের' নিখিলেশের মত অচলার স্বামীও নীরবে, নির্ব্বিবাদে প্রেমের ত্যাগ ও মিলনের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের জন্য মাতৃসমাজ সেই শেষ সার্থকতার জন্য এইভাবে কি অপেক্ষা করিতেছে না?

'চরিত্রহীনে' দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সমাবেশ হইয়াছে, উহার সমালোচনা একটু পরে হইবে।

শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলিতে চাহিয়াছেন, নর ও নারী যদি আপনাদের জীবনের ত্যাগ ও দুঃখের ভিতর দিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সার্থক করিতে পারে, তাহা হইলে কোন অলঙ্ঘনীয় বিধি-নিষেধের দাবী তাহাদের পক্ষে খাটে না। অবশ্য সকলেই যে এইরূপ ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে পারে তাহা নহে। ইহা অসাধারণ; কিন্তু যে স্থানে ইহার প্রভাব দেখা যায়, সেইখানেই সমাজের বিধিকে তাহার নিকট ঘাট মানিতেই হইবে। তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তত্ত্ব।

বাংলার স্বাভাবিক গৃহ ও সমাজ জীবনে বিধি-নিষেধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে পূর্ণ স্নেহ ও প্রেমের ছবি আমরা সচরাচর দেখি এবং যাহা আমাদের আর সকল ঔপন্যাসিক চিত্রিত করিয়াছেন, শরৎবাবুর নিকট প্রেম সেরূপ স্বাভাবিক ও সহজক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নাই। শরৎ-বাবুর লেখার ভিতর আমরা বিধি-নিষেধের দ্বারা বিপর্য্যস্ত অসমাপ্ত প্রেমের গভীর হাহাকার-ধ্বনি নিয়ত শ্রবণ করি। তিনি যেন গৃহ, সমাজ ও জগৎকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখিয়া নিজের ও আমাদের অন্তঃ-পীড়ার নিগূঢ় রহস্য বাহির করিয়াছেন।

আর এই অদ্ভুত দৃষ্টিই শুধু মানুষের গৃহ ও সমাজকে নহে, তাহার প্রাকৃতিক আবেষ্টনকেও এক অদ্ভুতভাবে অনুভব করিয়াছে। বাংলার মাতৃ-প্রকৃতির কোথাও সেই স্নিগ্ধ, শ্যামল ও হরিৎ কান্তির মাধুর্য্য, ঋতুর সেই সরস ও স্নেহ-বিহ্বল হৃদয়ের আকর্ষণ, বাংলার সুনীল আকাশের কোলে রঙ্গীন মেঘের স্ফূর্ত্তিময় লীলা-খেলা অথবা জ্যোৎস্না-প্লাবিত মত্ত মধু যামিনীর আনন্দ-উৎসব ও অবসাদ, তাঁহার উপন্যাসে আমরা পাই না। শুধু পাই তাঁহার নিকট নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ অমানিশার বিরাট কালীমূর্ত্তি, উগ্রা ও প্রচণ্ডা প্রকৃতির বিভীষিকা, নিবিড় কালরূপের নিদারুণ আহ্বান, অন্ধকার শূন্য, প্রান্তরে ঝড়ের উদ্দাম অনিবার্য্য লীলা ও মানুষের অপমানের মধ্যে অসহায়া এক রমণী, মহা-শ্মশানের অসংখ্য পিশাচের উদ্বেল অট্টহাস্য, কিংবা ভীম-বাহিনী ভাগীরথীর আবর্ত্ত-সঙ্কুল বিপুল ও উন্মত্ত জলস্রোতের উপর ক্ষুদ্র একটী তরণী ও অসহায় মানুষ। প্রকৃতি তাঁহার নিকট করালরূপে প্রতিভাত। অশান্ত ও বিদ্রোহী প্রকৃতির অন্তরাত্মায় নিবিড় অনুভূতি তাঁহার গল্প-উপন্যাসের সমাজ ও আত্ম-বিদ্রোহের সহিত অতি সুন্দরভাবে খাপ খাইয়াছে। আর্টের যে সকল উপাদান তাঁহার উপন্যাসকে এত আকর্ষণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে

তাঁহার তীব্র অনুভূতির আবেগই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার উপন্যাসগুলির আখ্যায়িকাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিতে গেলে আমরা দেখি যে, ঘটনা বস্তু উচ্ছ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাতে ও আবেগের লীলাতিশয্যের মধ্যে প্রকটিত হয়, বাহিরের জীবনের ঘটনাবলীর সহিত তাহাদের সুসামঞ্জস্য ও ক্রমের অভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। বর্ম্মা ও আরাকান যাত্রা বাস্তব হিসাবে তত সহজ ও অনায়াস সাধ্য নহে; যদিও মনের ও বিচ্ছেদ-মিলনের সহিত এরূপ অভিযান আবেগের ঘাত-প্রতিঘাতে জড়িত না থাকিলে তাহাদের বিকাশ সাধন আর্টিষ্টের পক্ষে কঠিন হয়। মনের আবেগ প্রকাশের জন্য যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনাবলীর সমাবেশ করা হয়, সেগুলির আতিশয্যে প্রকৃতপক্ষে আর্টের অনেক সময়েই ক্ষতি হইয়াছে। সুরেশ, নরেন ও সতীশের অকস্মাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব, পিয়ারী, অচলা ও বিজয়ার মুহুর্মুহুঃ ব্যবহারের পরিবর্ত্তন, আখ্যায়িকার মধ্যে ঘন ঘন দৃশ্য-পরিবর্ত্তন, এই সমুদায়ে,—যাহাকে পাশ্চাত্য-সমালোচকেরা bioscopic literature নাম দিয়াছেন,--সেই লঘু ও চঞ্চল ঘটনাবহুল সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি, bioscope এর বিচিত্র আনাগোনার সহিত উদ্বেগের চক্ষু ও অন্তঃপীড়াদায়ক অসহ্য ঘাত-প্রতিঘাত দেখিতে পাই। আর এই দোষ অতিক্রামকভাবে পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকদিগের মত তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়াছে। এটা হয় ত বর্ত্তমান লঘু সভ্যতা-জীবনেরই সৃষ্টি, ইহাকে এড়াইয়া যাওয়া কঠিন।

আবেগের আতিশয্য ও বিলাস একদিকে যেমন উদ্ভট ঘটনা-সংস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে, অপরদিকে সময়ে সময়ে চরিত্রাঙ্কনে ও স্নায়ু-বিকারগ্রস্ত মনুষ্যকে কল্পনা করিয়া, তীব্র আবেগের ক্ষোভ, বিক্ষেপ ও উত্তেজনার ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে একটা মোহ ও মত্ততা আনিয়া দেয়। আমার মনে হয়, এই ধরণের উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

"শ্রীকান্তের"ই ভিতর একটী আটৌচিত সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছে,—দুঃসহ দুঃখ ও ত্যাগের শিখায় ইন্দ্রিয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া পুড়িয়া শান্ত ও মহিমামণ্ডিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মতন শরৎবাবুর উপন্যাসে যে ত্যাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেক সময়েই সমাজের নিয়ম ও বিধি-নিষেধের অনুমোদিত আকাঙ্ক্ষিত ত্যাগ। যেন লেখক সামাজিক সমস্যা ভুলিয়া অবশেষে সমাজকেই একমাত্র বিচারক করিয়া বসিলেন। "চোখের বালির" বিনোদিনীর ত্যাগের মত ইহা নীতির ত্যাগ, এবং শিল্প-সাহিত্যের দিক হইতে ইহা ভিতরে ভিতরে অসংলগ্ন, লক্ষ্যভ্রষ্ট,—বস্তুতন্ত্রহীন। শিল্প-সাহিত্যের একটা আন্তরিকতা ও সরলতা আছে এবং সেই শিল্পীই প্রলয়ঙ্কর আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বিক্ষোভ ও মত্ততা বিচিত্র করিবার অধিকারী, যিনি দেখাইতে পারেন, আবেগ তাহার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে রূপান্তরিত হইয়া জীবনের সমস্ত দিকে, কেবলমাত্র প্রিয় বস্তুর দিকে নহে, একটা শান্তি-রস আনিতে পারে, যাহাতে আপ্লুত হইয়া সমস্ত স্নায়ুবিকার ও মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। বড় আবেগের পরিণতি ছোট ত্যাগে হয় না। স্বাভাবিক বৃত্তির বিপ্লবের সমাপ্তি একটী কৃত্রিম বিধি বা বহির্জ্জীবনের নীতির নিষেধের চাপা আর্ট সাহিত্য বা জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ ও সত্য নহে। নব-জীবনের নূতন স্বাভাবিক বৃত্তির দ্বারা পুরাতন উদ্দাম প্রবৃত্তি-নিচয়ের সার্থকতা ও সমাপ্তি যেমন আমরা Tolstoy এর Resurrection ও Anna Karenina বা Dostoieffskyর Crime and Punishmentএ, Hawthorneএর Scarlet Letterএ অথবা Strindburgএর There are Crimes and Crimesএ দেখিয়াছি, তাহা আমরা বিমলায় বিনোদিনীতেও পাই না, পার্ব্বতীতেও পাই না, সাবিত্রীতেও পাই না।

অভিসার-যাত্রা করিতে হইলে অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, ঘরকন্নার অভাবে কাশীবাস, বাঞ্ছিতের অভাবে সদাব্রত ও অতিথিসেবা, প্রেমের প্রতিদানের অভাবে সপত্নীর নিকট প্রিয়-সমর্পণ,—এ সকল মামুলী ত্যাগ বটে, এবং অনেক শিল্পীর পক্ষে ইহাই সমস্যাসমাধানের সহজ পন্থা, কিন্তু ইহাতে সরল সত্য, স্বাভাবিক পরিণতি নাই,—এক কথায় জীবনকে প্রচুর ও গভীরতর ভাবে ফিরে পাওয়া যায় নাই। ইহা শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টের অভীষ্ট বস্তু যে ত্যাগ, তাহা নহে।

প্রলয়ঙ্কর বিক্ষোভ ও স্নায়বিক উত্তেজনা শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আছে; কিন্তু বিপ্লবের অনুযায়ী সেই মহৎ ত্যাগ ও রূপান্তর সেরূপ ফুটে নাই। বিনোদিনী, বিমলা ও কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনের হুল ও বিষ এইখানেই। ভবিষ্যতে এই ত্যাগ ও রূপান্তর পূর্ণভাবে ফুটিলে বাংলার সাহিত্য-শিল্পের সার্থকতা।

দেবদাস, সুরেশ, সতীশ ও কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনে লেখকের আর্ট অতর্কিতে যদি আবেগের অধীন হইয়া স্নায়বিক বিক্ষোভ ও বিকারের মধ্যে একটি অসাম্য ও কেন্দ্রচ্যুতি আনিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই ত্রুটী, এই দোষটুকু ত আমরা স্বীকার করিয়া* লইব; কারণ, সাহিত্য-জগতে যে দু'চার জন নিছক কল্পনার প্রভাবে নহে, গভীর ও জীবন্ত অনুভূতির দ্বারা, জীবনের দুঃখ ও নিষ্ফলতার নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দিবার সত্যকার অধিকার পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কিন্তু বিপ্লবের মত ত্যাগের দিকটি তিনি আরও ফুটাইয়া তুলুন; তাহা হইলে স্নায়বিক বিক্ষোভের দোষটুকু সমাজ ও সাহিত্যের গায়ে হুল ও বিষ ফুটাইতে পারিবে না। শুধু সীমারেখাটী অতিক্রান্ত হইলেই টগর ও মাইস্ত্রীর বিকৃত জীবনের উদ্ভট চিত্রের মত সংক্ষুব্ধ প্রেমের আলোড়নে সমাজ-বিদ্রোহের সমস্যা না করিয়া, উদার অথবা অনুদার গৃহ ও

ন্যায়ধর্ম্মের বিচার না আসিয়া, অস্বাভাবিক উত্তেজনার উপকরণ গৃহ ও সমাজকে একটা অসত্য ও অকল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে; জগতে নারীর অন্তরে যে মাতৃরূপা রাজলক্ষ্মী চিরকালের জন্য অমর হইয়া আছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাই-ওয়ালী পিয়ারীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

ভাব বিপর্য্যয়ে আমরা না-ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, যাহা রোগের বীজ, যাহা অন্যায়, যাহা অধর্ম্ম,—সে রোগের বীজ কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে যেমন, সেরূপ সার্ব্বজনীন সমাজ ও সাধারণ সুস্থ সবল জীবনের পক্ষে নিতান্ত মারাত্মক।

আবেগের আতিশয্য একদিকে ঘটনা-সংস্থানের দিক হইতে যেমন ঘটনার সুসামঞ্জস্য, অভাব ও লঘু চঞ্চল ঘটনা বাহুল্য আনিতে পারে, অপর দিকে চরিত্রাঙ্কনে ও সাম্যের অভাব ও লঘু-চঞ্চল প্রকৃতির বিসদৃশ উত্তেজনাও আনে। মানভিক্ষা, সাধাসাধি, কান্নাকাটি, অনুনয় বিনয় অফুরন্ত ও অসহ্য ভাবে ক্রমাগতই চলিলে, স্নায়বিক বিকার-গ্রস্ত মনুষ্যের জীবনব্যাপী-বিক্ষোভ, ও একপ্রকার titilation of the senses; ইন্দ্রিয় ভোগের চঞ্চললাস্য ও মুহুর্মুহু চৈতন্যের আচ্ছন্ন ভাব আর্টের গাম্ভীর্য্য ও স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। আর এই titilation of the senses এর দোষ এই যে, কখন সুন্দর ও কল্যাণের সীমা রেখাটা অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা শীঘ্র চোখে পড়ে না। সাবিত্রী ও সতীশ, কিরণময়ী ও সতীশ, কিরণময়ী ও উপেন, কিরণময়ী ও দিবাকর প্রভৃতির কথোপকথনে মধুর রহস্যালাপ, মানভিক্ষা, অনুনয়-বিনয় অভিমান-পরিহাসের পালার আতিশয্যে অতর্কিতে যে অবোধ বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অপরিণামদর্শীর অন্তঃকরণে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া যে বিষ-বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে, তাহা

অসম্ভব নহে ; অথচ, যাহা তাহাদিগকে পাঠান্তে বিশ্লেষণের অবকাশের পর ক্ষুব্ধ চমকিত করে, তাহা মধুর ও চিত্তাকর্ষক ভাবে অন্তরে তাহার অধিকার পূর্ব্বেই বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা যে পূর্ব্বে "চরিত্রহীন" উপন্যাসে শরৎবাবুর ঔপন্যাসিক জীবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সমাবেশের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, স্নেহ ও ভালবাসা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন আদর্শ ও বিধি, অথবা গৃহের ন্যায়ধর্ম্মের দ্বারা ক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত ও নিষ্ফল হইয়া গভীর বেদনার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সামাজিক সমস্যাগুলি,—"চরিত্রহীনে" যাহা আমাদের বিচারের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা সত্য সত্যই প্রেমের ব্যর্থতা ও ব্যক্তিগত জীবনের নিষ্ফলতার ইতিহাসের অধীন হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার সকল উপন্যাসের মতই প্রেম এখানে বিধি নিষেধের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া অন্তস্তলের আলোড়নে রক্তে ভিজিয়া ভারী ও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, প্রেম প্রেমই। প্রেমকে বিজ্ঞের দল নিজেরাই বিধি-নিষেধের গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া ঘৃণিত, অবৈধ ও কুৎসিত বলিলেও, তাহার দাবী অবজ্ঞা করিবার নয়। যদি তাহাতে পৃথিবীতে অন্যায়, ভুল, ভ্রান্তি আসে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া প্রশ্রয় দিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, অন্যায়, অধর্ম্ম, পাপ দুঃখের বাঁকা পথ দিয়া রঙীন্ রেখার মত ন্যায়ের আলোক দয়া, মায়া, ক্ষমায় বিচিত্র হইয়া দেখা দেয়। যদি আর্টের দায়িত্ব সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া প্রকাশ কর, তাহা হইলে যাহা সুন্দর নয় তাহাকে অসুন্দরের হাত হইতে বাঁচাইয়া তোলা তাহারই আর একটা কাজ। পাপ দূর করা যদি সমাজের পক্ষে অসাধ্য হয়, পাপকে সহ্য করিবার ক্ষমতা, ক্ষমা করিবার ক্ষমতা জাগাইয়া তোলা, আর্টের দায়িত্ব। শরৎবাবু আর্টের

এই গুরু দায়িত্ব বরণ করিয়াছেন; তাহা ছাড়া, তিনি আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন, মানুষই যে শুধু ভুল, ভ্রান্তি, অন্যায় ও পাপ করিতে জানে, তাহা নয়, সমাজও জানে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেকের অধিকারের একটা সীমা আছে। সে সীমা ব্যক্তি অথবা সমাজ, মূঢ়তায় হউক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হউক, জিদের বশে হউক, যে ভাবেই হউক লঙ্ঘন করিলেই অমঙ্গল। দেবদাস ও কিরণময়ীর জীবনের tragedy টুকু ব্যক্তিগত জীবনের এই অধিকারের সীমা লঙ্ঘনকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে চন্দ্রমুখী ও সাবিত্রীর ধৈর্য্য, ক্ষমা ও সেবাপরায়ণতা তাহাদের জীবনকে শত আঘাত, বেদনা, জ্বালা. নৈরাশ্যের ভিতর দিয়াও একটা অনাবিল মাধুর্য্য ও অক্ষত মহিমায় সফল করিয়া তুলিয়াছে। অর্থ ও পদগৌরবের মর্য্যাদা ও প্রত্যাখ্যানের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া দেবদাস ও পার্ব্বতীর মধ্যে যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মিথ্যার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা উভয় দিক হইতে হইলেও, একদিকে যেমন অত্যাচার এবং দৈহিক ও মানসিক সর্ব্বনাশ, অপরদিকে নিষ্ফল প্রেমের মর্ম্মন্তুদ ও অস্ফুট বেদনার ইন্ধন যোগাইয়াছে। আরও একদিকে চন্দ্রমুখীর করুণার্দ্র স্নেহ করস্পর্শ দেবদাস জীবনের শেষক্ষণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই। এখানেও আর এক ধরণের ভয়ানক ব্যবধান স্নেহ ও ভালবাসাকে সম্মানের আসন দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে। অথচ চন্দ্রমুখী দেবদাসের নিকট হইতে সেই সনাতন পুরুষের (the eternal masculine) প্রভাবের নিকট হার মানিয়াও চরিত্রের শিক্ষা পাইয়া আপনার জীবনকে শত ধৈর্য্য ও সেবার ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়া দেবদাসকে বাঁচাইতে পারিল না; কারণ, দেবদাস তাহার নিকটে থাকিয়াও অতি দূরে। চারিদিক হইতে বিফলতার উপকরণের নির্দ্দয়

সমাবেশে ব্যর্থ জীবনের অন্ত অতি করুণ, শোচনীয় ও হৃদয়বিদারক হইয়াছে।

দেবদাসে যে সকল কঠিন প্রশ্ন শরৎবাবু সমাজকে বিচার করিতে বলিয়াছেন, তাহার মীমাংসা তিনি নিজেই দিয়াছেন "চরিত্রহীনে।" "চরিত্রহীন" বইখানা "দেবদাসের" "অতিসুন্দর Sequel। দেবদাসের ঘটনা অতি সরল ও বাহুল্য বর্জ্জিত; আবেগ অতি তীব্র ও রুক্ষ,—tragedy অত্যন্ত concentrated; জমাট ও মর্ম্মন্তুদ। সাহিত্যে ইহার স্থান খুব উচ্চে। ইহার একাগ্রতা ও একভাব মুখীনতা আজ কালকার পাশ্চাত্য সামাজিক নাটকের তেজ ও উত্তাপ ইহাকে প্রদান করিয়াছে। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক পুস্কিনের Dovbrovsky ও Thomas Hardyর Tessএর পার্শ্বে ইহার স্থান।

পাওয়া যখন নর-নারীর নিভৃত হৃদয়ে গোপনে নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইতে থাকে, অথচ বাহিরের সংসার, সমাজ ও লোকাচার তাহাকে বাধা দেয়, নিষ্ফল করে, নারীকে তাহার সম্মানের আসনটি দেয় না,—তখনই দুঃখের দিনে প্রেমের পরীক্ষার সময় আসিল। কারণ, শ্রদ্ধা ছাড়া যে ভালবাসা টিকিতেই পারে না*!

আর, সমাজ যদি সেই শ্রদ্ধাটুকু না দেয়, তখন প্রেমের শ্রেষ্ঠ স্থানটি নরনারীর পক্ষে বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন।

"চরিত্রহীনে" বিভিন্ন দিক হইতে প্রেমের এই কঠিন পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফল দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষাটা সমাজের ও গৃহধর্ম্মের অননুমোদিত ব্যথিত স্নেহ ও ভালবাসার পরীক্ষা। সতীশ ও সাবিত্রীর বিচ্ছেদে একদিকে সাবিত্রী আপনাকে বিধবা, কুলত্যাগিনী ও সমাজে লাঞ্ছিতা বিবেচনা করিয়া অতলস্পর্শী দুঃখের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া যেমন ভালবাসার জোরেই সতীশ হইতে

আপনাকে দূরে রাখিয়াছে, অপর দিকে সতীশ তাহার বিচ্ছেদকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানা সংশয়, দুঃখ, সর্ব্বনাশ, মায় পঙ্ক-মকারের ভিতর দিয়া শেষে উপীনদা'র আদর্শ ও বিচারে ধৈর্য্যের পরীক্ষায় টিকিয়া গেল।

আজন্ম শুদ্ধ নির্ম্মল ও সমাজের অনুমোদিত উপেন্দ্র-সুরবালার নিষ্কলঙ্ক বিবাহিত জীবনের অতলস্পর্শী প্রেম শুকতারার মত একান্ত ব্যথিত, ব্যগ্র ও সংশয়হীন চোখে সকলের পানে চাহিয়া সকলেরই অন্তরে একটা সুধা ও সান্ত্বনার ধারা সর্ব্বদাই বর্ষণ করিয়াছে।

বিবাহিত জীবনের সার্থক-প্রেমের এই মহনীয় ছবির পার্শ্বে হারান ও কিরণময়ীর ব্যর্থ প্রেমের ছবিও আছে। শুষ্ক, কঠোর স্বামীর ঔদা-সীন্য, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার সংসারে কিরণময়ী আপনার নারীত্বের বিকাশের সুযোগ না পাইয়া, স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া, স্বামীর রোগের দুর্দ্দিনে, সর্ব্বনাশ হইতে একবার আপনাকে ফিরিয়া পাইয়া-ছিল—সুরবালার সহজ, সরল আত্মদান ও ভালবাসা দেখিয়া। সুর-বালার সংশয় লেশহীন, অন্ধ ভালবাসা ও উপেন্দ্রের স্বচ্ছ, কঠিন পবিত্রতা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তাহার স্বাধিকারচ্যুত নিষ্ফল প্রেম উপেন্দ্রকে ঘিরিয়া কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল। উপেন্দ্রের অবিশ্বাস ও ঘৃণায় কিরণময়ীর অন্তঃবিদ্রোহ তাহাকে আবার বিপথে প্রেরণ করিল। দিবাকরের নিকট যে মুখ-খানি করুণা ও স্নেহহাস্যে উজ্জ্বল ছিল, তাহা ক্রমে অসঙ্কোচে অতুল রূপ-যৌবনের দর্শনের সহিত তাহাদের বিষও ঢালিতে লাগিল। অথচ উহারই চক্ষুর ক্ষুধায় উহার মুখের প্রেম নিবেদনে সে লজ্জায় শিহরিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু উহার অবহেলাও সহ্য করিতে পারে নাই। সমাজকে,

ধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়া, স্বাভাবিক নারীত্বকে পদদলিত করিয়া, কিরণময়ী যেমন সংসার অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী বিভ্রান্ত চিত্ত দিবাকরকে রূপ ও ভালবাসার মিথ্যামোহে প্রতারিত করিয়াছিল সেরূপ পাপের সহিত নিষ্ফল ক্রীড়া করিতে যাইয়া আপনাকেও ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। এই নিষ্ফল ক্রীড়ায় কিরণময়ী দিবাকরের রহস্যালাপে এমন সব লালসার ইঙ্গিত আছে, যাহা কিরণময়ীর চরিত্রকে এই স্থলে অতি সংক্রামক করিয়া ফেলিয়াছে। কিরণময়ী কিছু হয়ও নাই, তাই সে কিছু পায়ও নাই। কিরণময়ীর শেষের অধঃপতন ও বিকার যেরূপ অস্বাভাবিক, তাহার শেষের উন্মত্ততা, তাহার আস্তিক্য-বুদ্ধির উন্মেষ ও তাহার জড়তাও সেইরূপ মামুলী। কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কণে শিল্প হিসাবে তাহার হঠকারিতা তত দোষের নয়, যত দোষের এই লক্ষ্যচ্যুতি।

প্রত্যাখ্যাত প্রেম-প্রতিহিংসা এমন কি জিঘাংসায় পরিণত হইতে পারে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের মোগল, তুর্কী, স্লাভ অথবা ইটালীর জীবন ও সাহিত্যে অনেক আছে। কিন্তু সেখানে লালসায় ক্ষুধা তাহার আনুষঙ্গিক ক্রুরতা প্রেমের বিশিষ্ট উপাদান নহে— সেখানে অনেকস্থলে প্রত্যাখ্যাত প্রেম, প্রচ্ছন্নভাবে অভিমানের ভিতর দিয়া নূতন প্রেম বা লিপ্সার আকারে দেখা দেয়। এই অভিমানের মূল তখন হয় প্রেমাস্পদকে আঘাত দেওয়া এবং ইহার তাড়নায় প্রত্যাখ্যাত রমণী আপনার মানসিক ও দৈহিক সর্ব্বনাশও করিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রত্যাখ্যাতা রমণীর চিত্রকে এমন করা হইয়াছে যে, সে প্রেমাস্পদ এবং পাঠক উভয়ের নিকট অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র হয়, তাহা সাহিত্য-শিল্পের পক্ষে অস্বাভাবিকতার পরিচায়ক। জীবনের দিক দিয়াও তাহা বস্তুতন্ত্রহীন ও অসত্য। কিরণময়ীর ক্ষেত্রে এই সকল দোষই বিদ্যমান। তাহা ছাড়া, কিরণময়ীকে যে ভাবে চিত্রিত করা

হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসাও প্রেম-অভিমানের চিহ্ন তাহার মধ্যজীবনে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

যতদিন কিরণময়ী তাহার মধ্য-জীবনের উদ্দাম কল্পনার কেন্দ্র উপেন্দ্রকে ত্যাগ করে নাই, ততদিন তাহার বিষ ও হুল থাকিলেও তাহা মৌমাছির ন্যায় সত্য ছিল। কিন্তু যখন আরাকান যাত্রার সূচনা হইতে সে আবার কেন্দ্র ভ্রষ্ট হইল, তখনই সে শিল্প হিসাবে অসত্য এবং নিজ চরিত্র হিসাবে সে নিতান্ত অস্বাভাবিক, বিকৃত হইল।

প্রথমে উপেনের প্রতি আকর্ষণ। দ্বিতীয় তাহা হইতে বিকর্ষণ এবং দিবাকরের প্রতি আসক্তি এবং তৃতীয় পুনর্ব্বার উপেন্দ্রের নিকট তাহার নিষ্ফল প্রত্যাগমন—এই তিনটীর মধ্যে সাহিত্য-শিল্পের অস্বাভাবিক কার্য্য—কারণ ও সংলগ্নতার সূত্র খুব কৃশ ও দুর্ব্বল। তাহার পর হইতে "চরিত্রহীনে" আসল নায়িকা সাবিত্রীর চিত্ত-বিক্ষেপের পরিণতি ছাড়িয়া একটা episode বা প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী লইয়া পড়িলাম। আসল গল্প ও চরিত্রগুলি পিছাইয়া পড়িল, আমরা একটা সাময়িক বিক্ষেপের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও প্রতারিত হইয়া গেলাম। উপেন্দ্র গল্পের দুই স্বতন্ত্র অংশের সংযোজক; কিন্তু দ্বিতীয় অংশটুকু উপেন্দ্রের সংযোজক শক্তিকে ত্যাগ করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথমকার জীবনের নিষ্ফল বিবাহিত জীবন ও স্বার্থান্ধ প্রেম যেমন কিরণময়ীর অধঃপতনের পথ সুগম করিয়াছে, সেরূপ বঙ্গনারীর অন্তঃপুর-জীবনের ধারা ও সম্বন্ধের বৈষম্যকারক একটা বস্তুতন্ত্রহীন শিক্ষাও সেই পথকে কিরণময়ীর পক্ষে আরও সহজ ও পিচ্ছিল করিয়া দিয়াছিল। কিরণময়ীর মনোগত বিবর্ত্তকে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও আবেগ অপেক্ষা তাহার নিরপেক্ষ ও কূট-বিচার-পরায়ণ বুদ্ধিই অধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার পাপও সম্পূর্ণ মনোগত; ইহা তাহার দেহকে স্পর্শ

করিতে পারে নাই, এবং সেই পাপের পরিণামও অন্তিমের সেই প্রলয়ঙ্করা বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলোপেই সাধিত হইয়াছে। কিন্তু দেবদাসে আমরা দেখি, প্রবৃত্তি-মূলক পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ বিপরীত,—উচ্ছৃঙ্খলতা অস্বচ্ছকৃত দেহের সর্ব্বনাশে; অথচ শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান স্বাভাবিক থাকিয়া কিরণময়ীর প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা এই চিত্রকে আরও ভীষণ করিয়াছে। কিরণময়ীর চরম অবস্থায় আমরা তাহার বুদ্ধির জড়তা ও আচ্ছন্ন ভাব দেখি (dementia), কিন্তু এই ধরণের বুদ্ধি-ভ্রংশ অপেক্ষা একটা উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল, কল্পনা-প্রবণ উন্মাদ বা মতিভ্রম (mania) তাহার hallucination এর পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সাহিত্য-শিল্পের দিক হইতেও তাহাতে উচ্চতর অঙ্গের সৌন্দর্য্য ও সিদ্ধি লাভের সুবিধা হইত। কিরণময়ীর শিক্ষা ও জীবনের বিরোধের সমস্যা বাংলার শিক্ষিত গৃহে-গৃহে অবশ্য আরও মৃদু ভাবে উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানে বাঙ্গালার ভাবী সাহিত্য অন্তঃপুর-জীবনের পরিসর বৃদ্ধি ও শিক্ষার উপযোগী সংস্কারে প্রতিফলিত করিবে। আজ কালকার গল্প-লেখকদিগের শিক্ষাবিকৃতা গৃহ-বধূকে তিরস্কার, চোখরাঙানি ও কর্ত্তব্যপরায়না অন্যতমা মামুলী গৃহিণীর উদাহরণ প্রদর্শনে নিরস্ত করিবার চেষ্টা হাস্যাস্পদ। শিক্ষাকে তিরস্কার না করিয়া শিক্ষা কি ভাবে গৃহধর্ম্মে নারীত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণ-বিকাশ সাধনে নিযুক্ত হইবে, তাহাই ভাবিবার কথা।

কিরণময়ীর অধঃপতনের একটা কারণ উপেন্দ্রের নির্ম্মম অসহিষ্ণুতা। এ হিসাবে সতীশের চরিত্র উপেন্দ্রের অপেক্ষা আরও উচ্চে। সুরবালার মৃত্যুর পর, উপেন্দ্রের পরিবর্ত্তন আসিল। উপেন্দ্র আর সে উপেন্দ্র নাই। এখন সহস্র অপরাধেও তিনি অপরাধ ল'ন না। এখন শুধু তিনি মানুষের বিচারক ন'ন, তিনিও মানুষের সঙ্গে মানুষ। তাই

সাবিত্রীকে তিনি যেভাবে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহারই অনুরূপ দায় ও মমতা কিরণময়ীকে দান করিতে পারিলে সে তাহার চরম দুঃখ ও বেদনা হইতে রক্ষা পাইত। কিরণময়ীর চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা জটিল; তাহার রূপগুণ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র, দুর্নিবার। তাই সকলের অপেক্ষা তাহার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন খুব দ্রুত ও একান্ত সকলের অপেক্ষা তাহার কথোপকথনে, তাহার গৃহ ও সেবাধর্ম্মে, তাহার বিশ্রম্ভালাপে, তাহার অধঃপতনে একটা বিহ্বলতা, একটা উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। নিদারুণ সমস্যাব অভিঘাতে সে অহনিশ সংক্ষুব্ধ, ভীত, ত্রস্ত; তাই শেষ সময়ে অসহ্য বেদনা-নিপীড়নে তাহার মাথার চুলগুলা রুক্ষ, বিপর্য্যস্ত; বস্ত্র ছিন্ন ও মলিন। সাবিত্রীর চরিত্রে ইহা অপেক্ষা ধৈর্য্য গরীয়ান্ ও সেবাপরায়ণতায় মহীয়ান্। তাহার প্রেম সলজ্জ ও মৌন, এবং তাহার ব্যর্থতা বিদ্রোহের ইন্ধন না জোগাইয়া শুধু দুঃখ ও সেবার ভাবই জাগাইয়া দিয়াছে। কিরণময়ীর চরিত্রটা প্রথম দৃষ্টিতে বুঝা যায় না; তাহার কারণ তাহার চিত্ত একেবারে বুদ্ধি-প্রধান; তাহার জীবনের অভিপ্রায় ও ঘটনাসমূহ এই সূক্ষ্ম ও সজাগ ও নিঃসঙ্কোচ বুদ্ধির দ্বারা চালিত, এবং সেইজন্য পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে খুব জটিল এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতর হইয়াছে।

কিরণময়ীর পাপ তাহার উচ্চ শিক্ষা ও বুদ্ধির উপর চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত না হইলেও, সে বিচার আমরা করিব না। শিক্ষা যে পাপকে নূতন নূতন আকার দিতে পারে, তাহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু কিরণময়ী ও দিবাকরের আরাকান যাত্রা এবং আরাকানের বাস্তব জীবনের ভিতর তাহার পাপ ও তাহার অবস্থা যে নিকৃষ্ট ও গর্হিত রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে উচ্চ শিক্ষা বা বুদ্ধির সহিত একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। এই

কদর্য্য পরিণামে কিরণময়ীর প্রতি একটা ঘৃণা আসে;—ইহা শিল্পেরই দিক দিয়া একটা বিশেষ ত্রুটি ইহা ছাড়া তাহার বাহ্য ব্যবহারের সহিত তাহার অন্তরের জীবনব্যাপী বিরোধ, যাহা তাহার অদ্ভুত শিক্ষা ও প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিমাণ না জানিলে অনধিগম্য। তাহাকে সুচারু ও সুসঙ্গত ভাবে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করা শিল্পীর পক্ষে অতি দুরূহ কাজ, এবং তাহার শেষ পরিণতি একটা বিদ্রোহের পর শান্তিতে পরিণত করা প্রায় একরকম অসাধ্য-সাধন। স্ত্রী-চরিত্রের ব্যবহারে এই বিপরীত ভাবের সমাবেশ কিরণময়ীর মত Anna Kareninaতে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং উভয়েরই প্রকৃতিতে বুদ্ধির ঝাঁঝটাই বেশী।

কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনে অস্বাভাবিকতা এইখানে, যে কিরণময়ীর সজাগ বুদ্ধিটা দিবাকরের সহিত অভিমানের কালে তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ আবেগে একবারে আবিল. এমন কি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এইখানেই শিল্পীর কিরণময়ীর একবারে বিনাশ সাধন হইয়াছে। একদিকে যেমন তাহার বিদ্রোহটা এই হেতু অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অপর দিকে বিমলা ও বিনোদিনার মত তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের উপযোগী বৃত্তিনিচয়ের স্বাভাবিক পরিণতির ও ইতিহাস আমরা লেখকের নিকট পাই নাই। বিনোদিনী, বিমলা ও কিরণময়ীর ভিতর স্নায়বিক ক্ষোভটাই স্থায়ী হইয়া যায়, কারণ তাহাদের প্রত্যেকের প্রত্যাবর্ত্তনে কোথাও সেই Tolstoyএর Anna Karenina অথবা Strindburgএর Henrietta বা Maurica এর অসহ্য মানসিক বিপ্লব ও যন্ত্রণা নাই। এই সকল ক্ষেত্রে নিদারুণ ক্লেশের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক বৃত্তির একটা রূপান্তরের করুণ ইতিহাস ফুটাইয়া তোলা সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ; বাহিরের কৃত্রিম প্রত্যাবর্ত্তন ও কল্পিত বৈরাগ্য

আনয়নে শিল্পের সহজ মীমাংসা হইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবন্ত ও বস্তুতন্ত্র নহে। দুর্জ্জয় অগ্ন্যুৎপাতকে সে নীরবে সহ্য করিয়াছে; তাহার নীরবতাই কত দুঃখ ও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া শেষে তাহাকে সকলের সর্ব্বংসহা আশ্রয়দাত্রীরূপে পরিণত করিয়াছে। সাবিত্রীর প্রকৃত পরিচয় না পাইয়াই ত সতীশের এত নৈরাশ্য ও উন্মাদনা অন্য এক রাত্রে যদি সাবিত্রী আত্মপ্রকাশ করিয়া উপেন্দ্র ও সুরবালাকে সতীশের ঘরে ফিরিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে উপেন্দ্রের শেষ জীবনটা এত দুঃখে কাটিত না, কিরণময়ী দিবাকরের এত পরীক্ষার প্রয়োজন হইত না। এই ধৈর্য্যের ছবিই, 'চরিত্রহীনে'র সত্য ও সুন্দর বস্তু। Hawthone এর Scarlet Letter এর সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। সরোজিনীর চরিত্রাঙ্কনেও যে ক্ষুব্ধ ও তিরস্কৃত প্রেম বিভিন্ন সমাজের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া, প্রিয়তমের শত অপরাধকে বরণ করিয়া, সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও দুঃসহ বেদনা ও ত্যাগের ভিতর দিয়া সাবিত্রীর আশীর্ব্বাদের অঞ্চলে আশ্রয়লাভ করিল। উপেন্দ্রের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক বিশাল প্রাণ ও উপেন্দ্র সুরবালার বিবাহিত-জীবনের সহজ মধুর প্রেম যেমন নৈরাশ্যের অন্ধকারে গল্পের বাসনা ও সুখ, দুঃখ ও বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছে, সেইরূপ সতীশ, সরোজিনী, দিবাকর ও শচীর চিত্র ও গল্পের সমাপ্তিতে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীর পর শান্ত সূর্য্যোদয়ের মত ফুটিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য এই, বিধিনিষেধবিপর্য্যস্ত প্রেমের সফলতা হইলে সমাজের কোলে বিবাহিত জীবনের প্রেমকে আশ্রয় করিয়া, সাবিত্রী বাহির হইতে উহাকে বুকে করিয়া রাখিল; কিরণময়ী বাহিরে যাইয়া উহাকে বুকে করিতে না পারিয়া পাগলিনীর মত বেড়াইতে লাগিল। অনেকে বলিয়াছেন, আর্ট এখানে লোকাচারের উপর উঠিতে না পারিয়া

আপনাকে হান করিয়াছে। কিন্তু ইহাও ভাবিবার কথা। আর্ট যে শুধু সৃষ্টি করে তাহা নয়, সৃষ্টিরক্ষাও করে। যাহাকে সহজভাবে দৈনন্দিন জীবনে সকলে পায়, তাহাকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিলে, তাহাকে অসুন্দরের হাত হইতে বাঁচাইয়া তুলিলে, যাহা সাধারণের জন্য নহে, যাহা বিদ্রোহের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষ তাহার মোহে পড়িয়া আপনাকে বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ করিবে না। সৃষ্টি করা অপেক্ষা সৃষ্টি রক্ষা করা কাজটাই কঠিন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যশিল্পীর ইহাই অধিক ভাবিবার বিষয় যে, ত্যাগ কোন উপায়ে জীবনের বিকাশ ও রূপান্তরের সহায় হইয়া সৃষ্টিরক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে। বাহিরের দিক দিয়া হঠাৎ ত্যাগ, অথবা কৃত্রিম বিধি-নিষেধের ব্যবস্থাপিত ত্যাগ কেবল ত্যাগই মাত্র; উহাতে সৃষ্টির রক্ষাও নাই বিকাশও নাই!

শরৎবাবুর সাহিত্যে কি আছে, তাহা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম; কি নাই, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমের সে জীবনের অভিজ্ঞতা, সে কল্পনা, সে বিপুল প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথের সে ভাবপ্রবণতা, সে বিচিত্র জ্ঞান, সে কারুকলা তাঁহার নাই। শুধু বাংলার ভাবী সাহিত্য তাঁহার নিকট কি আশা করে, তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। জীবনের নিষ্ফল ও সংক্ষুব্ধ প্রেমের গভীর দুঃখের কথা তিনি ত কত না বিচিত্র দিক দিয়া, মনুষ্যহৃদয়ের নিভৃত অন্তঃস্থলের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে করিতে নিঃসংশয়ে বুঝাইলেন। পতিতার দুঃখ সম্বন্ধে Dostoeiffeskyর নায়ক Soniaর পদতলে পড়িয়া বলিয়াছিল, I prostrate myself before all suffering humanity, দেবদাস সেরূপ একদিন পতিতার বিষণ্ণ স্নেহ-কোমল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, "আহা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। লাঞ্ছনা, অপমান,

গঞ্জনা, অত্যাচার, উপদ্রব স্ত্রীলোক যে কত সইতে পারে—তোমরাই তাহার দৃষ্টান্ত।" সমাজের কোলে, দুঃখের সংসারে নির্য্যাতনে লালিত পালিত কিরণময়ী একদিন তাহার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতায় উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "মেয়ে মানুষের কখনও অসুখ হয় না, মেয়ে মানুষ মরে, কোথায় শুনেছ? অযত্নে অত্যাচারে মেয়েমানুষ মরে গেছে, ভগবান্ মেয়ে মানুষের দেহে তা কি দিয়েছেন, যে যাবে? এ জাতকে গলায় দড়ি বেঁধে দশবিশ বছর টাঙিয়ে রেখে দিলে ও মরে না।" নারীর প্রতি এমন শ্রদ্ধা, তাহার দুঃখে এমন সমবেদনা খুব কম লেখাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রেম এবং প্রেমের নিষ্ফলতা, নারীর অভিমান ও গোপন বেদনা জীবনের সবটা ঘিরিয়া বসে নাই। শুধু তাহাই তাঁহার নিকট হইতে পাইলে যে আমাদের একটা অবসাদ ও পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে একটা আবেগের ক্লান্তি ও ঔদাসীন্য আসিবে। সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবন, শিক্ষা, ধর্ম্ম, ও সমূহ-জীবনে যে সংঘর্ষ, আদর্শের কত বিপ্লব, কত ভাববিপর্য্যয়, কত অধঃপতন, কত অপমান, অবিচার বিফল প্রয়াসের মধ্য দিয়া বাংলার জন-সমাজের প্রাণান্তকর বেদনা অহরহ জাগিয়া উঠিতেছে, বেদনার পুরোহিত তিনি ত তাহা অনুভব করিয়াছেন। নূতন আবেগের ধারা ও ভাবের বিপর্য্যয়কে তিনি নূতন উপন্যাসে প্রকাশ করুন, তাহার অভিনব স্নেহ ও বেদনার সহিত তাঁহার স্বভাব-সুলভ আবেগ ও বিহ্বলতার মধ্য দিয়া, তাঁহার উত্তপ্ত, তীব্র অনুভূতি ও সমবেদনা এবং অপরূপ লিখনভঙ্গীর মধ্য দিয়া, বস্তুগত জীবনের প্রাচুর্য্য ও উত্তাপ তাঁহার সমস্ত লেখার সঞ্জীবতার এই নানা বাধা ও নিরাশায় স্পর্শ দিয়া জাতির বিক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ চিত্তকে সুন্দর ও কল্যাণের পথে অনিবার্য্য বেগে ঠেলিয়া দিক্।

বর্ত্তমান গীতি-কাব্য।

বর্ত্তমান কবি ও কাব্যের কথা ভাবিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা পূর্ব্বে সম্মুখে ও পশ্চাতে মনে পড়ে। সব 'দিক' দিয়া দেখিতে গেলে কাব্যের ভাব ও ভাষার আদর্শ ও মাপকাটি তিনিই এই যুগে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। একদিকে তিনি যেমন অফুরন্ত শব্দ ও ছন্দের বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন অপর দিকে তিনি প্রাচীন সাহিত্যের সকল বেদনাপুলক ভারতবর্ষের জীবনেতিহাসের সকল ভাবপুঞ্জ এবং বিশ্বের মহাকবিগণের ভাবধারাকে তাঁহার কাব্য-কমণ্ডলুতে আনিয়া মহামানবের তীর্থে সেই জন্মভূমির চরণ তলে অঞ্জলি ঢালিতেছেন। স্বদেশ আত্মার সেই "সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে" আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলিতে, কথা ও কাহিনীতে ফুটাইয়াছেন আমাদের সেই সনাতন কর্ত্তব্যবোধ ও ত্যাগধর্ম্ম, প্রেমকবিতায় তিনি আনিয়াছেন বৈষ্ণবের সেই চিরকিশোর কিশোরীর অনন্ত মধুর লীলা, অসংখ্য গীতি কবিতায় তিনি ফুটাইয়াছেন সেই মাধুরী যাহা বিশ্বময় সেই এক মহাপ্রাণকে অনুভব করিয়া স্বর, ও রূপে সেই একেরই প্রকাশ দেখিয়াছে এবং আধুনিক গাথাতে তিনি এই সুখ দুঃখময় গৃহে ও সমাজ জীবনের দুরূহ সমস্যাগুলি বিষণ্ণ স্নেহকোমল অঙ্গুলীতে স্পর্শ করিয়া করুণা জাগাইতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলার অদ্বিতীয় ব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকের কবি। যেমন সুবিমল হাস্যরস সৃষ্টি করিবার পক্ষে তিনি অদ্বিতীয় সেরূপ উদ্দীপনাময় জাতীয় সংগীত সৃষ্টি করিতেও তিনি অদ্বিতীয়। গাম্ভীর্য্য

ও আন্তরিকতা তাঁহার গীতি কবিতার প্রাণ। তাহা ছাড়া বিদেশী সুরকে স্বদেশী গানে প্রচলন করা তাঁহার প্রতিভার প্রধান দিক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুর ও ছন্দবন্ধ নানাদিক হইতে নানাবিধ গীতি-কবিতা রচনার উৎসাহ দিয়াছে।

এই শ্রেণীর কবি শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। তাঁহার ছন্দবন্ধ সংস্কৃতের অনুযায়ী গুরু ও গম্ভীর, প্রাণময় সঙ্গীতে ও স্তোত্রগানে তিনি ভগবান ও জাতির জাগরণ মন্ত্র গাহিতেছেন। আর এখনকার কোন কবির নিকট এমন নবীনের আভাষ, এমন আর্ত্তের ত্রাণ, এমন আশার কথা পাই নাই।

> সর্ব্বলোক পুনঃ পাবে ত্রাণ, নবজন্ম হইবে জাতির
> মা আমার, মা আমার ওই সমুদ্রের কাঁদে দুটি তীর।

গীতি কবিতায় শাক্ত ও বৈষ্ণবভাবকে আশ্রয় করিয়া তিনি জাতির ত্রিতাপী অন্তরে বরাভয়বাণী শুনাইতেছেন।

হাস্যকৌতুকের সুন্দর প্রকাশ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের মত রজনীকান্ত সেনের "আমাদের ব্যবসা পৌরহিত্যো," উকিল, হাকিম, ডেপুটী, "যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রোত" প্রভৃতিতে প্রচুর দেখিয়াছি। এবং দ্বিজেন্দ্রলালেরই মত তাঁহার জাতীয় প্রেম নানা গান ও কবিতার সুললিত ঝঙ্কারে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যে রূপ আমরা বিশিষ্টভাবে দেখিয়াছি তাহা হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল আসরের গায়ক ভাবে নহে, অথবা স্বদেশী শোভাযাত্রার উৎসাহী গায়ক ভাবেও নহে, তাহা তাঁহার অশ্রুধারা-বিগলিতনেত্র-ধ্যান-গম্ভীর ভক্তসাধক রূপ, গদগদ কণ্ঠে তিনি যখন দেবতার নিকট আত্মনিবেদন করিতেছেন। সেই আত্মসমর্পণের সুর কি গভীর, কি গূঢ়, কি আন্তরিক, যখন জীবনের সব হারাইয়া, রোগ, দৈন্য ও দুঃখের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত

হইয়াও শান্ত নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুর দিকে চাহিয়া তিনি অকম্পিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ, গর্ব্ব করিতে চুর
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিলে মোরে,
বেদনা দিলে প্রচুর।

তাঁহার "আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে," "তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'আমি চাহিনা ওরূপ মৃত্তিকার স্তূপ,' 'আমার মায়ের ত ওরূপ নয়,' তাঁহার কবীর, তুলসীদাস, রামপ্রসাদের সাধনার উত্তরাধিকারের পরিচয় দেয়। আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে এবং ভিখারীর মুখে মুখে যে তাঁহার গান গীত হইতেছে তাহাই তাঁহার সহৃদয় ভক্তি ও আন্তরিকতার সাক্ষ্য দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সঙ্গীত অপেক্ষা তাঁহার সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শী ও বস্তুতন্ত্র, উদ্বেগের আবেগ ও দুঃখের বেদনায় উত্তপ্ত। কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য নাই, আছে সরলতা ও আন্তরিকতা, যাহা তাঁহাকে বিশ্বের নিষ্ঠিক কবিগণের মধ্যে একটা উচ্চ আসন দেয়।

কথক হেমচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় রজনীকান্ত সেনের পথে যাইয়া আমাদের সেই পুরাতন ভক্তের গানের সরলতা ও আন্তরিকতাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন।

৺কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রেরণা অনেকটা নবীনচন্দ্র সেনের অনুরূপ। শব্দের ঝঙ্কার ও আদর্শের অনুপ্রাণণা হিসাবে তিনি অনেকটা নবীনচন্দ্র সেনের পথে গিয়াছেন। সেই ব্রহ্মর্ষিগণের হোম-শিখা, আহিতাগ্নি, নবীনচন্দ্রের। সেই ব্রহ্মলোকের আবহাওয়াতে ইহার জন্ম, এবং এই নবজাগ্রত স্পন্দিত-বক্ষ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের "আমরা বাঙ্গালী সাত কোটি ভাই বাস করি এই বঙ্গে"

এবং মৃত্যু স্বয়ম্বর, জাতির পাঁতি, ইজ্জতের জন্য, দাবির চিঠি, গোখলে স্মরণে প্রভৃতি গান নবীনচন্দ্র সেনের সাময়িক গানের মত উদ্দীপনাময়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণার সঙ্গে যেখানে রবীন্দ্রনাথের মিল নাই, সেখানে দেখি আমরা একটা ভাবের লঘু চাঞ্চল্য ক্ষণিক বৃত্তি মনোমুগ্ধকর চিত্রাঙ্কন। তাঁহার নিজের লেখা হইতে তাঁহার শিল্পের একটা নিপুণ চিত্র পাই—

একলা থাকা সয়না ধাতে হাঁপিয়ে উঠে মন
সব সময়েই নয় সাথী মোর কল্পনা স্বপন
সঙ্গ খুঁজি, বাক্য সভার চাইনে কচকচি
নিরালা আর লোকালয়ে, সোণার জাল রচি
ভালবাসি এই দুনিয়া চন্‌মনে সবক্ষণ
মন খুসী হয়, নৃত্য খেলায়, করব না গোপন।

এই সোণার কল্পনা কখনও বিঠোরা-পূজারিণী দেব-দাসীর কলঙ্ক ব্যথা, কখনও বা বিষকন্যার নিদারুণ খেলা, কখনও রাজশ্রবাব কাহিনী কখনও কখনও বা শব-সাধকের তপস্যা অবলম্বন করিয়া অতি মনোহর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই মোহন তুলিকা স্পর্শ আমাদেরকে Coleridgeএর ঐন্দ্রজালিক মায়া অঘটন ঘটন পটীয়সী কল্পনাশক্তি ও চিত্রাঙ্কণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার
কীলক-বদ্ধ কপাট তাহে,
গৃহচূড়ে সৌভাগ্য পতাকা
গৃহতলে শুক সারিকা গাহে;
শ্লথ আলস্যে আরামে ঝিমাই
রেশমের হিন্দোলার পরে,

দাসী নিপুণিকা আর চতুরিকা
মক্ষি তাড়ায় চামর করে।
শশকের লোহে কেশ ধুই নিতি
কাশ্মীর ফুলে বাঁধি কবির
তুষার মিশ্র শীতল মদিরা
পান করি কভু সেতার ধরি।
সুরে বাঁধা তার করে হাহাকার
বাষ্প জড়িমা সুরে জড়ায়
হায় গো হায়।

আধুনিক নবীন কবিদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার কবিতার বিষয়নির্ব্বাচন তাই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও নূতন।

তাঁহার গীতি-কবিতার ছন্দঃ বিচিত্র ও সজীব, আবেগ অপেক্ষা কল্পনাই অধিক, কবিতার সমগ্র জীবন ও সমগ্র সৌন্দর্য্যের অভাব, অথচ সুনিপুণ শিল্পী অতি যত্নে অংশগুলি সাজাইয়াছেন। Sublimity তাহাতে নাই, অথচ ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার কল্পনা উচ্ছ্বাস সৌন্দর্য্য ও মোহ সম্পূর্ণ বিদ্যমান। রচনা তাঁহার সহজ ও সরল নহে, এবং এই কারণে তিনি সাধারণের প্রিয়ও নহেন। হিন্দী, পারশী, আরবী, গুজরাটি শব্দের তিনি মেলা বসাইতে চাহিয়াছেন তাই আসরও জমে নাই, অথচ তাঁহার ছন্দের মৃদু মঞ্জুল নর্ত্তন গতি লোকের কাণকে খুবই চমকিত করে। ৺সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব অপেক্ষা তাঁহার কারুকলা বর্ত্তমান কাবতা জগৎকে অধিক স্পর্শ করিয়াছে। হেমেন্দ্রলাল রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের পথ ধরিয়া বেশ সিদ্ধিলাভ করিতেছেন।

যাহা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেতে পাওয়া যায় না তাহা আমরা অপর্য্যাপ্ত ভাবে পাইয়াছিলাম একজন নবীন ছাত্র, বোলপুরের সতীশচন্দ্র রায়ের নিকট। কিন্তু বাঙালীর আর তাহাকে মনে নাই ?

মনে পড়ে সে বালকে! বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌদিকে প্রকৃতি, তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রুকুটি মুক্ত, উদার নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
জীবন, জীবন ভাই, আনন্দ জীবন।

তিনি জীবনকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, জীবনের দুঃখ ও বিভীষিকাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার গাম্ভীর্য্য ও তুরীয়ভাব, তাঁহার প্রাণময় জীবন ও উত্তাপ তাঁহাকে কবিগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান দিয়াছে। তাই সতীশচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যু Keatsএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ধূমকেতুর মত তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব 'আমার এ কুঠারের ধূমকেতু জ্বালা গাঁথিবে ধরার তরে মঙ্গলের মালা'। ফুল সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু মালাগাঁথা হইয়া উঠিল না।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রতিভা ঠিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিপরীত। ইহাতেই বুঝা যায় বাংলার কাব্য এক নির্দ্দিষ্ট সরল ধারায় বহিতেছে না। কুমুদরঞ্জনের গীতিকবিতা আমাদের পল্লীমাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত সহজ সুন্দর ও সরল। জাতির অন্তরতম প্রাণের স্পর্শে হর্ষ বেদনা-পুলকিত হিয়া তাঁহার আমাদেরকে কত না প্রেম, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য শান্ত দাস্য ইত্যাদি মধুর রসে মুগ্ধ করিয়াছে। কুমুদরঞ্জন

পল্লীর প্রকৃতিমাতা ও অনুপ্রেরণাকে অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে ফুটাইয়াছেন। প্রকৃতি ও জ্ঞানের সমগ্রতা অপেক্ষা তাঁহার কাব্যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের মহা-প্রাণ অধিক প্রতিভাত।

প্রণাম করি পাথর দেখে তোমরা বল ভুল
ভালবাসি শ্যাম ও শ্যামায় প্রিয় বনের ফুল
ছোঁয়াই শিরে ভক্তিভরে নদী নদের জল,
রাঙাচরণ পরশপূত নয় সে কিসে বল ?
প্রাণ যে সবায় ভালবাসে সবার কৃপা চায়
না জানি কোন ভেকসে মেরা নারায়ণ মিল যায়।

তিনি বাঙালীর অন্তরের শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম-রসের মধ্য দিয়া গীতি-কবিতাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। তাই নিজভূমে তিনি বৃন্দাবনকে চির অমর করিয়াছেন, সেই তমাল, ময়ূব, বন-উপবন, গোষ্ঠবিহার বাংলার পল্লীে পল্লীতে সেই শ্যামসুন্দরের দিব্যলীলা ও ব্রজবধূদিগের চিরবিরহ এবং শ্যামা মায়ের আদুরে ছেলে হইয়া তিনি অমাবস্যার রজনীর মাধুর্য্যভোগ করিয়া হৃদয়-রক্ত-রঙে আঁকিয়াছেন। নিতান্ত তুচ্ছভাব ও ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ডাংপিটে ছেলে, লক্ষ্মীছাড়া, অকেজো অপ্রয়োজনীয় জিনিষকেও লইয়া তাহাকে অপরূপ মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিতে তিনি বিশেষ পটু। উপমা ও রূপক অজস্র পরিমাণে একটির পর একটি সজ্জিত করিয়া মূল ভাবটি অতি মনোরম করিয়া তুলেন। উপমা, কল্পনা, imagery, ভাবে তিনি আমাদের লোক-সাহিত্যের গভীর ও আচ্ছন্ন সাধনার সাধক আমাদের লোকশিক্ষক, 'কবি' ও কথকগণের প্রতিভার উত্তরাধিকারী, তাই তিনি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, রামপ্রসাদ, নীলকণ্ঠের কল্পনা ও জ্ঞানের পরিচায়ক, এবং মাইকেল-নবীন-হেমচন্দ্র তাঁহার স্বভাব সুলভ সহৃদয়তা এবং

আন্তরিকতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুকবি কেমন সুন্দরভাবে নিজের আদর্শ দিয়াছেন—

জীবে তব শিব মিলে শ্যাম মিলে শ্যামলে
চরণকমল আশে, ভালবাসা কমলে
মুখে হাসি চোখে জল, হৃদি ভরা পুলকে
ছায়াপথে গতায়ত্তি কর তুমি ভূলোকে।

যে প্রেরণায় প্রবাসী বাঙালী সারা বৎসরের কর্ম্মক্লান্তি ও গ্লানি পল্লীর স্নেহ ও শান্তিময় ক্রোড়ে ডুবাইবার জন্য আগমনীর গানের সুরে আত্মহারা হইয়া বিহ্বলচিত্তে ছুটিয়া যায়—এবং তাহার গৃহহারা প্রাণ যে পল্লীগ্রামের শান্তসন্ধ্যার দীপটিকে মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করে,—'মৌন-সাঁঝের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে, গ্রামের ছোট দীপটি প্রাণে বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে'—সেই প্রেরণার অনুভূতি; ঐ গ্রামের দূরাবলোক্য ছোট দীপটির মত, শত শত প্রিয় স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া তাঁহার গীতি কবিতায় আমাদিগকে মুগ্ধ ও আকর্ষণ করে।

বাঙালী গৃহস্থ ও গৃহবধূর অন্তরতম প্রাণকে তিনি যেরূপ নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, অন্য কোন কবি তাহা পারেন নাই। তাই তিনি যাহা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও খাটে,—

তুমি আসিবার আগে ফুটিত না হেথা
আমাদের গৃহজবা বারমেসে ফুল,
তুমি আসিবার আগে রাঙা রঙে তার
সে রাঙা চরণ বলে হ'ত না'ক ভুল।

তাহার গীতি কবিতায় অভাব তাহারই, যাহা বাংলার পল্লী-সমাজ

ও গৃহজীবনে আমরা এখন পাই না। সেই ব্যাপকাতর দৃষ্টি, সেই বিরোধ ও সংঘাত, সেই জীবনের উত্তপ্ত অতৃপ্তি।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিভার কবি দুর্গামোহন কুশারীতে কুমুদ মল্লিকের উজানীর সুর সেইরূপই স্বাধীন, সহজ ও অকৃত্রিম ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ও বাঙালীর দুর্ভাগ্য তিনি এখন নীরব রহিয়াছেন। আবার কোন পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিকট সেই পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকের সুন্দর, স্বাধীন জীবন, সেই পাটক্ষেতের মোহ, সেই নদ নদীর উচ্ছ্বাস গীতি পাইব?

যতীন্দ্রনাথ বাগচীর নিকট আমরা নিখুঁত সুন্দর পল্লীর ছবি পাইয়াছিলাম। কিন্তু আর পাই না। তাঁহার লিপিকৌশল অসাধারণ। সত্যেন্দ্রনাথেরই মতন তাঁহার ছন্দের লঘু অবাধ গতি, চঞ্চল নর্ত্তন। করুণ রসস্ফুরণে তিনি অদ্বিতীয়। দিদিহারার মত এক একটি কবিতা বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার স্নেহকরুণ গৃহজীবনের অতুল সম্পদ। সংহত ও সংযত তুলিকাস্পর্শে তিনি অপরূপ মাধুর্য্য সৃষ্টি করেন, যেমন—

> প্রেম গেছে যার, জীবন কি আর তার সাজে
> রক্ত কুসুম বৃন্তের কোথা ঠাঁই
> রূপরসহীন কণ্টক শুধু প্রাণে বাজে
> যার সব গেছে তারে বেঁচে থাকা চাই।

কুমুদরঞ্জন ও যতীন্দ্রমোহনে যে জীবনের সংক্ষোভ, বিরোধ ও উত্তাপ পাই না তাহা আমরা পাইয়াছি কালিদাস রায়ের কবিতায়। এইটাই তাঁহার নূতন। ইহা ছাড়া কুমুদরঞ্জনের মতন তাঁহারও নিকট পাইয়াছি আমরা সেই আন্তরিক বৈষ্ণবভাব, সেই করুণা মধুরসৌন্দর্য্য, সেই নিখুত পল্লীর সুষমা ছবি, সেই বৃন্দাবন লীলা, সেই শাকভাতে সুধা। বিরোধের মধ্যে তাঁহার যে সকল গীতিকবিতার জন্ম, সেগুলিতে

পাই একটা ব্যাপকতার অন্তর্দৃষ্টি, একটা সুন্দর ভাব ও আদর্শের রূপান্তর, যেটা অতীতের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান জীবনের গঠন ও পুষ্টি সাধনে সাহায্য করিতেছে। যেমন—

মানব হয়ে তোমায় পেয়ে তোমারে ঠিক লভিনি
আমি যে চাহি তোমার প্রতি অণুটি
বাসনা তাই, মরিয়া লভি তোমারে করি যোগিনী
ভস্ম হয়ে ভূষিয়া সারা তনুটি।

কিম্বা বৈশ্বানর কবিতায়—

জীর্ণ এদেহ দগ্ধ করিয়া
মুক্তি আমায় দিবে গো যবে
আপনার দেহ ভস্ম মাখিয়া
আত্মা আমার বিবাগী হবে।
তাহারেও প্রভু করিও দাহন
হে দহন, মম শুভের লাগি
নির্ব্বাণ তরে হে চির-বুদ্ধ
আমি তব চির শরণ মাগি।

প্রহ্লাদ, দধীচি, দুর্ব্বাসা, মায়াবিণীর মত আর এক ধরণের কবিতায় তিনি অতীতের কর্ত্তব্যবোধকে বর্ত্তমান জীবনের বিক্ষোভের মধ্যে মধুময় করিয়া আনিতেছেন,—

একাসনে দুই রাজ' ভুলনাক অটুট অক্ষয়
ভ্রাতৃস্নেহ পবিত্র পরম
তিলোত্তমা অপ্সরী সে প্রেম তার শুধু মিথ্যাময়
সৌভ্রাত্র যে সত্যের চরম।

হে তপস্বি! বীরাসন দৃঢ় কর, আরো দৃঢ় করে,
রুদ্ধ কর ইন্দ্রিয়ের দ্বার
দগ্ধ কর দুর্ব্বলতা, উগ্রজটি, রুক্ষ কর আঁখি
শক্ত কর চিত্তের প্রাকার।
ধরিয়া মোহিনীমূর্ত্তি সূর্পণখা রক্ষের প্রেরণা
মায়াবিনী আশে পাশে ঘুরে
সংহর সংহর, ক্রোধ সম্বর সম্বর রোষানল
বলি যেন পলায় সে দূরে।

নবীন কবিদিগের মধ্যে তাঁহার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্কৃত ভাব ও ভাষার ও ছন্দের প্রভাব লক্ষিত হয়। কমনীয়তা, ও লালিত্য এইজন্য তাঁহার কবিতার প্রধান সম্পদ।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভূতিতে কবি কথনও গিরিবালাকে নগ্ন গৈরিক সৌন্দর্য্য রাশির প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া মানব গৃহে অবতরণ করাইয়াছেন, কখনও বা জগতের অতুলরূপ ও যৌবনের বর্ণ শ্যামলতার মধ্যে শ্যামসুন্দর ও শ্যামামায়ের স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন।

রোমগুলি মোর কদম ফুলে রয়েছে ঐ শিহরিয়া
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে আলিঙ্গিতে আহ্লাদিয়া
দ্রবীভূত হৃদয় আমার যমুনাতে গেছে নামি'
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

কৃষক ও কৃষানীর ব্যথায়, কুড়ানী ও হা-ঘরে কবিতায় তিনি একবারে নিম্নশ্রেণীর সুখ দুঃখ গাহিয়াছেন বিশেষতঃ হা-ঘরে কবিতাটি ঠিক The Cumberland Beggar এর সহচর হইবার যোগ্য।

তাঁহার humanism Wordsworth এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের সোণালী কল্পনা উর্ণনাভের তৈয়ারী লালপরী, নীলপরী,

সবুজপরীর বস্তুতন্ত্রহীন সৌন্দর্য্যে আপনাকে একবারে আত্মসমর্পণ না করিয়া তিনি বিশ্বনাথের বিশ্ব ও খণ্ডরূপ খুঁজিয়াছেন, সর্ব্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছেন এবং নানা কবিতায় রোগ, দুঃখ দৈন্যের মধ্যে ভগবানকে চিনিয়া ডাকিতেছেন। শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী এই ভাবের ভাবুক হইয়া সিদ্ধির পথে যাইতেছেন।

অনবদ্য ছন্দবন্ধ ও ভাষার গৌরব সাবিত্রীপ্রসন্নের।

পল্লীর সুখ দুঃখ কাহিনী ও রাখালরাজের বাল্য ইতিহাসের মধ্যে প্রথম তাহার কবিতার রসস্ফুরণ। পল্লীর সংসারের দৈন্য ও নিরাশাকে তিনি অতি স্নেহ-কোমল করুণস্বরে ফুটাইয়াছেন। কুমুদরঞ্জন যেখানে পল্লীর জীবনের বাহিরের সুখ ও দুঃখের ছবি ফুটাইয়াছেন, সাবিত্রীপ্রসন্ন সেখানে পল্লীজীবনের অন্তঃস্থলে পৌঁছাইয়া দুঃখ ও বেদনার গভীরতম ও প্রচ্ছন্নতম আঁধার হইতে তাহার করুণ মধুর রস সঞ্চয় করিয়াছেন,—

পাঁজর ভেঙ্গে মোর
ছটা ছটা ভাদ্র মাসের কাল রজনী হয়ে গেল ভোর
বুকের মাঝে পাঁচটা পোড়া ফাগুন
জ্বালিয়ে গেছে কুলের কাঠের আগুন ;
এখন আমি দানার মত ফিরি'
বেড়া আছেন আমায় আছে ঘিরি'
রাত্রে আমি পাকা সিঁধেল চোর,
দিনে আমি বেজায় নেশাখোর
অত্যাচারের ঘানির মধ্যে এখন
মলে ফেল্‌ছি পিষে ফেল্‌চি আমারই এই লক্ষ্মীছাড়া জীবন !

* * *

সাজছ এখন ন্যাকা

হাতের বাঁধন দেখে তোমরা অনেক কথা কইছ ব্যাঁকা ব্যাঁকা,

তখন মুখে কেও কি চেয়েছিলে?

দু'মুঠো ভাত কেও কি দিয়েছিলে?

পিঁড়েয় পড়ে আমরা দু'টী প্রাণী

থাকনা—আমি সবারইত জানি!

নাড়ী দেখার লোক ছিলনা গাঁয়ে

চুকিয়ে দিলাম সেথায় ভজার মায়ে।

পেটের জ্বালায় ভজা

না, না, সে সব মিথ্যা কথা,—

সয়তানীতে অনেক আছে মজা।

কিন্তু বৃহত্তর সমাজ ও মানুষের গভীরতর বেদনা মুখরিত হিয়া তাহার আপনাকে শোধন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নূতন হোমের কুণ্ড জ্বালিয়াছে,

পথের যে কাঁটা পড়েছিল পথে, পথের পথিকে

পথের কষ্ট দিতে

তাহার নিঠুর রক্ত ফলকও কেমনে না জানি

বিঁধিল তোমার চিতে।

তাই কি তাদের কুড়ায়ে আনিলে ফেলিলে ত্রস্তে

দীপ্ত কুণ্ড মাঝে

আজ যে তাহারা ভস্ম হইয়া ধূসর ধূলায়

পরমাণু হয়ে রাজে।

এই নূতন অনুভূতি, জীবনের এই ব্যাপ্তি ও প্রসার খুব আশাপ্রদ, ইহা একটা বিপুল প্রাণের টানে সমাজের নিখিল বেদনা দুঃখের মধ্যে

২২

একটা শান্তি ও প্রীতি আনিতেছে। "অকেজো নারী" কবিতায় তাঁহার তীব্র অনুভূতি, কি গভীর সমবেদনা,

পণ দিয়ে মন কিনে নিয়ে করি ঘর
তার পর শুধু আপন করিব পর ;

*　　　*　　　*

আমরা যে প্রাণ হেলায় বিলাতে পারি
সব প্রাণে সয় আমরা কঠিন নারী !
শুধু তোমাদের তোমাদের মুখ চেয়ে
জীবন-তরণী অবহেলে চলি বেয়ে ;
তোমরা বসিয়া পরীর স্বপন দেখ
হীরের পাতায় সোণার আখর লেখ
হাওয়ার মতন গরবে বহিয়া যাও
আমরা যে পড়ে পায়ের তলায় সেটা কি দেখিতে পাও ?

এই দুঃখ ও সমবেদনা ক্রমশঃ বিশ্বময় হইয়া দুঃখময়ের চরণতলে পৌঁছিয়াছে তাঁহার আর এক কবিতায় যেখানে তিনি এই মহাযুদ্ধে শঙ্কিত মাতৃহৃদয়ের গোপন ব্যথাকে সুর দিয়াছেন,—

কিন্তু ; সে ত মরতে পারে ফ্রান্সে কিম্বা অন্য কোনও দেশে
তোমার ছেলে, আমার ছেলে, দুঃখময়ের দুলাল ছেলের বেশে।
কাঁদো নারী কাঁদো—
বিশ্বমায়ের সকল কণ্ঠ তোমার সুরে এক করে আজ বাঁধো ;
তুমি যে গো বিশ্বমাতার বিরাট ছায়া, কাঁদছ তুমি নিখিল বিশ্ব তরে
তোমার সাথে ব্যথার ব্যথিত আমিও আজ কাঁদ্‌ব পরাণ ভরে।

নিখিল বিশ্বময়

মরণ বাঁচন দু'টি কথার ঢেউ উঠেছে পাহাড় প্রমাণ, প্রলয় বুঝি হয়;
দ্বন্দ্ব কলরোল ছাপিয়ে বিশ্বমানব বুক দিয়ে আজ ডাকে
গভীর ঘুমের অসাড় মায়া রেখায় চুপে বল্‌ছে কি যে কাকে।

এই ব্যাপকতার অন্তর্দৃষ্টি ও humanism বাংলার গীতিকবিতায় এই নিরাশার অন্ধকার ও মেঘ গর্জ্জনের মধ্যে বিজলি খেলায় সমাজের চিত্ত দহন করিবে সন্দেহ নাই।

জীবনের উত্তাপ ও দুঃখের সহিত নিবিড় অনুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলাম আমরা স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের লেখায়। কিন্তু এই ভাওয়াল কবির কবিতায় পল্লীর বনফুলের সৌন্দর্য্য ও মধু পাই নাই, পাইয়াছিলাম ফণীমনসার বিষ ও জ্বালা, "মড়ক আজিকে হানা দিয়েছে রে পল্লীর দুয়ারে," সেই সুর। ছন্দে ও কবিতায় একটা ঝাঁঝ ও বন্ধুরতা আছে। বাংলার কোন কবি এমন স্বভাবসিদ্ধ নহে, কাহারও কবিতা এমন প্রাণখোলা সোজাসুজি, স্পষ্ট নহে। ভাষাবরণে সুশোভনতা, রস প্রতুলতা নাই, কিন্তু কবিতা জীবন্ত, জীবনে গভীর দুঃখের অনুভূতিতে জ্বালাময়। দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তিনি একদিন বাঙালীকে বলিয়াছিলেন—

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি ম'লে
তোমরা আমাব চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপোষ করি না খেয়ে শুকিয়ে মরি
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছটফট
ও ভাই বঙ্গবাসী আমি ম'লে, তোমরা আমার দিবে মঠ?

দুঃখের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া পীড়িত ও দুর্ব্বলের জন্য তাঁহার একটা জ্বালাময় বেদনা ও সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এমন

তীব্র অনুভূতি আর কোনও কবির বস্তুগত জীবনের উত্তাপে ও কবিতায় প্রকাশিত হয় নাই।

ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান
আহা তার নরনারী ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হয়ে ম্রিয়মাণ,
বারমাস তের কাতি দিনে রেতে সে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান!
তাদের কলিজা ভাঙ্গা যাতনা আগুন রাঙ্গা,
শিরায় শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান।

* * * * *

বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুখ-নিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি আকণ্ঠ হৃদয়ে পূরি,
কলিজা ফাটিয়া দিই করি শতখান?

জীবনের শত দুঃখ অভাব এমন কি ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া, দেশবাসীর সমবেদনার অভাবের বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতে করিতে এই কাঙাল কবি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন—তবুও তাঁহার সহৃদয়তা তাঁহার ভাবুকতা যায় নাই।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে তাই গাহিয়াছেন,

এ দুনিয়ায় একটি কোণে কাঁটার বনে
জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায়
কাঁটার মালা গলে,

পাতায় চাপা গন্ধটুকুন পুবে হাওয়ায়

বেরল নীড় ত্যেজে,

পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা ক'রে

রইল চোখের জলে।

এই ধরণের স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি, নবীন কবি কাজি নজ-রুলের উন্মাদনাময় গীতি কবিতায়। গোবিন্দ দাসেরই মত তাহার ছন্দের ঝাঁঝ ও বন্ধুরতা। কখনও পাই তাহাতে দ্রুত-ধাবমান সেনা-বাহিনীর ধীর পদক্ষেপ, কখনও বা অরাজক বা বিদ্রোহের রাজ্যে ঝড়ো হাওয়ার উদ্দাম উল্লাস, আবার কখনও মরুভূমির ওয়েসিসে বিনিদ্র সুরতরঙ্গ। যেমন তাঁহার ছন্দের বৈচিত্র্য, তেমনি তাহার জ্বলন্ত সমবেদনা অসীম আবেগ, ও অধীরলাস্য। বাংলার বীণাপাণি যদি তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনায় ব্রতী করেন তবেই তাঁহার কণ্ঠ ভবিষ্যতের বরমাল্য পরিধান করিবে, ইহাই আমাদের আশা।

আর এক ধরণের স্বাধীনতা ও জীবনের উত্তাপ আমরা পাইয়াছি কুমুদনাথ লাহিড়ীর কবিতায়। গীতিকাব্যে তিনি সতীশচন্দ্র রায়ের সাধনার পথ ধরিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় রসপ্রাচুর্য্য আছে এবং তিনি মামুলী ছন্দে কবিতা অধিক লেখেন নাই, সতীশচন্দ্র রায়ের মতন তাঁহার কবিতার ও ছন্দের স্বাধীনতা, তাঁহারি মতন পাই আবার সেই জীবনের অতৃপ্ত ক্ষুধা। তাই এতটুকু মাটিকে তাঁহার পাগল প্রাণ বহুল আয়াসে বদ্ধ মুঠিতে ধরিয়া বলিতেছে,—

রেখে দিব বুকে

জড়ায়ে ধরিব তোরে দুই বাহু দিয়ে

হে আমার কল্পলতা, কনক কিরণ

ফাটিয়ে পড়িছে, দেখি, চারিধারে তোর,

বিশ্বের শ্যামল শোভা প্রসবিনী তুই
আয় আয় বুকে মোর !

তিনি সেই elan vital এর নবীন সাধক, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সৃষ্টিকে ভোগ করিবার, অনন্ত ক্ষুধায় তিনি ক্ষুধিত,

কত যুগ কত দিন
বিশ্বের আবর্ত্তে পড়ি তৃষ্ণার্ত্ত পথিক
কেটে গেছে কত কাল।
হৃদয়ে ধরেছি তীব্র অনল বাসনা
চাহিয়াছি প্রাণপণে
ভুঞ্জিবারে সর্ব্বরূপে সৃষ্টি-রস ধারা
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে !
ব্যর্থ কাম—ব্যর্থ কাম ! ইন্দ্রিয় কোথায় ?

*   *   *   *   *

পড়েছিনু কত দিন ! চারি পাশে মোর
চঞ্চলিয়া চলি যায়
জীবনের কত স্রোত ! মাঝখানে আসি
তৃপ্তিহীন অবিচল
শুধু গুপ্ত হিয়া-কোণে, গভীর শ্বসন
আকাঙ্ক্ষার হাহাকার
হায় জড়, রুদ্ধ দ্বার, এ তীব্র বাসনা
পারে না খুলিতে তারে ?

*   *   *   *   *

তাহার পর,

চমকি দেখিনু, তরু হয়ে জন্মিয়াছি
সংসারের কিনারায়
সমস্ত শিকড় দিয়ে করিতেছি পান
ধরিত্রীর স্তন্য সুধা
দুলায়ে পল্লবদল, মেলি শাখাবাহু
আলোক বাতাস সাথে
করিতেছি খেলা।

কিন্তু তাঁহার

তৃপ্তি নাই ! তৃপ্তি নাই ! ভোগচক্রে ঘুরি
চঞ্চল এ চিত্ত-বাজী
হাঁপায়ে উঠিছে আজ ! কই শান্তি কই !

তিনি সৃষ্টির আরম্ভের সেই অনাদি গূঢ় ক্রন্দন শুনিয়াছেন, ফল ফুলে ভরা এই বিপুল ধরণীর সুখ দুঃখ আন্দোলনে তাহার হিয়া গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে, এবং ঐ সৌন্দর্য্য ভরা পাত্র হইতে সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া তিনি অমৃতের পিপাসায় "নিবেদিয়া বিশ্বদেবতার, আপনার গূঢ় আপনার" অধ্যাত্ম সাধনার কবিতায় এখন আপনার অতৃপ্তি জানাইতেছেন। চট্টলের সেই শৈল সাগরের সঙ্গমে বসিয়া আর একজন দার্শনিক কবি বহিঃ সৌন্দর্য্য ও অন্তঃসৌন্দর্য্যের এক অভিবব মিলন চিত্র আঁকিযাছেন। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের কবিতায় পাই পর্ব্বতের কাঠিন্য, গিরিনদীর স্বচ্ছ ও উদ্দাম প্রবাহ এবং লীলাময় সাগরের অসীমত্ব ও গভীরতা। পরিতাপের বিষয় দেশের অন্তর রাগিনী যিনি গাহিয়াছেন, দেশ তাঁহার সে রাগিনী বুঝিতে চেষ্টা করিল না।

তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের কবি করুণানিধান বন্দ্যো-

পাধ্যায়। তিনি একজন চমৎকার শিল্পি। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার আশ্চর্য্য অধিকার। তাঁহার চারু শিল্পকলা অনেক সময়ে তাঁহার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের শিল্পকেও অতিক্রম করিয়াছে। তিনি একজন নিপুণ চিত্রকর, দুই এক রেখার নিপুণ টানে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে এক সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা কাব্যে তাহার আর সমকক্ষ নাই। ছন্দের নর্ত্তন প্রতিশব্দের চঞ্চল চরণভঙ্গ শব্দ ছবি অঙ্কনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা কবিতার খণ্ড সৌন্দর্য্য আমাদেরকে Tennysonএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রকৃতির চিত্র ঠিক Tennyson এর তুলিকাস্পর্শে আঁকা।

স্বপন দেখিতে ভূর্জ্জ বনানী
সবুজ টোপর পরি
ঝর্ণাতলায় বরিছে কাহার
রতনের সাতনরী।
এই না জীবন মানব জীবন
ফুল ফোটা, ফুল ঝরা,
সমুখে হাস্য পিছনে অশ্রু
শয্যাসায়িনী জরা।

লেখার ভঙ্গী ঠিক Tennyson এর অনুরূপ। এবং মানবাত্মার গভীর রহস্য সন্ধান বিষয়ে, Tennysonএর দৌড় যতদূর তাহার অধিক তাঁহার দৌড়ও নহে,

ভাবি দিনের মোহন মুখের
ঘোমটা ছিঁড়ে দেখরে মন
জলে স্থলে সূক্ষ্মে স্থূলে
শাশ্বত তার সিংহাসন।

চিন্তা দিয়ে পথ বাহিয়ে
ছুটিস মিছা হয় না লাভ
সাম্‌নে উজল অনিত্য জাল
বুন্‌ছে মায়ার উর্ণনাভ ;
যৌবনে নেই বিন্দু প্রমোদ
কদিন রূপে মন ভোলে ?
সামনে নীচে ছিন্নমস্তা
কামরতিকে পায়ে দলে
প্রহেলিকার গোলক ধাঁধার
ক্রোশের পর ক্রোশ চলি
রহস্যময় পরশমণি
ভরবে কখন অঞ্জলি।

গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্মতর ভাবুকতা যাহা রবীন্দ্রনাথের উচ্চতর আর্টে পাওয়া যায়, যাহা সতীশচন্দ্র রায়ের, কুমুদনাথ লাহিড়ীর ও শশাঙ্কমোহন সেনের বন্ধুর ছন্দের অনুরূপ সম্পদ তাহা তাঁহার কবিতায় নাই, অথচ তাঁহার নীরবতা ও ভাবুকতাও আছে !

বারটি বছর চেয়েছিল কভু
কইনি একটি কথা,
ঝরিত তোমার আঁখির পাতায়
স্বরগ নির্ম্মলতা !
এমন করিয়া ফুরাইত দিন
তোমার হিয়ার মাঝে,
কেহ জানিত না রস মূর্চ্ছনা
সুধার রাগিনী বাজে।

শ্রীমতী কামিনী রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী একভাবের ভাবুক। প্রেম এখানে তন্ময়তা, বাসনা এখানে ভগবদাসক্তি। Tennyson ও Browning এর মধ্যে যাহা মহনীয় বৈষ্ণব গীতিকবিতায় যাহা চির-রসামৃত ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সাধনায় যাহা চির-মধুর তাহা মিশিয়া বাংলা সাহিত্যে তিনটি অপরূপ রত্ন প্রদান করিয়াছে নির্ম্মাল্য, এষা ও একতারা।

নবীন লেখক দ্বীজেন্দ্র নারায়ণের একতারার বাঁধা সুরের নমুনায় এই ভাবের পরিণতি পরিস্ফুট।

তুমি ছিলে তাহার আগে তোমার অলীক স্বপন সম
আমার মায়ার মত অস্ফুট চেতন মম।
দুটি প্রাণে পরশ লেগে এমনি আলো উঠল জেগে
সেই আলোতে মিলিয়ে গেল মায়ার তম।
"আমি" সে যে শূন্য আঁধার চেতনাবিহীন, তুমি চিনে
'তুমির' মাঝে আপনারে সে লয় যে চিনে।
সে চেনা কি যাবে আমি? অসীম তুমি, অসীম আমি
দোঁহার মাঝে দোঁহার বিকাশ রাত্রি দিনে।

কিন্তু প্রেম যেখানে unique নহে, যেখানে সকলের মরম-ভেদী রোদন নির্ম্মমতা মোদের ভালবাসায় মিশিয়াছে তাহা আরও সুন্দর।

জ্বেলেছিলাম প্রদীপখানি ঘরের আলোর তরে
বাহিরও হয় আলো
জগৎ-জোড়া ব্যাথার ছবি পড়ল নয়ন পরে
আঁধার ছিল ভালো।

ফল্গু সম লুপ্ত ছিল বিশ্ব-বেদন-নাড়ী
একটি ধারে প্রাণে
তোমার ভালবাসা যে তার সকল বাধা কাড়ি
বহালে এক টানে।

বিদ্যাপতির সেই ইন্দ্রিয়ানুরাগ ও চণ্ডীদাসের ভাবের উৎকর্ষ নব্য কবিতার ছন্দে ফিরিয়া আনিয়াছেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। তাঁহার শেষের দিক্‌কার কবিতাগুলিতে ব্রজের স্নেহ সখ্য ও মাধুর্য্যরস আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপভোগ করিতে পাই কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বের কবিতা সমুদয় অন্যসুরে বাঁধা। সেখানে তিনি ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে ধাবিত না হইয়া প্রেমকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে বিচিত্র ও মোহন রূপে ধরিয়াছেন। শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী'র প্রেমকবিতায়ও বৈষ্ণবভাবই প্রধান, চির-কিশোর-কিশোরীর লীলা ইন্দ্রিয়ভোগকে রূপান্তরিত করিয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরীর নিকট প্রেম শান্ত ও মধুর নহে। ক্ষুব্ধ ও দুর্নিবার, তাই তাঁহার ছন্দ নূতন ও সতেজ, এবং জীবন্ত। তাঁহার কবিতায় Sheller এর আবেগ এবং Coleridgeএর কল্পনা শক্তি আছে,—

কে সে জান ? কাহার কলিজা,
কোথায় সে দেওয়ানা পীরিতি,
হো হো প্রেম, এই তোর রীতি
বুক ফাটা পাষাণের মুখে
শ্মশানের স্তব্ধ বায়ু বুকে
শোন পান্থ কি অভয় ভাষা
'অমর ! অমর ! ভালবাসা'

নিশ্চল সমাধি শুনে নড়ে
কবরে কবরে সাড়া পড়ে
'মরি নাই মরি নাই, প্রিয়
প্রেম সে যে ধরায় অমিয়"

সাহারার হা হা সম তার সাথে উঠিছে উধাও
মেরি জান! আও—আও—কলিজামে আও!

অথচ mysticism সম্পূর্ণ বিদ্যমান্।

কোথা হ'তে এলে বঁধু?—সুধাইলে মুখ পানে চাও
আশা দিয়ে ভাষাটি লুকাও
কোথা—কতদূর সে বিদেশ
কোথায় আরম্ভ, তার শেষ
বল সে কি আলো না আঁধার
শ্মশান—না মৃত্তিকা আগার?
কেন যাওয়া-আসা ফিরে ফিরে
যে ঘোরায়, সেও ঘোরে কিরে?
ও হাসিতে এ যে তরঙ্গিত
জীবনের বিজয়-সঙ্গীত!
ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা
লুঠ লিয়া দিল মেরি দিলকে পিয়ারা।

বাংলার কবিগণের সে প্রাণ ও উন্মাদনা নাই যাহাতে মহাকাব্য রচিত হইতে পারে। অনেকে বলেন পূর্ব্ব যুগের সে বীরত্ব, সে আভিজাত্যের গৌরব এবং সে রাজসভা নাই বলিয়া মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু জনসমাজের গভীরতম অনুভূতি ও জনকোলাহলের জাগ্রত চৈতন্যের প্রতিধ্বনির মত এমন উপাদান বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা

কোন যুগ মহাকাব্যকে দিয়াছে? জার্ম্মাণ সীলার ও হার্ডার এবং রুশ করমাসনের পথে যাইয়া বাঙালী কবি লোকচৈতন্যের ও দারিদ্র্যের মহাকাব্য ও মহানাট্য সৃষ্টি করুক। তাহা ছাড়া জীবনের সতেজ অনুভূতি এখন মানুষের সঙ্কীর্ণভাব ও আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া অনন্তের সুরে তার বাঁধিয়াছে। যদি কেহ আধুনিক Shakespeare হন তিনি মানবীয় বৃত্তি ও মানব মনের ঘাত প্রতিঘাতকে অতিক্রম করিয়া তুরীয় জগতের মহত্তর আবেগ, বেদনা ও সংঘর্ষকে এই দৈনন্দিন জীবনের ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ফুটাইবেন। বাংলার গীতিকবিতায় এই নবীন আভাষ দেখিয়াছিলাম আমরা বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এবং 'আমি কবিতায়'। বাঙালী কবি অরবিন্দ ঘোষের Perseus and Andromeda নাটক এবং Ahana এবং আরও দুই একটি কবিতায় মহাকাব্যের সেই গাঢ় রস সেবন করিয়াছিলাম। উপা-দানের অভাব নাই, অভাব সেই অনুভূতির, সেই মহাপ্রাণের।

বর্ত্তমান নাট্য সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের গঠন ও ক্রমবিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্থান, বাংলার নাট্য সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের ঠিক তদনুরূপ স্থান। তাঁহার ভাব ও ভাষা, তাঁহার ছন্দঃ ও উচ্চারণ বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যের ছাঁদ ঠিক করিয়া দিয়াছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদ সেই ছাঁদ লইয়া তাহাকে আরও সাজাইয়াছেন, আরও কোমল-মধুর করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই স্বদেশী যুগের ভাবুকতা আনিয়া তাহাকে উদ্দীপনাময় করিয়াছেন। শুধু অমৃতলাল বসু দীনবন্ধুর সধবার একাদশী ও জামাই বারিকের ছাঁদে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।

বাংলার আধুনিক নাটকের কথা বলিতে গেলে ক্ষীরোদ-প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-সাধনার কথাই বলিতে হয়। দুই জনেরই নাটক সমুদায় ভাব ও ঘটনা-সংস্থান, আদর্শ ও মাপকাটি হিসাবে পরবর্ত্তী নাট্যকারগণের রচনা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এটা ঠিক যে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিভা নাটককে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে যেখানে প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গিয়াছিল সেখানে রঙ্গালয় প্রতিভার দ্বারা ঠিক এইরূপেই একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন জাতীয় চিন্তাধারার মধ্যে নাটক আপনার স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু মধ্যযুগে যে অধিকার উহার ছিল সে অধিকার ফিরিয়া পাওয়া উহার পক্ষে অসম্ভব। তবুও ইংলণ্ডের সামাজিক নাটক সম্বন্ধে গিলবার্ট মারে প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বলিতেছেন যে স্নায়বিক বিকার ও সমাজ ক্ষয়ের

বীজই তাহাতে উপ্ত আছে। কিন্তু জার্ম্মাণীতে ইহা ক্ষয়ের বীজ না হইয়া জীবনের পুষ্টি সাধনের উপাদান হইয়াছে। জার্ম্মাণ নাটক কি ভাবে জাতীয় জীবন গঠনের সহায় হইয়াছে তাহা ভারতীয় নাট্যকার মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়।

আমাদের এখানকার লোকের বিবেচনায় থিয়েটার জিনিষটা যুবক, বালক ও স্ত্রীলোকদিগের আমোদ আহ্লাদের জন্য। যাহারা কিছু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে এবং নাট্যকারের ইঙ্গিতে, বক্তৃতায় প্রতারিত হইবার শক্তি যাহাদের আছে তাহাদের জন্য। ইহার ফল একদিকে হইয়াছে যেমন নাট্যসমাজের অবনতি, অপর দিকে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ নাটকে স্থান পাইয়া নাটকের মাপকাটিকে আমাদের বাংলা সাহিত্যের অন্য বিভাগের মাপকাটি হইতে ছোট রাখিয়াছে। নাটকের জাতীয় জীবনের বিপ্লব আনয়নের ও গঠনের এমন উপাদান আর নাই। বাংলার প্রতিভার পক্ষে আর নাটক বর্জ্জন করিয়া চলা হইবে না।

বাংলার কাব্য ও উপন্যাস এখন বিভিন্ন পথে সত্য জীবন্ত ও বস্তু-তন্ত্র হইয়া ক্রমবিকাশের পথে যাইতেছে। কিন্তু নাটক এখনও এই সত্যকার জীবন হইতে মালমসলা সঞ্চয় করিতে চাহে নাই। বাস্তব জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ও চরিত্রের সংঘাত আমরা পাইয়াছি,—দীন-বন্ধুর নীলদর্পণে, ও সধবার একাদশীতে, গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, বলি-দান ও হারানিধিতে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে'তে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব তাঁহার পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক সমূহে এবং তাঁহার বিল্বমঙ্গলে। পাণ্ডবগৌরব নাটকের সুভদ্রা ও জনা নাটকে জনা গিরীশচন্দ্র ঘোষের অলৌকিক চরিত্র। বিল্বমঙ্গল চরিত্রটি অতি মানুষের। বুদ্ধদেব, চৈতন্যলীলা, নসীরাম প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্মমূলক

নাটককে তিনি অপূর্ব্ব ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের কাহিনী, নির্ব্বাণের কথা শুনাইয়াছেন, ভাবরাজ্যের উর্দ্ধসীমানায় উঠিয়াছেন, সেই সঙ্গে বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছেন। এক প্রফুল্ল ও বলিদানে তিনি সামাজিক ব্যাধি হইতে রস সঞ্চয় করিয়াছেন। দুই নাটকেই ঘটনা-সংস্থান ও দুঃখ-ক্লেশের কৃত্রিম ও গুরু আয়োজন বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়াছে। এইরূপ একের পর এক আকস্মিক উৎপাত দৃশ্য-মঞ্চে আনয়নে দর্শকের মনে প্রবল আঘাত করিয়া করুণার উদ্রেক করাতে রসাস্বাদনের ব্যাঘাত ও উৎপাত হয় মাত্র, তাহাতে দৃশ্য কাব্যের রসানুভূতি সুদূর পরাহত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান, মেবার পতন, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বাংলার মসনদ, প্রতাপাদিত্য আহেরিয়া ও রঘুবীর, ঐতিহাসিক ঘটনা, কল্পনা ও আদর্শকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে। এক যুগে রাজপুত বীরপুরুষ বীরপ্রসবিনীর গৌরব বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরীর প্রভাব বাঙ্গালার নাট্য সাহিত্যের উপর কম হয় নাই। সকল ক্ষেত্রেই নাটকের উপাদান রাজসভা, শূরত্ব, বীরত্ব, অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতন, যুদ্ধ কলহের বিক্ষোভের মধ্যে প্রেম উন্মুক্ত কৃপাণের বিদ্যুতে আলোকে মণিখণ্ডের ন্যায় ঝলসিত। এমন একটা যুগের ঘটনা ও ভাব মর্ম্মস্পর্শী হইয়াও বর্ত্তমান জীবনের গঠন ও পুষ্টিসাধনের সহায়তা করে না। তবে চরিত্র বিশেষের মুখে স্থানে স্থানে সময়োচিত স্বদেশী আন্দোলনের যুগের উদ্দীপনাময় ভাব ও আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু নাট্য বস্তুর সহিত তাহা অতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নহে। নাটকীয় চরিত্র সমুদয়ই romantic অবাস্তব কল্পনা

কোন যুগ মহাকাব্যকে দিয়াছে? জার্ম্মাণ সীলার ও হার্ডার এবং রুশ করমাসনের পথে যাইয়া বাঙালী কবি লোকচৈতন্যের ও দারিদ্র্যের মহাকাব্য ও মহানাট্য সৃষ্টি করুক। তাহা ছাড়া জীবনের সতেজ অনুভূতি এখন মানুষের সঙ্কীর্ণ ভাব ও আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া অনন্তের সুরে তার বাঁধিয়াছে। যদি কেহ আধুনিক Shakespeare হন তিনি মানবীয় বৃত্তি ও মানব মনের ঘাত প্রতিঘাতকে অতিক্রম করিয়া তুরীয় জগতের মহত্তর আবেগ, বেদনা ও সংঘর্ষকে এই দৈনন্দিন জীবনের ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফুটাইবেন। বাংলার গীতিকবিতায় এই নবীন আভাষ দেখিয়াছিলাম আমরা বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এবং 'আমি' কবিতায়। বাঙালী কবি অরবিন্দ ঘোষের Perseus and Andromeda নাটক এবং Ahana এবং আরও দুই একটি কবিতায় মহাকাব্যের সেই গাঢ় রস সেবন করিয়াছিলাম। উপাদানের অভাব নাই, অভাব সেই অনুভূতির, সেই মহা প্রাণের।

সাহিত্যের নব-কলেবর

জীবনের ভাঙ্গা-গড়া

প্রায় পনেরো বৎসর হইল রুশ-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বর্ত্তমান উপন্যাস-সাহিত্যের কৃত্রিম আবহাওয়ার কথা তুলিয়াছিলাম। আমাদের গল্প ও উপন্যাসের মানুষগুলা যেন আপনার আভিজাত্য-গৌরবে মজগুল, ঘটনা-বস্তুগুলা যেন শুধু এক প্রেমেরই বিচিত্র ফরমাসে গড়া, সমস্ত জিনিষটা যেন বৈঠকখানার গল্প-আমোদের মত কৃত্রিম ও পোষাকী। ইহাকে নব-নাগরিক সাহিত্য নাম দিয়া আমি রুশ-সাহিত্যরথিগণের ব্যাপকতর আলেখ্য, প্রত্যক্ষ ঘটনাবস্তু ও করুণ সহানুভূতির কথা বলিয়াছিলাম এবং এই দিকেই যে আমাদের সাহিত্য একটা বিপুল প্রসার ও নবীন জীবনের সহিত পরিচয় পাইবে তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছিলাম।

প্রায় এক যুগ অতীত হইল। যে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা অতি কঠোর হইতে চলিয়াছে। সুখের বিষয়, ধনীর হাতে আর সাহিত্য-ভাণ্ডারের চাবী-কাটী নাই। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীই এখন বাংলার সাহিত্য-সৃষ্টির প্রজাপতি। কিন্তু প্রজাপতির মত তাহারা কল্পনার রঙীন পাখায় বাগানে বাগানে শুধু ফুল সঞ্চয় করিয়া বেড়ায় না। জীবনে আমাদের অতি নিদারুণ ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে মর্ম্মন্তুদ ভাবে খসিয়া পড়িতেছে। মধ্যবিত্ত আমরা

কাল ও ভাগ্যের ফেরে হটিয়া যাইতেছি। বিলাস-সম্ভারে নিত্য-সেবিত কি এক পোষাকী পুতুল ছিলাম। পূর্ব্বে, না ছিল আমাদের স্বাবলম্বন, না ছিল সৎসাহস, সুপ্ত চৈতন্যে লুক্কায়িত যত বিলাসের স্বপ্ন তাহারই লহর তুলিয়া একটা সাগরের তলায় সাহিত্যের মায়াপুরী আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর জীবনের ঝঞ্ঝাবাতে আজ সে মায়াপুরী কোথায় মিলাইয়া গেল। বিলাস ও সৌখীনতার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আমরা আজ রাস্তায় বসিয়াছি। চারিদিকে প্রখর আলোর সংঘাত ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে সবল দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া জীবনের রাজপথে অগ্রসর হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনের আজ কি ভীষণ উত্তাপ, প্রতিযোগিতার কি অশোভন লীলা. হৃদয়-হীনতার কি নিদারুণ অভিব্যক্তি! রাজপথে মজুর ও মধ্যবিত্ত কাঙ্গাল বেশে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আজ দাঁড়াইল। শুধু দৈন্য, শুধু ক্লেশ, শুধু নির্য্যাতন সেখানে মানুষের সঙ্গী নহে, যদিও এই গুলিরই সহিত মানুষের এখন প্রত্যক্ষ নিবিড় পরিচয়। আছে তবুও সেখানে মায়া-মমতা ; স্নেহ-প্রীতি, মানুষের মহত্ত্ব, আত্মার চরম অভিব্যক্তি।

এই গুলিকে লইয়া আজ আমাদের এক নূতন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, একটা সাহিত্যও এই জীবনকে আশ্রয় করিয়া অতি সত্য, অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে সৃষ্ট হইল,—মানুষের আত্মার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিতে, মানুষ দীন হইলেও হীন নহে, হীনতার মধ্যেও আত্মার পরিপূর্ণ মহিমারও প্রকাশ হয়, এই বাণী নব্য-সাহিত্যে।

এই নূতন সাহিত্য যেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল অমনি চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। প্রবীণ সম্পাদক বলিলেন, বকাটে ছেলের অপরিপক্ক জেঠামির সাহিত্যে অনধিকার প্রবেশ। এঁরা নূতন কাগজ করিলেন। সমালোচক বলিয়া উঠিল, এ সব বেকার লোক সাহিত্যকে অন্নসংস্থানের

উপায় করিয়া বসিয়াছে। আর্টিষ্ট বলিলেন, এ সাহিত্য একেবারে নগ্ন ও অসভ্য, ইহাতে শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই।

এত সমালোচনার কারণ হইতেছে এই নূতন গল্প-উপন্যাসের ভাষা ও ঘটনা-বস্তুর সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের একেবারে মিল নাই। রুশ-সাহিত্যে তুর্গেনিভ ও গর্কি বুনিনের রচনায় যে প্রভেদ নব্য-সাহিত্যে ও পূর্ব্বেকার সাহিত্যে অনুরূপ পার্থক্যই লক্ষিত হয়।

হীনতার মহিমা

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে সকল নূতন মানুষকে সাহিত্যের আসরে আনিয়াছেন, তাহাদের দেহের ও মনের কদর্য্যতা, গ্লানি ও অপরিচ্ছন্নতা আমাদের কাহারও প্রীতিকর নহে। কিন্তু প্রীতি এক জিনিষ, অনুভূতি আর এক জিনিষ। এমন একটা সহানুভূতি তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, মানুষের হীনতা, বীভৎসতা, পঙ্গুতা, অন্ধতা আমাদের চোখে পড়ে না, উজ্জ্বল ভাবে উদয় হয় মানুষের একটা নিরাবিল মনুষ্যত্ব। নাই বা হ'ল এ সাহিত্যের মানুষ, মহাভারতের চিরস্মরণীয়গণের মত সাধু ও ধার্ম্মিক, সে যে মানুষ—এই বলেই যে সে আমার প্রিয়, জীবনের পরম সান্ত্বনা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই উল্‌কী-কাটা সুরকীর কলের মজুরণী নেত্য আমাদের হিসাবে গৌরবময় জীবন অতিবাহিত করে না; কিন্তু তাহার জীবনের গোপন অনুচ্চারিত ব্যথা যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের চিরন্তন প্রশ্ন জাগায়—এটা সুনিশ্চিত। ঠন্‌ঠনের মুচীর মেয়ে পাঁচি সংস্কারের বশে তাহার ব্যর্থ-জীবনের সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা ও সমস্ত কামনাকে অস্বীকার করিয়া আপনাকে নির্ম্মম ভাবে বঞ্চনা করিয়াছে, এবং জীর্ণ কন্থিতে আপনার লজ্জা আবরণ করিতে গি

পারিয়াও ভ্রাতাকে দারিদ্র্যের নিদারুণ লজ্জা ও পাপের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদা সচেষ্ট,—হ'লেই বা সে মুচিপাড়ার রণচণ্ডী কিন্তু সাহিত্যের আসরে সে ত একটি নিষ্ফল-যৌবনা, মমতাময়ী ভগিনীরূপে দেখা দিল। যত দিন মনুষ্যত্ব আছে ততদিন ভগিনীর মর্য্যাদা, অন্ধকার অপরিসর গুণরাশিনাশী পঙ্কিল বস্তির মধ্যে অথবা বাধা-বন্ধনহীন ধনি-পরিবারের স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশ হউক, ইহাতে কিছু আসে যায় না।

শুধু দেখিতে হইবে ঘটনা-সংস্থানটা সহজ, সরল, সত্য হইল কি না। শৈলজানন্দ অতসী ও অতসীর মার চিত্র আঁকিয়াছেন, কাঙ্গাল, উপায়হীন নারী যৌবনের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিয়া রোগ ও অতিশ্রম তাহাকে পথে বসাইয়াছে, সে ও তাহার ম্লান-মুখী স্বামি-পরিত্যক্তা ভিখারিণী মাতা—দুই জনেই নর্দ্দমার ফেনের দ্বারা লালিত-পালিত। বাস্তবিক বস্তি-জীবন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের প্রত্যেকেরই লেখনীতে অতি স্পষ্ট, সহজ ভাবে ফুটিয়াছে।

নূতন ভাষা

তাই ভাষাও হইয়াছে তাঁহাদের নূতন রকমের। এক, ভাষার দিক হইতে ইঁহাদের দান বড় কম গৌরবের নহে। অচিন্ত্যবাবু বর্ণনা করিতেছেন—মাঠ ও বাজার। রেল-রাস্তা পেরলেই মাঠ,—সমস্ত হাওয়া একচেটে ক'রে রেখেছে। এ দিকের ঘেঞ্জি সহরতলি ধোঁকে,—লজগজে পুঁয়ে-পাওয়া সহর। শৈলজানন্দের সৃষ্ট—যমুনা-গাঁয়ের অন্ধ কুঞ্জবিহারীর সহিত লখিন্দরের আলাপ অথবা ষোল-আনার কথোপকথন, ভৈরবতলার আলাপ প্রেমেন্দ্র মিত্রের লক্ষ্মীকান্ত শিবু অথবা পটলী-নুলোর কথাবার্ত্তা বাংলা সাহিত্যে নূতন জিনিষ। এ সকল ভাষা সতেজ, জীবন্ত, মর্ম্মস্পর্শী।

তথাকথিত, কথিত ভাষার মত ইহা ন্যাকামিতে পূর্ণ নহে, খাঁড়ার মত ইহা কাটিতে কাটিতে চলে। মানুষগুলোর যেমনি শুক্‌নো খোসা-ওঠা মুখ, কোটরে-ঢোকা চোখ, রোগে, অতিশ্রমে, অত্যাচারে ঠোঁটগুলা তাহাদের যেমন বাঁকা, তীক্ষ্ণ, ভাষাও তাহাদের তেমনি শক্ত ও জোরালো। আধুনিক ছোট গল্পের অভ্যস্ত, চায়ের পেয়ালার উপর কথিত ভাষার মত হাল্‌কা ও ঠুন্‌কো নহে।

রসের বৈচিত্র্য

সর্ব্বাপেক্ষা বড় গৌরব ইঁহাদের, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ইঁহারা জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইয়াছেন। সাহিত্য-গুরু-গণের অপেক্ষা ইঁহাদের চিত্রপট অনেক বড়, অনেক রহস্যময়, অনেক নূতন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দামিনী শচীশ, শ্রীবিলাস জ্যাঠামহাশয়, ভাই-ফোঁটা প্রভৃতি গল্পে ও নানা গল্প কবিতায়, ও শরৎচন্দ্র তাঁহার শ্রীকান্ত মহেশ ও দেবদাসে বাংলার গল্প-সাহিত্যে যে নূতন ধারার সন্ধান করিয়াছিলেন, সেই ধারাই—এই নূতন লেখকগণের রচনায় পূর্ণ ও বিচিত্রভাবে বহিয়া চলিয়াছে, নিত্য নূতন জীবন-রসের ঢেউ তুলিয়া।

সাহিত্য যখন রাজবেশ এবং উকীল ব্যারিষ্টার কেরাণীর ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়া একবারে কাঙ্গাল সাজিয়া দিন-মজুরের সহিত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘটনা ও রসের বৈচিত্র্য ত হইবেই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্প-সাহিত্যের প্রধান বিড়ম্বনা বার বার এই হয় যে, শিল্পীর অনুযায়ী ঘটনার সমাবেশ করা যায় না। যাঁহাদের সহিত তাঁহারা আমাদের সচরাচর পরিচয় করাইয়া দেন তাঁহারা যে আমাদেরই মত আচার ও সংস্কারাবদ্ধ। একটা সমাজ-দ্রোহী ঘটনাবস্তু সৃষ্টি করিলে, জিনিষটা আবেষ্টন হিসাবে এমন বেমানান হইবে যে, রসসৃষ্টিরও হানি হইবে ইহাতে।

রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও চোখের বালি এবং শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন সংস্কারের সীমানা যাহাতে অতিক্রম না হয় এই সাবধানতা ও আড়ষ্টতায় কত না ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমাজবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীর চরিত্রকে বাঁচাইতে যাওয়ার চেষ্টাটাই রস-সৃষ্টির পক্ষে খুব মারাত্মক জিনিষ। আমাদের প্রধান উপন্যাস-রসিকগণের গোড়াকার বাধা হইয়াছিল ইহাই।

আমাদের নব্য সাহিত্যিকগণ এই বাধা হইতে মুক্ত। যাহাদের জীবন তাঁহারা আঁকিতেছেন বা সমালোচনা করিতেছেন তাহারাই যে একবারে বে পরোয়া সংসারের পরিত্যক্ত টুটা-ফুটার দল। সমাজ যে ইহাদিগকে ঘৃণ্য দূষিত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, তাই ইহাদেরও সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান। যদি বিদ্রোহী না হয় তবে পশুর মতন হীন, পঙ্গু হয় ইহারা।

অতিশ্রম, অনশন ও অত্যাচার ইহাদের মানসিক ও নৈতিক অবনতি আনে—ইহা অনিবার্য্য। তাই পানওয়ালী রুকৃমা, বামুনদিদি হোটেল-ওয়ালী, পাঁকের পটলী, মজুরণী দরদিয়া, গৃহহীনা দাসী, কলঙ্কিতা।

ঘটনা-বস্তুর বৈচিত্র্য

সমালোচকগণ বলেন—এই অতি-আধুনিক সাহিত্য মানবের আদিম প্রবৃত্তিকে নগ্ন করিয়া দেখাইয়াছে। নূতন সাহিত্যে যৌনপ্রেম সময়ে সময়ে কদর্য্য ভাবে অঙ্কিত আছে সত্য। তাহার প্রধান কারণ, যাহাদের জীবনে আলো ও আনন্দ নাই, প্রেম তাহাদের প্রাথমিক ক্ষুধা না হইয়া পারে না। কিন্তু প্রেম এ সাহিত্যের একমাত্র, এমন কি প্রধান উপকরণও নহে। বরং সমাজের ভাঙ্গাগড়াকে আশ্রয় করিয়াই যৌনপ্রেম ফুটিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষ শতগ্রন্থিতে আবদ্ধ। যেখানে কোন একটি গ্রন্থি শিথিল হয়, বা কেহ উহাকে টানিয়া ছেঁড়ে, সেইখানেই এক একটি Tragedy'র সৃষ্টি; গৃহ বা সমাজের ভাঙ্গন এই নূতন সাহিত্যের প্রধান

উপকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বেকার সাহিত্যের ঘটনাবস্তু অধিকাংশই সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে সংগৃহীত। তাই ঘটনার সমাবেশে একটা বৈচিত্র্যহীনতা এমন কি সৌসাদৃশ্য দোষ অনেক সময়ে এড়াইতে পারা যায় না। আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন-যাত্রাই যে এক-ঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, নানাবিধ আচার ব্যবহারের দ্বারা তাহা সংহত ও আবদ্ধ। একটা ব্যাপকতর জীবন হইতে ঘটনা-বস্তু আহরণ করাতে সাহিত্য খুব নূতন ও বিচিত্র হইয়া উঠিল। প্রেমের এখানে একঘেয়ে অবাধ প্রভুত্ব নাই। কোথায় দেখিতেছি একটি নূতন রেল তৈয়ার হইল, দলে দলে শ্রমজীবিগণ মজুরীর খোঁজে আসিল, পারিবারিক জীবনেব পবিত্রতা গেল, সামাজিক বিন্যাস নষ্ট হইল, ধ্বংসের মধ্যে কত ব্যথা, কত ক্লেশ নূতন সাহিত্যেব উপকরণ হইল। নূতন সহর বসিয়াছে। বাড়ীর পর বাড়ী তৈয়াবী আরম্ভ হইল। সম্পত্তির নেশায় মানুষ হৃদয়হীন হইয়া সবুজ পৃথিবীকে অবমাননা করে। বাড়ীগুলা যেন শ্রীহীন, কাঙ্গাল, প্রাণবর্জ্জিত। তাহারা যেন শুধু মানুষের মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, হাত পা ছড়াইবার, প্রাণ মেলাইবার জন্য নহে। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরে দেখা দেয় একটা জীর্ণ, নির্জীব ভব্যতা। ভব্যতা হইল সহরগুলির দেবতা; সে নিজের মুখ নিজে সাহস করিয়া দেখে না; অন্তর বাহিরের দারিদ্র্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকিতে ঢাকিতে সে মানুষের জীবনকে ক্রমশঃ দুর্ব্বহ করিয়া তুলে। ইংরাজ কোম্পানী ছায়া-সুনিবিড় গ্রামের পাশে কয়লার কুঠি খুলিল, চারিদিক ইমারত অট্টালিকায় কিছু দিনের মধ্যেই ভরিয়া গেল। দোকানী-বুদ্ধি গ্রামের সামাজিক শান্তি নষ্ট করিল। কিছুকাল পরেই কয়লা কাটা শেষ হইল। খনিতে আগুন লাগিল। বারবিলাসিনীর চাকচিক্যের মত নূতন সহর-গুলির ঐশ্বর্য্য কোথায় অন্তর্হিত হইল। কিন্তু অদূরে গ্রামটি পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি রহিয়াছে—মাঠ ঘাট শস্যে সম্পদে বার মাস সবুজ। শুধু

মাটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে অসহায় কুলি-কামিনের, ক্ষুদ্র মুদী-দোকানদারের। বেলজিয়মের কবি ভেরহিয়াবেন যে বৃহৎ শিল্প-কারখানা প্রবর্ত্তিত সামাজিক বিপ্লবের অশান্তি ও ক্লেশের কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাই নূতন আকারে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল। হমসেন Growth of the Soil এ যে খনির তৈয়ারী, ক্ষণিকের ঐশ্বর্য্য চিরন্তন কৃষি-সম্পদের সঙ্গে তুলনা করিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন সেই সার্ব্বজনীন তত্ত্বটি আবার কেমন নূতন, কেমন সত্য ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইল। নূতন সাহিত্যে বাস্তবিক ঘটনা-বস্তুর বৈচিত্র্যের সীমা নাই।

সাহিত্যের প্রেমধর্ম্ম

এইখানেই এ সাহিত্যের প্রধান গৌরব। জীবনের যে দিকটার সহিত আমরা এত দিন সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারি নাই, যেখানে শত মানুষ তাহাদের অশান্ত অশ্রুজল, শুষ্ক উদাসীন কঠিন মাটির উপর ফেলিতেছে, সান্ত্বনা দিবার তাহাদের কেহ ছিল না, নবীন সাহিত্যিক আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া সেই অভিশপ্ত ব্যর্থজীবনের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন, অসংখ্য মানবের সন্তপ্ত হাহাকার দূরদূরান্তের ব্যর্থ ক্রন্দন শুনাইবার জন্য। যে সাহিত্য যত বেশী মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের গ্রন্থি অটুট করে, নূতন করিয়া তৈয়ার করে, তাহার তত মূল্য। নূতন সাহিত্যের একটা আত্ম-ভোলা, বিশ্বজয়ী অগাধ প্রেম আছে। সমাজ ও সাহিত্য উভয়ের পক্ষে এই প্রচণ্ড সহানুভূতি কম কল্যাণকর নহে।

শত বাধা বিঘ্ন দৈব দুর্ব্বিপাকে মানুষ সদাই ত হোঁচট খাইতেছে, ক্ষত বিক্ষত ও পঙ্গু হইতেছে। পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাইবার ভার সাহিত্যকে লইতে হয়। কারণ,যে পঙ্গু, হউক না সে অসহায়, পদানত, ধূলায় মলিন,কিন্তু তাহার অন্তর বাহির যে সেই এক বিরাট মহৎ পুরুষের উপাদানে তৈয়ারী।

নিদ্রিত নারায়ণ

বাস্তবিক দুনিবার কলঙ্ক, দুরপনেয় কদর্য্যতা ও জন্মপঙ্গুতার মধ্যেও মানুষ যদি তাহার বৃহত্তর জীবনের ব্যাকুলতার পরিচয় দেয়, তাহার নিষ্পাপ মনুষ্যত্বের আহ্বান যদি গভীর দুরাশার অন্ধকার হইতেও শুনা যায়, তাহা হইলে ইহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা মহিমার কথা হয় না ? ইহার মূল্য যে দ্বিধা-বিরোধহান অনেক পুরুষ ও নারীর অপরীক্ষিত, সৌখীন ধর্ম্ম ও সতীত্বের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। আবার যদি পতনের অতল সীমাহীন অন্ধকারে তাহারা একেবারে ডুবিয়া যায়, আর না মাথা তুলিতে পারে, আমরা কি সেই আশাহীন অতলের অগৌরবের মাঝে দাঁড়াইতে ব্যাকুল হই না ! তাহারা ত মানুষ এবং তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া না বুঝিলে, না ভালবাসিলে আমরা যে অ-মানুষ থাকিয়া যাইব। দুঃখ, অতৃপ্তি, বিফলতা তাহা হইলে আমাদেরও হইবে। নূতন সাহিত্য দেশকে এই পাপ ও অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখুক।

মজুর শ্রমজীবীদিগের অতিশ্রম ও অনশন, সহরতলীর বস্তির ভীষণ অস্বাস্থ্য ও পাপাচার লইয়া দেশে আমি বহুকাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের নিত্য জীবনের কদর্য্যতা ও দৈন্য প্রত্যেক মানুষকেই পীড়া দেয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পীড়া দেয় এই চিন্তা যে, ইহারা এই দৈন্য ও কদর্য্যতাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লয়, জল আকাশ বাতাসের মত এ গুলি যেন ভগবানেরই দান। নিষ্ফল আক্রোশে আমি 'নিদ্রিত নারায়ণ' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নাটক লিখিয়া বসিয়াছিলাম, সে বহু বৎসরের কথা,—বস্তির পাপ, অনাচার, অত্যাচারের মধ্যে নারায়ণ যেন দীনহীন রোগী, পাপী হইয়া সমাজের নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন।

"আলোক লঙ্ঘিয়া হইছ অন্ধ
মুক্তি তেয়াগি হইছ বন্ধ
ত্যজিয়া সুখ, দুঃখানন্দ
তুমি দুখ-লোক-চারী হে।"

এ নির্য্যাতনের পরিণাম কোথায়? বিপ্লবে নহে। কারণ, বিপ্লবে জাগে শক্তি, জয় হয় হিংসার। পদদলিত মনুস্যত্বের ইহাতে পরিপূর্ণ জাগরণ হয় না। সত্যকার জাগরণ হয় সদ্ভাব ও সহানুভূতির উন্মেষে। উন্নত ও অবনত মানুষের মৈত্রী ও প্রীতির উদ্বোধনে। রুশসাহিত্য এই নূতন জাগরণের সহায় হইয়াছিল। আমাদেরও নবীন সাহিত্য নির্য্যাতিত নারায়ণের মুক্তির বাণী প্রচার করুক।

লেখকগণ

এই নবীন সাহিত্যের পুরোহিতদিগের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র হইয়াছেন দার্শনিক, বহুদর্শী। তিনি এই আন্দোলনকে আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়াছেন। মহনীয় ভাবুকতা তাঁহার, অথচ বাস্তবতার উপর ঝোঁক ও আয়ত্ত তাঁহার কম নহে। বেনামী বন্দর হইয়াছে এই দুনিয়া, সব অথর্ব্ব ভাঙ্গা জাহাজের ভিড় এইখানে।

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙ্গা জাহাজের ভিড়।
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল, আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলষ গেল ধুয়ে যার আর পতাকাও পড়ে নুয়ে
জোড় গেল খুলে, ফুটো খোলে আর বইতে যে নারে ভেসে
তাদের নোঙর নাবাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়
যত হতভাগা অসমর্থের নির্ব্বাসিতের নীড়।

আবার ভগবানকে ডাকিয়া কহিয়াছেন,—

কাঁদিবার সাধ
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধূলায়
আঘাত করিবে আপনারে,—মৃত অবিশ্বাসে
আবার ভাসিবে আঁখি নীরে!
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত,
যত কান্না ধরণীতে; তার মাঝে তুমি কাঁদ
এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি।

শ্রীশৈলজানন্দ হইয়াছেন এই আন্দোলনের কথক ও প্রচারক। কথকের মতন তাঁহার বলিবার কমনীয় ভঙ্গী। মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধে অসাধারণ পারদর্শিতা তাঁহার। অবনত মানব-সমাজের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তালে তালে তাঁহার নিপুণ লেখনী দ্রুত চলিতে থাকে। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খুনী আসামীর লেখক), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সান্যাল ও শ্রীজগদীশ গুপ্ত গল্প সাহিত্যে—এই নূতন পথেরই পথিক। সমাজের কুটিলতা, নির্ম্মমতা নৃশংসতার মাঝে ইঁহারা কাঁদিয়াছেন এবং মানুষকে ধন্য মানিয়া সাহিত্যকে নূতন মহিমায় গৌরবান্বিত করিতেছেন।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্রভাবে এই আন্দোলনকে এখন পুষ্ট করিতেছেন। গীতিকবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে সব দিকেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার বেদের বাতাসীর চিত্র বাংলা সাহিত্যের একটা অপরূপ নূতন সম্পদ। সজীওয়ালীর নিষ্ফল যৌবনের অপরিতৃপ্ত মমতা ভুলো দিন-মজুরের অসহায়তা ও ক্লেশ, একটা নূতন প্রকার ঘটনাবস্তু ও আবেষ্টনের মধ্যে অতি মনোরম হইয়াছে। ভাষা তাঁহার অতি সতেজ ও সর্ব্বতোমুখী, চিন্তা তাঁহার নূতন, শিল্পও তাঁহার অনবদ্য।

শিল্প-পদ্ধতি

নূতন সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখা দিয়াছে। চৈতন্য যখন অতি-জাগ্রত হয়, আবেগ যখন দুরন্ত হয়, তখন নক্সাই বেশী তৈয়ারী হয়। উপন্যাসে যেন ইহা গীতিকবিতার মত। প্রচণ্ড বেগ অন্তরে তাহার, তাই যে সহিষ্ণুতা উপন্যাস-সৃষ্টির উপকরণ তাহার অভাব বলিয়া যেন উপন্যাস ঠিক একটা গড়িয়া উঠে না। হামসুনের Wanderers এর মত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বেদে ধারাবাহিক রূপে ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। গর্কীর গল্প-সমুদায়ের মতন প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক ও আগামী কাল, শৈলজানন্দের ষোল-আনা বা বাণভাসি নক্সা হিসাবে অতি রমণীয়। উপন্যাসের শিল্পপদ্ধতি বিচিত্রভাবে রুশিয়া, ফ্রান্স ও নরওয়েতে এখন প্রকাশ পাইতেছে। উপন্যাস এক কাঠামে গড়া কোন দেশে হয় নাই, হইতেও পারে না। বাংলার গল্প-উপন্যাসে নানা শিল্পপদ্ধতি অনুধাবন করাই বাঞ্ছনীয়। নূতন সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ না কেহ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে করিতে এমন একটি প্রণালী খুঁজিয়া পাইবেন যে, সত্যি সত্যি নূতন মানবের একটা epic মহাকাব্য তৈয়ারী হইয়া যাইবে। বঙ্গ-সরস্বতী কোন্ অজানা ভাবুকের গলায় বরমাল্য প্রদান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন! এ মাল্যের কুসুম-সুরভি নন্দন কানন হইতে চয়ন করা নহে; জগতের যত ব্যথিত, দলিত হৃদয় শোণিত-রাঙ্গা হইয়া মাল্যের বিচিত্র কুসুম সাজাইয়াছে; মহামানবের অনাদি ক্রন্দনাশ্রুতে অভিষিক্ত মাল্যের ডোরখানি; স্পর্শ তাহার বিশ্বসৃষ্টির নিগূঢ় ব্যথার মতন সুতীক্ষ্ণ। এ মাল্য গ্রহণ করিবার জন্য কে প্রস্তুত হইতেছেন? কাহার এ মহাভাগ্য হইবে? আমরা তাঁহাকে অনতিদূর অতীত হইতে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেছি।

দরিদ্রিয়ানা

ভঙ্গিমা

নূতন সাহিত্যে যে একটা নিবিড়তর সহানুভূতি দেখা দিয়াছে তাহাকে 'দরিদ্রিয়ানা' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহা যেন ব্যক্তি ও দল বিশেষের একটা ভঙ্গিমা। এ ধারণা নূতন সাহিত্যের প্রতি একটা ঘোর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফল।

এটা ঠিক তত্ত্ব বা উপদেশ গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যে প্রচার করিতে গেলেই জিনিষটায় রসের সৃষ্টি না হইয়া অনেক সময়েই ভঙ্গিমা বিস্তার হইয়া পড়ে। লেখকের যে কোন ভঙ্গী সাধু হউক, অসাধু হউক, তাহার রস প্রকাশের বাধা দেয়। তাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টির খর্ব্বতা ঘটে। কিন্তু মানুষের ভাব ও আদর্শের বৈচিত্র্য সাহিত্যকে এক-টানা সমতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাংলার নূতন সাহিত্যে গরীবদিগের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখা দিয়াছে তাহা বহুজন ও লেখকের নিকট একটা ভঙ্গী বলিয়া মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে নব্য সাহিত্যিকের একটা প্রাণ আছে, একটা জীবন্ত অনুভূতি, সৃষ্টির আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া এই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতটা আশা হয়।

নূতন অভিজ্ঞতা

ইহা বলা বাহুল্য যে, সমাজে মনুষ্যত্বের প্রতি একটা গভীরতর শ্রদ্ধা দেখা দিয়াছে। আমরা মানব-জীবনকে পূর্ব্ব অপেক্ষা আরও বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি। তাই রাজা-রাজড়ার অলৌকিক কাহিনী অথবা

ড্রয়িংরুমের কৃত্রিম কথোপকথন আমাদের সাহিত্যে কমিয়াছে। জীবনের সংগ্রাম ও উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা মানুষের মহত্ত্বকে সর্ব্বস্থানে, দীন-হীনের কুটীরেও খুঁজিতেছি। ইহাকে কেহ যেন ভঙ্গী না বলেন। অর্থশাস্ত্রেরও ইহা একটা অধ্যায় নহে। একটা নূতন অভিজ্ঞতা ইহাকে জন্মদান করিয়াছে। মানব-জীবনকে আরও বড়, আরও মহৎ, আরও সুগভীর করিয়া দেখিবার ইহা একটা বিপুল আগ্রহ। ইহার পশ্চাতে আছে সংযম ও আত্ম-নিবেদন, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, দলবৃদ্ধি নহে, অবাধ সৃষ্টির আনন্দে ইহা ভরপূর। ফলে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা প্রচলিত সমাজ-বিধি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিলেও সমাজ-গ্রন্থিকে শিথিল করিবে না বরং সুদৃঢ়তর করিবে।

গরীবদিগের সুখ-দুঃখ, আশা- নিরাশার অভিজ্ঞতা,— ইহা গৌণ ভাবে সাহিত্যে আসিয়াছে। একটা সজাগ, ব্যাকুল অনুভূতি সব আধারেই মানুষের মহত্ত্বকে খুঁজিয়াছে, মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছে,—হইলই বা মানুষ সেখানে আর্ত্ত, ক্ষুধাতুর, পদানত।

বিবাহের বন্ধন, সামাজিক নিয়ম, বৈষয়িক সমাজ-বিন্যাসের বিধি-নিষেধ, নূতন সাহিত্য অগ্রাহ্য করিয়াছে, সমাজকে বিদ্রূপ ও নীতিকে অবমাননা করিবার জন্য নহে, মনুষ্যত্বের গর্ব্ব-প্রকাশের জন্য।

সাহিত্য ও সমাজ-রীতি

এটা ঠিক সমাজিক রীতিনীতি সকল কালে ও সকল দেশে দীন হীন দরিদ্রের উপরই পাষাণ ভারের মত থাকে। কত অবিচার অত্যাচারের জন্য মানুষের তৈয়ারী নিয়ম-কানুন দায়ী, এবং উচ্চশ্রেণী যেমন অন্ধ-ভাবে আপনার স্বার্থানুমোদিত ব্যবস্থাই আঁকড়াইয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীও তেমনি নীরবে নির্ব্বিবাদে আপনার রক্ত ও অশ্রু দিয়া তাহা বাঁচাইয়া রাখে। তাই

যে দেশে ও যে কালে সাহিত্য অ-জাত, নীচ-জাত outcastes লইয়া কারবার করে, সমাজ ব্যবস্থার বাঁধাবাঁধি নিয়ম-কানুন তাহার নিকট বেদ বা স্মৃতি নহে। বর্ত্তমান যুগে হামসুন, গোর্কি, বুনিন, রেমণ্টের গল্প উপন্যাস ইহার সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু ইহার ইঙ্গিত এই নহে যে এ সাহিত্য সকল নীতি ও সমাজ বিধির অতীত। মানুষের জীবনেতিহাস কতকগুলি নিয়ম বা নীতি নির্ব্বাচন করিয়াছে যাহা সকল শ্রেণীর, সকল যুগের। তাহার অনাদর কোন সমাজ, আর্ট বা সাহিত্য করিতেই পারে না। যুগপরম্পরালব্ধ নীতি ও নিয়ম যাহা মানুষের সমাজ রক্ষা ও বিকাশের কারণ হইয়াছে, যাহা তাহার চরিত্রের মর্ম্মগত সত্য, তাহাকে অস্বীকার করিবার কাহারও অধিকার নাই।

কিন্তু অধিকার আছে সম্পূর্ণ যখন রীতি সমাজের দোহাই দিয়া, অতীতের নির্দ্দেশ করিয়া, পৌরুষকে খর্ব্ব করিয়াছে, নারীত্বের অবমাননা করিয়াছে, অথবা উচ্চশ্রেণীর ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের সহায় হইয়া সমাজে অশান্তি ও অসদ্ভাব আনিয়াছে।

মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা

ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার যুগে আমাদের সহিত লোকসমাজের ভাব ও আদর্শের একটা মূলগত প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ প্রভেদ না ঘুচিলে দেশের সাহিত্য জাতির মর্ম্মগত হইবে না—দেশের অন্তস্তল স্পর্শ করিবে না। তরুণ-সাহিত্য জনসাধারণের অনুভূতি ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও কলুষ আজ বিচিত্র ও নির্লজ্জ ভাবে আমাদের নিকট ধরা দিল। কিন্তু ইহা সাহিত্যের বেয়াদবী নহে। কারণ এ সাহিত্যে কামনা ও কলুষের উদ্ধে একটা মনুষ্যত্বের চিরন্তন তেজের

পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যাহা শত অভাব, ক্লেশ ও নির্য্যাতনকে পরাভব করিয়াছে। মানুষ দীন, হীন, পাপী হইয়াও আপনার মনুষ্যত্বে যদি সুপ্রতিষ্ঠ থাকে তবে কিসের লজ্জা, কিসের ভয়। পাপের ক্লেদ, পাশবিকতার উত্তাপ নবীন সাহিত্যকে যে স্পর্শ করিতেছে ইহা সত্য, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা যদি তাহার অটুট থাকে উহাই তাহাকে সকল পঙ্কিলতা হইতে রক্ষা করিয়া সত্য ও মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

কারখানার শ্রমিক, কয়লার খনিক, মাঠের মজুর, বাজারের পানওয়ালী সাহিত্যের আসরে নামিয়াছে বলিয়াই যে যুগ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল, তাহা নহে। ইহাও ঠিক নহে, যে সাহিত্যের নব-যুগ বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারাকে একেবারে অগ্রাহ্য বা লুপ্ত করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মানুষের অভিব্যক্তির নিয়মই এই যে এক যুগ পরবর্ত্তী কালের মধ্যে সফলতা লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। শুধু সাহিত্য নহে, সমাজ, ধর্ম্ম, শিল্প, সব ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে।

নব-যুগ

সাহিত্যে নব-যুগের উন্মেষ হইল আমরা তখনই বলি, যখন এমন বিশিষ্ট ভাব ও আদর্শের সহিত পরিচয় পাই, যেগুলির পূর্ব্বে হয়ত সূচনামাত্র হইয়াছিল, কিন্তু এখন সাহিত্যে নূতন রস সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। বলিয়া রাখা উচিত, উপন্যাস-সাহিত্যের বিচার কাব্য-বিচারের মাপকাঠি অবলম্বনে হয় না। কাব্য-সাহিত্যে বিষয়ের গৌরব নাই, অনুভূতি ও রূপেরই গৌরব। প্রগাঢ় অনুভূতি ও সুন্দর রূপ কাব্যের, বিশেষতঃ গীতিকাব্যের প্রধান উপাদান। উপন্যাস-সাহিত্যের উপাদান বিভিন্ন। তাহা ছাড়া উপন্যাস-সাহিত্য বর্ত্তমান যুগে বহুমুখী বিচিত্র হইয়া জীবনকে নানা দিক হইতে আন্দোলিত করিতেছে, গড়িয়া তুলিতেছে। উপন্যাস-সাহিত্য

নূতন বিষয় ও নূতন রসের গৌরবেই গরীয়ান্। এটা নিশ্চিত বাংলার তরুণ উপন্যাস-সাহিত্য নানা দিক হইতে জাতির উপেক্ষিত, অনাদৃত জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও জীবন অবলম্বনে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাব-জগৎ তৈয়ার করিতেছে। ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের অনেক প্রভেদ। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের পঙ্গুতা ও সংশয়তাকে ইহা পরিহার করিয়াছে, ইহা দ্বিধা-হীন, নির্ভীক্। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের কৃত্রিমতা-দোষ-বিবর্জ্জিত। তাহা ছাড়া, ইহার অনুভূতি প্রগাঢ়তর। জীবন-সংগ্রামের উত্তাপ ও নির্ম্মমতা যাহা আজ আমাদিগকে বিমূঢ় ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছে এ সাহিত্য তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া। তাই ইহার এত তেজ, এত সাহস। যে নূতন সামাজিক ভাবুকতা আজ রাষ্ট্রীক ও অর্থনৈতিক ভাঙ্গাগড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা এ সাহিত্যের প্রাণ। সমাজের নীচ উচ্চ হীন মহৎ সকলকে ইহা বরণ করিয়াছে। কলসীর কাণার বিনিময়ে প্রেম বিতরণ করিয়াছে। একটা গভীরতর সমবেদনায় আজ সে দীনহীন অধম পতিতের সঙ্গী। অ-অমানুষের হিংসা, লোভ, পাপকে আজ সে ঘৃণা করে নাই, ঘৃণিত জগৎ তাহার হৃদয়ে গভীর দুঃখ জাগাইতেছে, রুদ্ধ আবেগ তাহার যুগ-পরম্পরা-সঞ্চিত সমাজ-বিধি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আজ একটা মহা-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, নিঃসংশয়ে, অসীম অবহেলায়, কারণ সে পরশমণির সন্ধান পাইয়াছে,—

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙ্গে চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোণা করিবার পরশ-পাথর হাতে আছে তার,
তাই ত প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা লইয়া নানা দেশের ও সমাজের নানা মাপকাঠি। যত কিছু প্রশ্ন উঠে সাহিত্যে যৌন-সম্পর্কের বিচার লইয়া। যৌন-সম্বন্ধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আদর্শকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মালাবারে এক পত্নীর বহু স্বামী, কিন্তু সেখানেও বিবাহের বন্ধনের পবিত্রতা আছে, স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারে একটা সুষ্ঠুতা ও আবরুতা আছে। অন্য দেশের স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে তাহা কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। বর্ব্বর মানুষেরও যৌন সম্বন্ধে বে-আবরুতা ও স্বেচ্ছচারিতা লক্ষিত হয় না, তাহারও সভ্য-জাতির মত যৌন-আচার ও বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া অনেক নিয়ম-কানুন আছে। মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশে—স্ত্রীজাতির লজ্জা ও পুরুষের শুচিতা যৌন-সম্বন্ধকে সুদৃঢ় করিয়াছে,—যাহা কেবল পশু-জীবনের নেশা ও উত্তেজনা ছিল, তাহাকে সংযম ও অভ্যাসের দাস করিয়াছে। যৌন-নির্ব্বাচন মানুষের ক্রমোন্নতির একটি প্রধান আশ্রয় এবং শ্লীলতা মানুষের যৌন-সংযম ও অভ্যাসের সহায় হইয়া যৌনসঙ্গমকে ক্লেশ ও অবসাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহার ফলেই বিবাহ-পদ্ধতি ও পরিবার-পালনের সুপ্রতিষ্ঠা। ভিন্ন আবেষ্টনে, জাতিতে ও সমাজে বিবাহ ধর্ম্ম বিভিন্ন এবং শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধেও বিভিন্ন মাপকাঠি। সাহিত্যে শ্লীলতার এক রায় হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, সাহিত্যে অনেক সময় নূতন প্রকার যৌন-সম্পর্ক কল্পনা করে, সমাজের অভ্যস্ত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া একটা নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তখন সমাজ-

পতিগণ সেই সাহিত্যকে গালাগালি দেয়, 'এ সাহিত্য সমাজ-দ্রোহী, এ সাহিত্য অশ্লীল'।

পৃথিবীতে যত কিছু ব্যথা, বেদনা আছে, তাহা লইয়াই সাহিত্যের কারবার। কোথায় সমাজ-ধর্ম্ম শ্লীলতার দোহাই দিয়া ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন করিল, সুহৃতা রক্ষাকল্পে গভীর হৃদয়-বেদনা আনিয়া দিল, সাহিত্যের পক্ষে ইহা শুধু উপকরণ নহে, একটা নূতন আদর্শ ফুটাইবার আশ্রয় ও অবলম্বন।

সব ক্ষেত্রেই নানা আদর্শ মানুষ গড়িয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধেও মানুষ যে কেন বিভিন্ন আদর্শ একই সমাজে না গড়িবে, তাহার উত্তর কোন সমাজ-পতিই দিতে পারিবেন না। যৌন-সম্বন্ধ অতি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ, তাই ইহার এত বৈচিত্র্য। যৌন-সম্বন্ধ অতি স্থূল সম্বন্ধ, তাই ইহা এত নিয়ম-কানুনে বাঁধা। নিয়ম ও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির উন্মেষ, দুই-য়ে চির-যুদ্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। কোথায় নিয়মের জয় হইল, প্রেম হাহাকার করিতে লাগিল, কোথায় প্রবৃত্তির জয় হইল, উচ্ছৃঙ্খলতার বালুরাশিতে প্রেম শুকাইয়া গেল। সাহিত্য কখনও নিয়মের জয় ঘোষণা করে, কখনও বা প্রবৃত্তির জয় কামনা করে। মানুষের অন্তরের দ্বন্দ্ব সাহিত্যের প্রাণ।

কিন্তু নিয়ম বজায় করিতে যাইয়া সাহিত্য অনেক সময় প্রেমকে এমন নাকে খত দেওয়াইল যে, অসত্যের অবতারণা হইল, সুন্দর কোথায় পলাইল! আবার প্রবৃত্তির উন্মাদনা প্রকাশ করিতে যাইয়া সাহিত্য প্রেমকে একবারে নিছক রক্ত-মাংসের তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। তাহাতেও অসুন্দর ও অসত্যেরই প্রকাশ।

যেথানে দেহের পশ্চাতে মন আছে, রূপের পশ্চাতে ভাব আছে, সেথানেই সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। প্রেম সেখানে দেহ-পিণ্ডের নহে, আত্মার রচনা, তাই আত্মার মতই সে অবিনশ্বর।

কালিদাসের শিব-সতীর কামসম্ভোগ বর্ণনা অশ্লীল নহে, কারণ, তাহার

পশ্চাতে আছে একটা অসীম সংযম ও নিয়মের যৌন-বন্ধন। কামক্রীড়া যেন হিম-গিরিশৃঙ্গে তুষার-হ্রদের রক্ত-কমলের মত ফুটিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের যৌন-ভাব-বর্ণনার পশ্চাতে আছে সেই চিরচঞ্চলের—নিতুই নবের প্রেম-অভিসার। জয়দেবের "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্" সেরূপ রতিকে সহচর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেমে মনকে ডুবাইয়া দেয়। পারস্য গীতি-কবিতায় তেমনি লায়লার বিম্বাধর, মজনুর সুরাপাত্র, অতীন্দ্রিয় জগতের কত না নিবিড় মায়া রচনা করিয়াছে। সহজিয়া সাহিত্যের মত এমন নিছক কামকলা সাহিত্য খুব কমই আছে, কিন্তু যখন প্রেমের বত্রিশবিধ প্রকারভেদ কেবলমাত্র আত্মার চরম প্রকাশের সহায় হয়, রক্ত-মাংস তখন শুষ্ক কাষ্ঠের মতন অসাড় হয় এবং সেই শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে জ্বলিয়া উঠে একটা স্নিগ্ধ অনির্ব্বাণ শিখা, সেখানে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বালাই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। জাগে শুধু সেই বাণী—

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী,
পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।

ভারতবর্ষ যৌনসম্বন্ধ লইয়া কোন রুচিবাগীশতার প্রশ্রয় দেয় নাই। আমাদের তন্ত্র যৌন-লীলার নগ্নতাকে বিশ্বসৃষ্টির অনাদি রহস্যের গূঢ়তায় পবিত্র ও আবৃত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়-ভোগ অশ্লীল হয় না, যখন তাহাতে আমরা ভোগ করিতে পারি বিশ্ব-লীলার এককণা আনন্দ, স্রকৃচন্দন বনিতার তখন অশুচিতা থাকে না। তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির মূল তত্ত্বই এই—ইন্দ্রিয়-ভোগ অশ্লীল ও অসুন্দর নহে, যদি সমগ্রের সহিত, বিশ্বের সহিত, ইন্দ্রিয়গুলির যোগস্থাপন হয়। মানুষ পশু-আচার অবলম্বন করে, যখন ভোগ করে ইন্দ্রিয়েরা। বীর আচারে, ইন্দ্রিয় ভোক্তা নহে, ভোগ

করেন জগদম্বা, যিনি "ইন্দ্রিয়াণাম্ অধিষ্ঠাত্রী।" তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে সকল ভোগ্যবস্তুই জগদম্বাকে নিবেদন করিতে হয়, না করিলে মানুষ পশ্বাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

সাহিত্য যখন ইন্দ্রিয়-ভোগের পশ্চাতে পরোক্ষকে, মনোময় বস্তুকে অন্বেষণ করে তখন তাহা কিছুতেই অশ্লীল, অসুন্দর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করিলেন, তখন নগ্নতা প্রকাশ হইল না, প্রেমের পূর্ণ-নিবেদন গোপীগণের লজ্জা নিবারণ করিল। সুফী-কবিতায় যখন প্রেমিক প্রিয়ার মুখ-মদিরা পান করিল, লালসা ফুটিল না, ফুটিল বিশ্ব-রহস্যের একটি গূঢ় রহস্য। জয়দেব যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শ্রীরাধার চরণ ভিক্ষা করাইলেন, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' তখন স্ত্রৈণতা নহে, ভগবানের অসীম করুণাই প্রকাশিত হইল।

চণ্ডীদাস যখন রামীর নিকট আপনাকে সমর্পণ করিল, ইন্দ্রিয়-লালসার পরিবর্ত্তে দেখা দিল একটা সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম—যাহা চন্দ্র-সূর্য্যের মতনই মানুষের গ্রাহ্য এবং যাহাকে পরিত্যাগ করাই কৃত্রিমতা ও কুটিলতা।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বইগুলিকে অশ্লীল বলা হয়, তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় রক্তমাংসের পশ্চাতে দেহের একটা জৈব-আনন্দ যাহা Growth of the Soil অথবা Sanine-এ অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। Growth of the Soil-এ মানুষ প্রকৃতির বরপুত্র। তাহার কাম যেন আকাশের বা গাছপালার রংয়ের পরিবর্ত্তনের মত নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। Sanine-এ সম্ভোগ সরল ও অকৃত্রিম। এখানেও মনোময় বস্তুটি দেহের উপাদানে গঠিত, তবুও দেহের অতীত। তাই সাহিত্য অশ্লীল হয় নাই।

আবরুতা রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা পদে পদে প্রেমকে লাঞ্ছনা করি। নিয়ম-কানুনের দাস হইয়া প্রেমকে পদদলিত করি। ইহাতে কত অসত্য,

কত অসুন্দর আমাদের প্রাণে প্রাণে জাগে। শিল্পী বলেন, প্রেমই এক-মাত্র সত্য ও সুন্দর। শুচি ও রুচি, অসত্য ও অসুন্দর। প্রেমের রূপ হইতেছে দেহ, প্রাণ হইতেছে আনন্দ। প্রেমের বাহিরের রূপ মনসিজ মদনের; অন্তরের রূপ শিব-সুন্দরের। যাহা নিত্য আনন্দের প্রস্রবণ তাহাই সুন্দর। হইলই বা তাহা বাহিরে কুৎসিত। মনোময় রূপ যাহার উপকরণ নহে, তাহাকে যখন সত্য বলিয়া আমরা জোর করিয়া ঘোষণা করি, তখন আমরা অসুন্দরের সৃষ্টি করি, তাহা শ্লীলই হউক, অশ্লীলই হউক। রুচিবাগীশ দক্ষপ্রজাপতির চক্ষে শিব অশ্লীল, অসুন্দর, কিন্তু তাঁহার অসুন্দর দেহের পশ্চাতে আছে চিন্ময় আনন্দ—আনন্দময়ী তাঁহার দেহে গাঁথা রহিয়াছেন, আর তিনিই বিশ্বের সুন্দরী। সব সুন্দর তাঁহার ছায়ামাত্র। সাহিত্য তাঁহার হস্তের দর্পণ, মুহুর্মুহু তাহাতে আপনার মুখশ্রী দেখিয়া তিনি নিজেই মোহিত হইতেছেন।